

Barcode : 4990010048954

Title - Bhul-Bhanga

Author - Dutta,Satyendranath

Language - bengali

Pages - 320

Publication Year - 1923

Barcode EAN.UCC-13



ভুল-ভাঙ্গা

(সামাজিক উপন্যাস)

শ্রীমতোদ্রনাথ দত্ত প্রণীত ।

আখনি—১৩৩০ সাল ।

মূল্য দুই টাকা মাত্র ।

শ্রীহরীপ্রসাদ দত্ত কর্তৃক

কলিকাতা

১৩২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ

অক্ষয়-লাইব্রেরী

হইতে প্রকাশিত ।

অমর সিরিজ—১ নং

প্রিণ্টার—আবুল গোফুর

২৪২।১, নিউ ব্রিটেনিয়া প্রেস হইতে

। মুদ্রিত ।

ভূমিতে—লতিকা সম লুটায়ৈ পড়িয়ে লিখিলাম এই

ভূমিকা

একখানি “ভুল-ভাঙ্গা” কিনিলেন? বেশ করিলেন, খুশিবাধ। ও মহাশয়, খুশিবাধ। কিন্তু একটি কথা—বহিখানি কিনিয়া, এই পুস্তকালয় হইতেই বরাবর বাড়ী ফিরিবেন না। নিকটস্থ কোনও সাইকেলের দোকান হইতে খানিকটা পাতলা রবার ও একশিশি রবার-সলিউসন্ কিনিয়া লইয়া তবে বাড়ীতে যাইবেন এবং এই বহিখানি পড়িবার পূর্বে উক্ত জিনিস দুইটি খুব কাছে রাখিয়া, তারপর পড়িতে আরম্ভ করিবেন। আমার এই গ্র্যাট্টি-গ্যাড্‌ভাটসের কারণ এই যে, বহিখানি পড়িতে, পড়িতে বধন আপনি মনের সাধে ইহার রস-সাগরে সাঁতার কাটিয়া অগ্রসর হইবেন তখন আনন্দে আত্মহারা হইয়া আপনি হাসিবেন—এত হাসিবেন যে, হাসিতে হাসিতে গড়াইয়া পড়িবেন। শুধু গড়াইয়া পড়িলে বিশেষ ক্ষতি ছিল না—বড় জোর গায়ে একটু ধূলা লাগিবে। কিন্তু হাসিতে, হাসিতে যদি আপনার পেট ফাটিয়া যায় তাহা হইলে বড়ই মুকিল। আপনি প্রতিদিন যত্না খাইবেন তাহা কাটা-পেট দিয়া বাহির হইয়া যাইবে, আপনি রোগা হইয়া যাইবেন, আপনার চেহারা খারাপ হইয়া যাইবে—পাঁচজনে আর আপনাকে পছন্দ করিবে না। এই জন্যই রবার ও রবার-সলিউসন্ কিনিতে বলা। যদি পেট ফাটিয়া যায় তাহা হইলে আপনি তখনই খানিকটা সলিউসন্ নাখাইয়া এক টুকরা রবার লইয়া সেই কাটা-যায়গায় তাম্বী মারিয়া দিবেন। হাঁ আর এক কথা—যদি পেট না ফাটে; কিন্তু ইহার রস-সাগরে পাড়ি দিবার সময় হাসিতে, হাসিতে যদি পেটের ভিতরকার নাড়ী ভুঁড়ী ছিঁড়িয়া যায় তাহা হইলে আধগজ ঝাকড়া আর ছটাক-খানেক রেড়ীর তৈরি চট করিয়া খাইয়া ফেলিবেন আর টপ্ করিয়া মাটিতে শুইয়া পড়িয়া, চাখার বতন করিয়া খানিকটা গড়াগড়ি দিবেন।

“পুস্তক-নিয়ম-ব্যতিক্রমে . বাধা দিবার জন্য” এই বহিখানি অনগ্রহণ

করিলেও—বর্তমানে দেশের আবহাওয়ার এমনি অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, এই বহিধানি স্বয়ংই পুরাতন-নিয়ম-ব্যতিক্রম করিয়া জন্মাইল। পুরাতন নিয়মানুসারে ঈদুল আকারের বহির, মৃত্যুযন্ত্রের গর্ভ হইতে জন্ম লইতে দুই মাস সময় লাগে। সংসর্গে-সমধর্মপ্রাপ্তি-নীতি অনুসারে যদি এই বহিধানি, মানুষের সংসর্গে থাকিয়া মানবধর্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে তাহা হইলেও ইহার দশমাস দশ দিনে জন্মগ্রহণ করা উচিত ছিল। কিন্তু দেশের বর্তমান আবহাওয়ার গুণে (যেন পুরাতন-নিয়ম-ব্যতিক্রম কারবার জন্ম) ইহা সে সব নিয়ম-ব্যতিক্রম করিয়া আর এক বৎসর সময় লইয়া জন্মগ্রহণ করিল। গালভরা-বড়-কথা প্রে-রে-রে রে-ম, প্র-র-ব-র-ণয় ও কোকুহলদ্বাপক এবং হাস্ত-রহস্যপূর্ণ গল্পের মধ্য দিয়া বড় প্রয়োজনীয় কয়েকটি কথা বললাম; অন্যত্র করিয়া মনের একটি কোণে স্থান দিলে—চরণে বাধা থাকিব। ইহা পড়িতে, পড়িতে যতই ভিতর দিকে অগ্রসর হইবেন মন ততই গল্পে আকৃষ্ট হইবে, প্রাণ ততই বঁড়িবে, আর হাসিতে, হাসিতে মন, প্রাণ উভয়েই নাচিয়া উঠিবে। নিকটে অবস্থিত বুদ্ধি, বিবেক, জ্ঞান প্রভাত সমাজদার-ভ্রমরচোদয়গণ—সে নাচ দেখিয়া অতীব প্রীত হইয়া “একসেগেণ্ট-একসেগেণ্ট” বাজতে, বাজতে জোর ক্লাপ দিবে আর সেই আনন্দে আপনার মন আরও নাচিয়া উঠিবে। তখন আমরা ধন্ত হইব, আমাদের রচনা সার্থক হইবে। আর দয়াময় বাবা শ্রীভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করিব যে—“হাসুক, হাসুক, বাঙ্গালী হাসুক; আরও, আরও, আরও হাসুক—আর তাহার হাসি দেখিয়া মহানন্দে সমগ্র জগৎ হাসুক।”

এই পুস্তকখানি বহুদিন পূর্বে রচিত হইয়া পড়িয়াছিল। বর্তমানে আমার পুঙ্জনীয় জ্যেষ্ঠভাত গীতার ঈশ্বরবাদ প্রকৃতি বহু গ্রন্থ প্রণেতা, ব্রহ্মবিজ্ঞা সম্পাদক, সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যরসী ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি. এল, পি, আর, এস, বেদান্তরত্ন মহোদয়ের উৎসাহে ও সহায়তায় ইহা মুদ্রিত হইল। তাঁহার সহায়তা না পাইলে আমি ইহা বর্তমানের ছাপাইতে পারিতাম না একত্র তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ রহিলাম। ইতি—

শ্রীমদ্যোগেশনাথ দত্ত।

গুরুঃ পিতা, গুরুমাতা গুরুদেবো গুরুগতিঃ ।
শিবো কণ্ঠে গুরুস্তাতা গুরো কণ্ঠে ন কশ্চন ॥

উৎসর্গ

পবন পূজনায় গুরুদেব—

শ্রীমৎ বালানন্দ শ্রামোক্তী

শ্রীচরণ-সরোজেষু :

তপো'বন—বেণনাখান ।

গুরুদেব শ্রীমৎ পরব্রহ্মস্বরূপ—সেই শ্রীমৎ পরব্রহ্মস্বরূপ গুরুদেব
উচ্চারণ করিয়া, শ্রীমৎ পরব্রহ্মস্বরূপ গুরুদেবকে ভজনা করিয়া, শ্রীমৎ
পরব্রহ্মস্বরূপ গুরুদেবকে চিন্তা করিয়া, শ্রীমৎ পরব্রহ্মস্বরূপ গুরুদেবকে
নমস্কার করিয়া তাহার মহাপবিত্র শ্রীচরণযুগল সরোজে—শ্রীভগবান
কর্তৃক আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া আমার দ্বারা রচিত এই “ভুল ভাষা” পবন
ভক্তিভরে উৎসর্গ করিলাম। প্রভু, গুরুদেব দয়া করিয়া—দীন, দীন
ভরু শিষ্যের এই অকিঞ্চিৎকর পূজা-উপহার গ্রহণ করিয়া আমাকে
ধন্য করুন, আমার জীবন সকল করুন, আমার কল্যাণ সার্থক করুন ।

শ্রীচরণে নিবেদনমিতি —

শারদীয়া মহাষ্টমী
আশ্বিন ১৩৩০ সাল ।

}

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ।

উৎসাহ

ভুল-ভাঙ্গা

যে, এইরূপ ভাবে ছোট-বড় করিয়া চুল টুটিলে এবং ঐ রকম স্ত্রীলোক-দের মতন কম্পান ঢাকিয়া, পাতা কাটিয়া সিঁধা কাটিলে তাহাকে অতি সুন্দর দেখায়। এক্ষণে পিতৃবিয়োগ হওয়াতে, তাহার অমন সুন্দর (১) চুলগুলি আমূল কাটিয়া ফেলিতে হইবে,” এই চিন্তায় সে মহা চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার পিতৃবিয়োগের পরদিন হইতে ঐ চিন্তায় সে অনেক ঘিনিদ্র-রজনী উষ্ণ মস্তিষ্ক—কক্ষতলে পানচারণা করিতে করিতে যাপন করিয়াছে।

প্রত্যক্ষ দেবতা-স্বরূপ স্নেহময় পিতার মৃত্যুতে শরৎচন্দ্র যে তিলমাত্রও দুঃখিত হয় নাই, এ কথা আমরা হৃদয় করিয়া বলিতে পারি। কিন্তু তাহার পাড়ার লোকেরা আমাদের এ কথা গম্বন করেন না। শরৎ-চন্দ্রের প্রতিবাদী কয়েকজন ভদ্রলোক বলেন যে—“আমরা শরৎচন্দ্রের পিতৃবিয়োগ হবার দিনকয়েক পরে—সমবেদনা প্রকাশ করবার উদ্দেশ্যে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাঈ। তার বাড়ীতে গিয়ে শুনুন যে, সে তখনও শয্যাশ্রয় করেন। আমরা তার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলুম এবং তার চাকর দীতুকে দিয়ে, আমাদের অগ্নিময় সংবাদ তার কাছে পাঠালুম। কিছুক্ষণ পরে দীতু চাকরের সঙ্গে শরৎচন্দ্র আমাদের কাছে উপস্থিত হ'ল। আমরা তাকে দেখে চক্ষের জল স্ফূরণ করতে পারলুম না। কারণ—শরৎচন্দ্রের তখনকার মূর্তি বড়ই বিষাদময়, বড়ই দুঃখময় ছিল। আর—তাকে দেখে বেশ স্পষ্টই বোধ হ'ল যে সে সমস্ত রাজি নিদ্রা যায়নি এবং ক্রমাগত ক্রন্দন ক'রেছে। আহা—হা, পিতার মৃত্যুতে বেচারী বড়ই ব্যাকুল হ'য়ে পড়েছে।”

পাড়ার ভদ্রলোকদের এইরূপ মন্তব্য শ্রবণ করিয়া দীতু চাকর কিছু

ভুল-ভাঙ্গা

মুখ টিপিয়া হাসিত। দীর্ঘকালে এইরূপ ভাবে হাস্য করিতে দেখিয়া আমরা একদিন বহু সাধ্য সাধনা করিয়া তাহার এইরূপ-হাস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, সে একবার এদিক-ওদিক চাহিয়া, অপেক্ষাকৃত নিঃশব্দে বলিল—“সাধে কি আর হাসি? এইসকল পাড়ার ভদ্রলোকদের কথা শুনে আমার ভারী হাসি পায়। আমার মনিব শরৎবাবু, কাল সমস্ত রাতটা প্রায়, নিজের চুলের জন্তে কাঁদে, আর ঐ সব, পাড়ার ভদ্রলোকেরা এসে ঠায়ে বলে গেল যে, ‘শরৎবাবু কাল সমস্ত রাত বাপের শোকে কেঁদেচে।’ একথা শুনে মায়া মাইলুও হেসে ওঠে তা আমি তো একটা জনজানু মনিষ্য।”

দীর্ঘ চাকরের এই কথা শুনিয়া আমরা সম্মিশ্রয়ে তাহাকে বলিলাম—“সে কি বলছে হে দীর্ঘ! ব্যাপারটা তো কিছুই বুঝতে পারছি না! তোমার বাবু তাঁর চুলের জন্তে কাঁদলে কি বলবে?”

আমাদের কথা শুনিয়া দীর্ঘ বলিল যে—“সে কথা আর কি বলব! নেহাৎই যদি বলতে হয়, তাহলে সব কথা বলি শুধু! শরৎবাবু যখন জন্মারনি তখন থেকে আমি এই বাড়ীতে চাকরী করি। তারপর ভৈরব জন্মাবার পর আমি তাঁর খাস চাকর হই। সেই সময় থেকে আমি শরৎবাবুকে কোলে, পাঠ ক’রে মানুষ করেছি। তাঁর সেই ছোট বেলা থেকে আজ পর্যন্ত আমি খাওয়া-দাওয়ার সময় তাঁর কাছে থাকি, শোবার সময় তাঁরই শোবার ঘরের মেঝেতে একটা বিছানা পেতে তাঁকে আগলে শুই। শরৎবাবু এখন বড় হয়েছেন, কলেজে পড়ছেন, একটা ছোমরা ছোমরা বাবু হয়েছেন তবুও কিন্তু এখনও তাঁকে আগলে আমার কত ইচ্ছা! কারণ তাঁর বড়ই ভুতের ভয়। সেই ছোটবেলা থেকে আমি

করে এই এখন-পর্যন্ত তিনি ভূতের ভয়ে কাঁপেন। ভূতের ভয়ে রোতে, একলা শুতে বা অন্ধকারে শুতে পারেন না। একলা কোথাও যেতে পারেন না।—তারপর কর্তাবাবু মারা যাবার দিন তিন-চার বাদে একদিন রাত্তিরে শরৎবাবু তাঁর শোবার ঘরে খাটের ওপর শুয়ে আছেন আর আমি মেঝেতে বিছানা করে শুয়ে আছি; আমার সবে মাত্র একটু তন্দ্রা আসছে, এমন সময় শরৎবাবু হঠাৎ ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে আমার ডাকলেন—“দীনে!” আমি তাড়াতাড়ি উঠে বললুম—“আজ্ঞে।” তখন শরৎবাবু বললেন যে—“ওরে দীনেরে, আমার দশা কি হবে? আমার এমন সুন্দর চেহারা—বাবার আঁকের সময় বখন আমার মাথার চুল কামিয়ে ফেলতে হবে, তখন যে আমার অতি বিক্রী দেখাবে? আমি সেই বিক্রী চেহারা নিয়ে লোকজনদের কাছে কি ক’রে মুখ দেখাব? ভাল ক’রে চুল গজাতে অন্ততঃ পক্ষে ছ’মাস লাগবে, সেই ছ’মাস আমি কি ক’রে কাটাব?” এই সব কথা বলে, শরৎবাবু ডুকরে কেঁদে উঠলেন। আর সেই থেকে প্রায়ই এই রকম ক’রে, চুলের জন্তে শোক করেন।”

এই পর্যন্ত বলিয়া দীলু নীরব হইল। আমরা তাহাকে পুনরায় প্রশ্ন করিলাম যে,—“তুমি তারপর কি ক’রলে হে দীলু?”

আমাদের কথার উত্তরে, দীলু একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—“শরৎবাবু মনিব, আমি চাকর; আমি তাঁর আর কি ক’রতে পারি বখন? তবে তাঁর ঐ কথা শুনে আমার মনে হ’ল যে, তাঁর বাড়ি যদি টেনে নাগিয়ে তাঁকে আমার বিছানায় শুইয়ে দিই আর আমি নিজে তাঁর বিছানায় উঠে গিয়ে শুই। আমি ছোটলোক, নীচ-স্বভাব,

ভুল-ভঙ্গি

মুখ্য, আর শরৎবাবু ভদ্রলোক, লেখাপড়া-জানা ; কিন্তু ভদ্রর আর লেখাপড়া-জানা লোকের মনের যা পরিচয় পেলুম তাতে মনে হ'ল যে, ঐ রকম ভদ্রর আর বাবু লোকেরা সব নীচে' নেমে আসুক আর মুখ্য, নীচ, ছোটলোকেরা সব ওপরে উঠে যাক। কারণ—আসলে তো ঐ মুখ্য, ছোটলোকেরাই সব ওপরে রয়েছে। তারা জন্মদাতা, প্রত্যক্ষ দেবতা বাপ মরে গেলে শোক করে ; 'কিসে বাপের আত্মার তৃপ্তি হবে, উদ্ধার হবে' এই ভাবনা ভাবে। ঐ রকম ভদ্র (?) আর লেখাপড়া-জানা (?) লোকদের মতন—নিজের চেহারা খারাপ দেখাবে ব'লে চুলের শোকে কাঁদেনা ; হবিষ্যি করবার ভয়ে পেটের অস্থখের ছলনা করে না , ক্ষুতো পরবার ভয়ে—হা ক'রে বেড়ায় না ; লাবান মাখবার ভয়ে—পায়ের মশার কামড়ের দাপকে, খেঁচ পাঁচড়া হয়েছে বলে মিছে পাপ বাড়ায় না।

গীতুর মুখে আমরা এসবকে যতদূর অনাগত হইরাছিলাম তাহা জানাই-
লাম। একগে চলুন, পূর্ববর্ণিত স্থানে কি বাণীর ইয় লেখিলেন চলুন।

আজ একমাস কাল যাবৎ যে চুলের ভাবী-দেহে "বুড়ো মিন্সে" গরৎচক্র ফাদিয়াছে পর্য্যন্ত, সেই চুল রক্ষা পাইবে শুনিয়া সে আনন্দে লোকাইরা উঠিল। পাত্রস্থিত এক তাল মাখমের উপর সজোরে একটি পদাঘাত করিলে—সেই মাখমের তালটি যেরূপ "ছোরকুটে" যায়, গরৎচক্রও আনন্দ ও আপ্যায়িতের আবেগে তাহার মুখটি সেইরূপ "ছোরকুটে", দুই পংক্তি পানের "ছ্যাংলা"-পড়া-দন্ত বিকাশ-পূর্বক বলিল—"ব্যা ! আপনি যদি ব্যবস্থা দেন, তাহ'লে আমার চুল কামাটতে হইবে ? ব্যা বলেন কি ?"

ডুল-ভাঙ্গা

পুরোহিত মস্তক নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন—“আমি কি আর আপনাকে মিথ্যা বলছি বাবু।”

শরৎচন্দ্র অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে বলিল—“তাহ'লে দিন, আমার ব্যবস্থা দিন।”

পুরোহিত ঠাকুর অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বলিলেন—“ব্যবস্থা তো শুধু শুধু দেওয়া যায় না বাবু; এরূপ ব্যবস্থা নিতে হ'লে মূল্য দিতে হয়।”

শরৎচন্দ্র এই কথা শুনিয়াই, তাহার তাঁকের ভিতর হইতে পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া, তাহা পুরোহিত মহাশয়ের দিকে আগাইয়া ধরিয়া বলিল—“মূল্য ? মূল্য ? এই নিম্ন, পাঁচ টাকা মূল্য নিন।”

পুরোহিত মহাশয় টাকা পাঁচটি লইতে না না বলিল প্রথমটা হো,হো করিয়া অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া উঠিলেন ও পরে অত্যন্ত ভাঙ্ছিলোর সহিত বলিলেন—“পাঁচ টাকা ! পাঁচ টাকা ! আমার অজ্ঞমতি দানের মূল্য পাঁচ টাকা ? আমি এত বড়, মস্ত, দিগ্গজ পণ্ডিত : আমার উপাধি—পদ্মপুরাণাচার্য্য, পাতালখণ্ডভীর্ণ ; আমি অতি নীচ্রই ভূটান ও সীমান্ত প্রদেশস্থ পণ্ডিতমণ্ডলী কর্তৃক “দক্ষ-শাস্ত্র-কুদ্রিরাজ” উপাধি ভূষণে ভূষিত হব—সেই আমি কিনা এক মুদ্রা মূল্য গ্রহণ ক'রে ব্যবস্থা দান করব ! হ্যাঁ !! আরে এ দান কি একুটা বা-তা দান ? ব্যবস্থা দান হচ্ছে মহাদান ; কোটি মূলতানী গাই দানের চেয়ে ব্যবস্থা দানে অধিক পুণ্য সঞ্চয় হয় ; আমি সেই মহাদান কিনা পাঁচ টাকা মূল্যে ক'রব ?”

পুরোহিত মহাশয় মহনা এইরূপ বাগাড়ম্বর করাতে শরৎ একটু

ভুল-ভাগ

মুন্ডাইয়া পড়িল : কণেক নীরব থাকিয়া, ঈষৎ লম্বিত ভাবে বলিল,
—“আজ্ঞে তাহলে কি দিতে হবে—কি দিলে আপনি——”

পুরোহিত মহাশয় নানা ভাবভঙ্গী সংকারে, মস্তক হেলাইয়া-
দোলাইয়া বলিলেন—“কি দিতে হবে? এই ভীষণ, ভয়াবহ পাপ
কথা আপনি আমার জিজ্ঞাসা করছেন; আর আমাকেও তাই, আমার
পরিবার ও খোল-পরিষ্কৃত কর্ণে শুনতে হচ্ছে। ওহো ধিক আমাকে,
ধিক ব্রাহ্মণকে; বলিতে, তার কিছু শক্তি নেই—নইলে, অতি ক্ষুদ্র
শূদ্র কিনা অতি ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণকে বলে যে, “কি দিতে হবে?” ওঃ কি
অপমান, কি ঘৃণা! এক একবার ইচ্ছে করে যে কপিলের তেজে
জ্বলে উঠে এই শূদ্র প্রলোকে একেবারে ভস্ম করে দি; কিন্তু তখনই
বশিষ্ঠের ক্ষমা শূণের কথা মনে পড়ে যায় তাই পারাওঁরা সব রেহাই
পেয়ে যায়। “কি দিতে হবে?”—“আমি শূদ্র, ব্রাহ্মণের মর্যাদা
অমুখ্যায়ী, ব্রাহ্মণের ক্ষুদ্রত্ব—(আহা—হা, কি বলতে কি বলছি ছাই)
ব্রাহ্মণের ক্ষুদ্রত্ব অমুখ্যায়ী দিতে হবে। এই সামান্য কথাটা বুঝতে পারলি
না রে মূর্থ-মূর্থ, অপোগণ্ড-অপোগণ্ড, বর্কর-প্রচণ্ড বর্কর প্রচণ্ড।”

আমাদের বর্ণিত এই পুরোহিত মহাশয়, তাঁহার পিতৃদেবের নিকট
শিক্ষা পাইয়াছিলেন যে, যজ্ঞমানদের নিকট খুব বাগাড়ম্বর করিতে হয়,
কথা বলিবার সময় অধিক পরিমাণে হাত-মুখ নাড়িতে হয়, প্রত্যেক
কথা বলিবার সময় অন্ততঃ পক্ষে দুইবার করিয়া টিকি দোলাইতে হয়,
মধ্যে মধ্যে কপট ভ্রোশ দেখাইতে হয় এবং যজ্ঞমানদের সদা সর্বদাই
ধাধার রাখিতে হয়। এই সকল নিয়মগুলি ঠিক মত পালন করিয়া
যাইতে পারিলে—যজ্ঞমানের ভক্তি আকর্ষণ করা যায় এবং সেই সঙ্গে

অধিক পরিমাণে মুদ্রাও আদায় হয়। বহু চেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াও পুত্রকে যখন উত্তমরূপে শাস্ত্র শিক্ষাইতে সক্ষম হইলেন না তখন আমাদের পুরোহিতের পিতাঠাকুর মহাশয় পুত্রের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য তাহাকে উপরোক্ত উপদেশগুলি দিয়াছিলেন। আমাদের এই পুরোহিত মহাশয় এই কারণেই এখানে নানারূপ চালবাজী করিতেছেন। অন্য সময় হইলে শরৎচন্দ্র, তাহার চালবাজীতে ভুলিত না। কিন্তু বর্তমানে—কেবলমাত্র তাহার বড় সাথের চুলগুলি রক্ষা পাইবে—এই আশঙ্কায় শরৎ বিভোয় হইয়া গিয়াছিল এবং এ ক্ষুদ্র যথেষ্ট অর্থব্যয় করিতেও সে প্রস্তুত ছিল। এই সকল কারণে সে আর বেশী কথা না বাড়াইয়া সবিনয়ে বলিল—“পুরোহিত মহাশয় আমাকে অপরাধ হইছে ; আমার মাপ করবেন ; আমি——”

পুরোহিত মহাশয় মহা গম্ভীর ভাবে বলিলেন—“আচ্ছা আমি মাপ করলুম। কারণ, আপনার এতে বিশেষ কোনও দোষ নেই। দোষ কালের। শাস্ত্র কখনও মিথ্যা হয় না। শ্রীযুগ শাস্ত্রবিদগণের কলিতে ব্রাহ্মণের সম্মান নেই। এর প্রমাণ তো হাতে হাতে পেলেন। আপনি আমার মতন ‘প্রবল-প্রতাপশালী’ ‘প্রচণ্ড-সংস্কৃতবিশিষ্ট’, ‘হৃদ্যাত্মক-শাস্ত্রবিদ’, ‘মহামহিম-মনোবি’, ‘ব্রহ্মাণ্ড-সাহিত্য-প্রকাণ্ড’ ব্রাহ্মণকে অমান-বদনে বললেন কিনা যে, ‘কি দিতে হ’বে ?’ তা হোক—আপনি যখন মাপ করেছেন তখন ও সকল কথা থাক ; আমি অকৃতজ্ঞ করে আপনার মাপ করেছি ; তা ছাড়া আপনাকে আমি ভারিও একটু বাস্তবিক ভাই বন্ধু ; নতুন—অপর লোক কেউ এ কথা বললে আমি অভিযোজ দিয়ে তাকে সমস্ত ধ্বংস করে ফেলতুম।”

পুরোহিত ঠাকুরের ঈদৃশ বাগাড়ম্বর শরৎ মনে মনে বিরক্ত হইলেন—কোনও রকমে কার্যোদ্ধার করিয়া লইবার জন্য—সে প্রকাশ্যে কোনও প্রকার বিরুদ্ধ ভাব প্রদর্শন করে নাই। সে এতক্ষণ বহু কষ্টে ধৈর্য্য ধারণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এক্ষণে ঐ ‘সবংশে ধ্বংস করার’ কথা শুনিয়া সে আর নীরব থাকিতে পারিল না—কিছু করিয়া একটু হাসিয়া ফেলিল।

সাহাকে হস্ত্য করিতে দেখিয়া পুরোহিত নম্রাশ্রয় মনে মনে ভাবিলেন যে, শরৎচন্দ্র তাঁহার কথা বিশ্বাস করিয়া না এবং তাঁহার শেষ চাল-বাগীর্জ সে বিশ্বাসের একান্ত অঙ্গোচ্চালিয়া মনে করিয়াছে; ~~কিন্তু~~ যাহা—যাহাতে শরৎচন্দ্রের বিশ্বাস আছে এবং সে বোধায় পড়ে—একটি কথা বলা এ ক্ষেত্রে সর্বোপায়ভাবের উচিত। একদম চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন—“বাবু, আমার কথার ও বিশ্বাস করছেন তাই হস্ত্য করছেন বটে কিন্তু এ কথা অবিশ্বাস করার মত কথা নয়। ‘অভিসম্পাত দ্বিগুণ, আগি ত্রৈ, কোনও লোককে সবংশে ধ্বংস করেছি’ এ কথাটা মিথ্যা নয়—সত্য, অতি সত্য, ঐতিহাসিক সত্যও এতে নিহিত আছে। আমার একটি মূঢ় যজ্ঞমান—আমার মর্যাদার গুঢ় রহস্য বুঝতে না পেরে আমায় অসম্মাদা করিতে আমায় প্রোতাহিত করে রুচকর্মে তাঁকে অভিসম্পাত দিই যে, ‘তুই সবংশে ধ্বংস করিবি।’ আমার ঐ অভিসম্পাত দেওয়ার পর বর্ধারথই সে ব্যক্তি সবংশে ধ্বংস প্রাপ্ত হ’ল। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে তাঁর বংশের ভিন্ন ভিন্ন লোক বাস কর’ছিল কিন্তু আমার এমনই শক্তি যে আমার সেই ক্রোধাগ্নি একই সময়ে সেই ভিন্ন ভিন্ন দেশস্থ ~~সকলকে~~ ধ্বংস ক’রে ফেললে। যাকে অভিশাপ দি জায়া চার তাই

এবং চারজনেই চারিটি স্বতন্ত্র স্থানে বাস করত, আমার অভিযাপ
দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বড় ভাই মরে গেল, মথুরায়, মেজুতাই মরে গেল
টাইবাসায়, মেজুতাই মরে গেল কলকাতায়, ছোটাই মরে গেল
আগ্রায়। তাদের বংশে একটা ছোট মেয়ে ছিল; সেটাও
ঘাগরায় আগুন লেগে মরে গেল। আরও অধিক আশ্চর্যের বিষয়
এই যে, মগরায় তাদের একটা চালের আড়ৎ ছিল, সেটা আড়ৎটাও
ঠিক ঐ এক সময়েই আগুনে পুড়ে গেল। ই। তবে এ সম্বন্ধে একটু
মতভেদ আছে—একদল লোক বলে যে আমারই অভিযাপের আগুন
ঠিকরে গিয়ে ঐ চালের আড়ৎটায় পড়ে সেটা পুড়িয়ে ফেলেছে; আর
আর একদল বলে যে, ঐ মেয়েটার ঘাগরায় আগুন লাগাতে নে মগরায়
ছটকট করছে করতে ঐ চালের আড়তের সামনে যখন দৌড়ানো
ক'রছিল সেই সময় তার ঘাগরার আগুন ছটকে আড়তের উপর
পড়ে; তাইতাই আড়ৎটা ভস্মীভূত হয়ে যায়।”

পুরোহিত মহাশয়কে ঘাঁটাইতে ইচ্ছা ছিল না বটে কিন্তু তাঁহার
এই আজগুবি ও গাঁজাখুবি ঐতিহাসিক সত্য-নিষ্ঠিত গল্প শুনিয়া
শরৎচন্দ্র, সহস্র উচ্চঃস্বরেও একেবারে নির্ঝক থাকিতে পারিল না।
সে কপট-কৌতূহল প্রকাশ করিয়া বলিল—“আচ্ছা মশাই, তারা সবাই
যদি ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় মরে গেল তা’হলে আপনি সে খবর জানতে
পেলেন কোথা থেকে? তারা যখন সবংশে ধ্বংস হ’ল তখন তো আর
খবর দেওয়ার অস্ত্রও কেউ বেঁচে ছিল না।

পুরোহিত মহাশয় এইরূপ জেরায় পড়িয়া, এইবার একটু গোলমালে
পড়িলেন। তাঁহার মতন বাগাড়ম্বরকারী ব্যক্তিকেও কিছুক্ষণ নীরব

কুল-ভাঙ্গা

থাকিতে হইল। কিন্তু তাঁহার উর্ধ্ব ও ধাম্মা-প্রসূ মস্তিষ্কের কৃপায়—
কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পরই তিনি বলিলেন—“বাবু, যথার্থই তারা সবংশে
স্বপ্ন প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং যথার্থই তাদের মধ্যে কেউই সংবাদটি দেবার
অন্ত পর্য্যন্ত জীবিত ছিল না কিন্তু তবুও আমি এ খবর জানতে পেরেছি
কিমে তা জানেন? এই খবর সংস্কৃতির কৃপায় জানতে পেরেছি
অর্থাৎ কিনা পদ্ম-পরামের কৃপায় এবং পাতাল খণ্ডের মহিমায়
এই লম্বা ব্যাপার আমার নথ-দর্পণে উপস্থিত হইয়াছিল। অর্থাৎ
কিনা—আমি আমার দক্ষিণ হস্তস্থ বুদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপর সজোরে একবার
বলনস্থ উষ্ণ বাষ্প ‘হাঃ হাঃ’ করে প্রদান করলুম, তৎপরে শুষ্ক বস্ত্রখণ্ড
দ্বারা সেই নখরটি মুছে নিয়ে তার ওপর চেয়ে দেখতেই দেখলুম যে
এই সমস্ত আবর্তীয় ব্যাপার তথায় দর্পণবৎ প্রতিবিম্বিত হইয়াছে।”

পুরোহিত তাঁ কুরুর কথাগুলি অবাক হইয়া শ্রবণ করিয়া শরৎচন্দ্র
মনে মনে ভাবিল যে, ‘উঃ! লোকটা কি ধাম্মাবাদ! তার ওপর ওর
এতদূর আশ্রয় যে আমাকে এমন ন্যাকা ঠাণ্ডারালে যে ঐ সব
ধাম্মাগুলো আমাকে অগ্নানবদনে দিলে! কি বলব! আমার কোনও
একমে ভূতের ভাত পেকে রেখাইও পেতে হবে আমার আমার মাথার
চুলগুলোও বাঁচাতে হবে তাই আজ ও রক্ষে পেয়ে গেল—নয়ত’ ওটাকে
আজ গঙ্গায় ফেলে, টুঁটী টিপে ধরে সাতাশ বার নাকানো-চোবানী
খাওয়াতুম।’

শরৎচন্দ্রও এইরূপ চিন্তায় নিমগ্ন পুরোহিত মহাশয়ও আত্ম-চিন্তায়
বিভোর। পুরোহিত মহাশয় ভাবিতেছিলেন যে, ‘এই সময়, এই
একটা দীর্ঘায়ের সময়,—এই সময় পাঁচ টা কাণ্ড মিলিতে পারে আমার

পঞ্চাশ টাকাও পাওয়া যেতে পারে। এই পাষাণ ব্যাটারা বৈরূপ স্নেহ-
জ্বাপন্ন হয়ে পড়েছে তাতে যে, ক্রিয়া কলাপ করে আমাদের কিছু দেবে
এ তো বোধ হয়না। সুতরাং এই রকম প্যাচ খবর এরা পড়ে তখনই
কায়দা ক'রে এদের কাছ থেকে যতটা বেশী পারা যায় ততটা আদায়
ক'রে নিতে হয়। কিন্তু কি কায়দা করি? - যে সব দাঙ্গা এতক্ষণ ধরে
দিলুম, তাতে বিশেষ ফল হবে বলে তো বোধ হয়না, আমার অতটা
অধিক মাত্রায় বলাটা ভাল হয়নি দেখছি।—ভাঙিত! কি কিকির করা
যায়!—ওহো-হোঃ! ঠিক হয়েছে, ঠিক হয়েছে—সেই অথা বসলেই ঠিক
কার্যসিদ্ধি হবে; ওঃ! কথাটা বড্ড মনে প'ড়ে গেছে। এইরূপ চিন্তা
করিতে, করিতে পুরোহিত মহাশয় নতুন আহ্লাদে আটখানা হুইয়া
গেলেন। অতি কষ্টে আশ্রমের বেগ সহরণ করিয়া বলিলেন—বাবু,
আমি সব কথা ছেড়ে দিয়ে, একটি শেষ কথা বলি শুন। দেখুন—
আপনি যদি আমার মর্যাদার উপযুক্ত মূল্য দিতে কষ্ট বোধ করেন,
তাহলে না হয় তা নাই দেবেন, কিন্তু আপনার নিজের চেহারার
মর্যাদার উপযুক্ত মূল্য দেবেনত।”

শরৎ বলিল—“আপনি কি বলছেন তা ভাব বুঝতে পারছি না।
সব খুলে বলুন।”

পুরোহিত ঠাকুর বলিলেন—“দেখুন—আমার এই ব্যবস্থা দানের
জন্য আপনাকে নগদ করুকরে পঞ্চাশটি মুদ্রা দিতে হবে কারণ
আপনার চেহারা অতীব সুন্দর। আমার কথা বোধ হয় ভাল ক'রে
বুঝতে পাচ্ছেন না? আচ্ছা, পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলছি, শুন।
দেখুন—আমি সাধারণ-চেহারার লোককে পচিশ টাকার ক্রমে এইরূপ

ভুল-ভাঙ্গা.

ব্যবস্থা দিইনা, আর দানের চেহারা খুব ভাল হয় তাদের এইরূপ ব্যবস্থা দিতে হ'লে পঞ্চাশটি মুদ্রা গ্রহণ করি। তা দেখুন—আমি এ পর্যন্ত যত লোককে এইরূপ ব্যবস্থা দিয়েছি তাদের সকলকার অপেক্ষা আপনার চেহারা সুন্দর,—অর্থাৎ মনোহর,—অলৌকিক রূপময়। সুতরাং আমার কাছ থেকে এইরূপ ব্যবস্থা নিতে হ'লে আপনি পঞ্চাশটি মুদ্রা আনায় দিতে বাধ্য।" এই কথা বলিয়া পুরোহিত মহাশয় মৎস্য-প্রদানোদাত্ত মন্ত্ৰেয়র প্রান্ত দৃষ্টিনিষ্ফেপকারী মার্জ্জারের দ্বারা, লুক্কনেত্রে শরৎের প্রতি চাহিয়া বহিলেন।

পুরোহিত মহাশয় অত ধাপ্পা দেওয়ার পরও শরৎকে সহসা কেন এই সকল কথা বলিলেন, সে মজার রহস্য জানিতে হইলে একটু পূর্ব-কথা অবগত করা আবশ্যিক। পর পট্টনে, দে দে রহস্য বর্ণিত হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যে শরৎচন্দ্রকে রূপবান্ বলিয়া এবং তাহার চেহারা অতীব সুন্দর, অতীব মনোহর প্রভৃতি বিশেষণে বিভূষিত করিয়া পুরোহিত মহাশয় শত মুখে স্থখ্যাতি করিলেন, সে শরৎচন্দ্র রূপবান্ তো নয়ই—বরঞ্চ তাহাকে কুৎসিত বলিলেও কিছু অত্যাধিক হয় না। শরৎচন্দ্রের অঙ্গের বর্ণ কালো এবং তাহার মুখশ্রীও ভাল নয়। তাহার নামকণ্ঠটি কেবল চাটু, দস্তের উপর পাটি উচ্চ, ওষ্ঠাধর স্থল, বক্ষ কাণ ও অঙ্গশস্ত্র, চক্ষু দুটি ছোট ছোট এবং চক্ষের কোল স্বভাবতই ভিতর দিকে বসে। মোটের উপর তাহাকে কুৎসিত ভিন্ন রূপবান্ কিছুতেই বলা যায় না। তথাপি তাহাকে পুরোহিত মহাশয় অতীব রূপবান্ প্রভৃতি বলিলেন কেন—তাহা অবগত করুন।

কুৎসিত আকৃতি সত্ত্বেও শরৎচন্দ্রের ধারণা—দৃঢ় ধারণা—যে, সে অতীব সুন্দর, তাহার চেহারা বা আকৃতি অতি মনোহর। শরৎচন্দ্র ধনী পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান সুতরাং বড়ই আদরের। তাহার পিতা-মাতা তাহাকে বড়ই আদর ও যত্ন করিতেন এবং তাহার সমস্ত কামনা চাহিবারাই পূরণ করিতেন। দাস, দাসী ও অন্যান্য কৰ্ম-চারীবর্গ সততই তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে ও তাহার আজ্ঞা-পালন করিতে ব্যস্ত থাকিত। বাল্যকাল হইতে সকলের উপর প্রভুত্ব করিতে পারিয়া সে ‘নিজে একজন বিশিষ্ট ও অসাধারণ ব্যক্তি’ মনে করিত। পুরবাসীগণের মুখ-নিঃসৃত—‘ধন আমার’, ‘চাঁদ আমার’ প্রভৃতি প্রিয়

ফুল-ফাগুন

সম্বোধন ৭৮ বয়স পর্যন্ত তাহার কণ্ঠকূহর পরিতৃপ্ত করিয়াছিল।
এতদ্ব্যতীত — ‘শরৎ আমাদের আকাশের চাঁদ’, ‘আমাদের বুক জুড়োতে
আকাশ থেকে মাটিতে নেমে এসেছে’ ইত্যাদি প্রিয় ও মধুর বাকা-
গুলি—পিভামাতা ও অক্লান্ত পুরনাসী-জনের মুখ হইতে পরিণত বয়স
পর্যন্ত শুনতে শুনিতে তাহার গারগা হইয়াছিল যে, যথার্থই তাহার
চাঁদের মত চেহারা। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিলাসিতার প্রাতি তাহার
আসক্তিও বাড়িতেছিল। শরৎচন্দ্র আয়নাতে মুখ দেখিত, নির্ধা কাটিত,
পুড়িডার, হেঙলিন শ্বে। প্রভৃতি মাখিত ও নানা প্রকার উত্তম
উত্তম বেশ-ভূষা পরিধান করিয়া আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মনে
মনে ভাবিত যে, সে এতই সুপুরুষ। তাহার বয়স বৃদ্ধি বাড়িত লাগিল,
এইদিকে তাহার আসক্তিও তত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সে দৈন্যসের
অধিকাংশ সময়ই নিজের দৈহিক — দাঁড়ি টো-মাধনে বাস্তব থাকিত এবং
নিজের রূপে নিজেরই মোহিত হইয়া থাকিত।

এ জগতে শ্রীভগবানের এই একটি বিশেষ আশীর্বাদ আছে যে, মানুষ
নিজে নিজে বড় হইলে স্বন্দর অকৃতি-বিশিষ্ট মনে করে। এ জগতে
এমন সংস্কৃতি লোক বোধ হয় কেহই নাই—যে আয়নার নিজের প্রতিবিম্ব
দেখিতে দেখিতে না মনে করিয়াছে যে, তাহার চেহারাটি স্বন্দর—
তাঁর সত্যই স্বন্দর হউক অথবা অতীব কুৎসতই হউক। শরৎচন্দ্রও
নিজেকে খুব রূপবান্ মনে করিত এবং প্রাণী, প্রত্যানী ও অধীনস্থ-
গণের মুখে নিজের রূপের প্রশংসা শুনিতে শুনিতে, তাহার মনে এই
সংস্কার দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। এটি বিষয়ে কিছু তাহার
বিশেষ একটি ক্ষেত্র ছিল। তাহার অঙ্গের বর্ণ যে কখন একথা সে

বুঝিতে পারিত। তাহার অঙ্গের বর্ণ বার্থ যতটা পরিমাণে কৃষ্ণ, সে
অবস্থা ততটা মনে করিত না বটে কিন্তু এটা তাহার মনে হইত যে—
তাহার চেহারাটি সুন্দর, মধুর সুন্দর; কিন্তু তাহার অঙ্গের বর্ণটি
একটু কালো—বেশী নয়, সামান্য একটু কালো। যদি তাহার দেহের
কালো রং ও বিশ্রী মুখশ্রী দ্বারা তাহার নিকট প্রার্থী ও অধীনস্থগণ,
তাহাকে অস্বীকৃত করিয়া দিলে, তবুও এই রঙটার জন্য তাহার
মনটা বড়ই খুঁৎ খুঁৎ করিত। এই জন্য—এই কালো রঙকে তবু
তাহার জন্য সে কোনও দ্রব্য ও দ্রব্যের ব্যবহার করিত। দেহ-পায়ে
অথবা অধীন-তথন যুগে ও তাহার নিকট প্রার্থী ও অধীনস্থগণ
বসিত এবং তাহার নিকট গাউডার, হেড-এবং মো, প্রভৃতি দ্রব্য খুব পুরু
করিয়া রাখিত ও প্রতীকর্ণ করিয়া উপায় তাহার স্বাভাবিক কৃষ্ণ রঙকে
চাকি ও হারিয়ে দিত। তাহা হইলে কোন কোনও ব্যক্তি কখন কোনও
কারণে কিংবা অনক্রমে—“তাহার কালো কালো”—এই কথা বলিত তাহা
হইলে সে, সেই ব্যক্তির উপর মনোযোগ চাওয়া যাইত এবং যে কোনও
জন্তে হউক তাহাকে তাহা হইলে তাহা হইত যদি তাহার অধীনস্থ না
হইত তাহা হইলে তাহার সম্বন্ধে কোনও কথা বলা করিয়া দিত। যে
ব্যক্তি তাহার কালো রঙের কথা বলিত অথবা তাহার চেহারার
স্বাভাবিক বর্ণিত সে, সেই ব্যক্তির উপর মনোযোগ হইত এবং যে ব্যক্তি
কি কোনও কারণের প্রার্থী হইত তাহা হইলে সেই ব্যক্তি তাহার
প্রার্থনা পূরণ করিত। এ রহস্য ক্রমে সকলেই জানিয়া গিয়াছিল
শরৎচন্দ্রের নিকট কোনও রূপ প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে হইলে তাহার
অধীনস্থ ব্যক্তিগণ বা তাহার ইচ্ছাগণ, অথবা তাহার চেহারার কথা

ভুল ভাঙ্গা

করিত, তারপর আপন আপন প্রার্থনা জানাইত। পুরোহিত মহাশয়
এ রহস্য অনগত ছিলেন। নানা গোলমালে এতক্ষণ তাহা বিস্মৃত
হইয়াছিলেন এক্ষণে সহসা তাহা স্মৃতিপথে উদ্ভূত হওয়ায়—তিনি কোপ
বুঝিয়া কোপ মারিলেন; সনাতন প্রথা অনুযায়ী তাহার লক্ষ্য বথানাহানেই
বিদ্ধ হইল। নিজের চেহারার সুখ্যাতি অরণ করিয়া শরৎচন্দ্র
আনন্দে গলিয়া পড়িল। এতক্ষণ অন্য বাহা কিছু তাহার মনে উদ্ভূত
হইয়াছিল সে সমস্তই কর্পূরের মতন উড়িয়া গেল। শরৎচন্দ্র অতীব
আনন্দ সহকারে পুরোহিত মহাশয়কে বলিল—“টাকার জন্তে কোনও
চিন্তা নেই। পঞ্চাশ টাকা কেন—আমি আপনাকে পঞ্চাশ টাকা
দিচ্ছি।” এই কথা বলিয়া শরৎচন্দ্র নিজের টাকাকে যে টাকা পাঁচটি
ছিল তাহা পুরোহিত মহাশয়ের হস্তে প্রদান করিয়া, তাহার পরিচারক
দীক্ষকে বলিল—“ওরে দীনে, এখানে আসবার সময়—তোকে সরকারের
কাছ থেকে যে একশো টাকা আনতে বলেছিলুম, তাই থেকে পঞ্চাশ
টাকা গুরুত মশাইকে দে।”

শরৎচন্দ্র পুরাতন ভূত দীক্ষ যখন শরৎচন্দ্রের কাপড়, উত্তরীয় প্রভৃতি
লইয়া এখানে আনিবার নিমিত্ত, তাহাদের বাড়ীতে উদ্যোগ-আয়োজন
করিতেছিল, সেই সময় শরৎচন্দ্র, স্বীয় প্রয়োজনীয় কতকগুলি দ্রব্য এবং
টাকা ও রেজকীতে মিলাইয়া মোটমাট একশত টাকা দীক্ষকে সঙ্গে লইয়া
আসিতে আদেশ করিয়াছিল। বাটির সরকার মহাশয়ের নিকট হইতে
উক্ত টাকা একটি ছোট থলিতে লইয়া এবং সেই থলির মুখটি কোমরে
বান্ধিয়া লইয়া দীক্ষ এখানে আসিয়াছিল। মনিবের অনুমতি পাতি
সেই মনে সেই ছোট তহবিলটি বাহির করিয়া, তাহা হইতে পঞ্চাশ

ভুল-ভাঙ্গা

টাকা লইয়া পুরোহিত মহাশয়কে প্রদান করিল। পুরোহিত ঠাকুরের হস্তে টাকাগুলি দিবার সময়, সে একবার উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি-নিঃকপ করিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। পুরোহিত মহাশয় প্রসারিত ও অকম্পিত হস্তে টাকাগুলি গ্রহণ করিয়া অন্নান-বদনে টাকাস্ত করিলেন এবং ঈর্ষ উচ্চস্বরে বলিলেন—“বাবু, আমি আপনাকে ব্যবস্থা দান করছি যে আপনার মস্তক মুণ্ডন করতে হবে না; আমার আদেশে আপনি কেশ-যুক্ত মস্তকে শ্রদ্ধা করবার অধিকারী হলেন।”

শ্রদ্ধা মুণ্ডিত-মস্তকে করিতে হয়। কারণ—শ্রদ্ধা করিবার এই-রূপ নিয়ম—এবং এসম্বন্ধে শাস্ত্রের বচন এইরূপ যে, শ্রদ্ধা যে সকল ছিল দেওয়া হয় তাহা উক্ত রূপে বাহিয়া দিতে হয়; তাহা হইলে যে ব্যক্তির শ্রদ্ধা করা হয় সে ব্যক্তি, ঐ তিল সংখ্যক তিল তৎকাল স্বর্গবাসেব অধিকারী হয়। কিন্তু ঐ সকল তিলে যদি একগাছিও চুল থাকিয়া যায় তাহা হইলে উক্ত ফল-লাভ হইবে না এবং শ্রদ্ধা পণ্ড হইয়া যাইবে। এই কারণেই শ্রদ্ধাধিকারীকে মস্তক মুণ্ডন করিতে হয়।

এই নিয়ম যদি সত্য হয়, এ বহুত যদি সার্থক হয় তাহা হইলে, কেশ-যুক্ত মস্তকে শ্রদ্ধা করিয়া পরন্তর ফল লাভ হইবে, না শ্রদ্ধা প্রদত্ত সিদ্ধি হইবে?

এই সকল প্রচলিত-বিধান ও শাস্ত্র-বাচ্য যদি সত্য বলিয়া বিধান হয় তাহা হইলে ইহার সমস্ত বিধান বর্থাৎ-ভাবে পালন করা হইবে আর যদি এই সকল বিধানকে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বলিয়া মানা হয় তাহা হইলে ইহা একেবারে পরিত্যাগ করা উচিত। এই যে ‘না-হি’

ভুল-ভাঙ্গা

না-অন্ধু' ভাব—এভাবে চলি করি। উচিত নয়। হিন্দু-বর্ম
যদি ভাল না লাগে তাহ হইলে ভিন্ন ধর্ম অবলম্বন কর, ভিন্ন সমাজের
অগ্রগণ্য। কোনও ধর্মের মাথায় থাকিলে সেই ধর্মের অবমাননা
করিতে নাই, তাহার গাঢ়ভাবে অবলম্বন করিতে নাই। হিন্দু-ধর্মের নিয়ম-মু-
সারে অধিকতর প্রবণ হইতে পারিলে অনেক ভাল কাজ করা যাই-
ত। নিজের উদ্বেগ-হৃদয়কে শান্ত রাখিবার জন্য যত্নবশত যত্ন
যে সকল নিয়ম-নিয়ম-কর্তব্য-নিয়ম-বহু বিধ। এগুলি হইবে সে
সকল পরিত্যাগ করিবে এবং এককৃত্রিম আক্ষিপ্তক মুগ্ধ হইয়া নিম্ন
মনসে চোব ঠাণ্ডা—এ বেলায় যত্নবশত, সেজন্য প্রকৃত্ত ক্রমে
কেননু ভাঙ

আজকে এই বিজ্ঞান-যুগে আমরা তাহ লোকের আশ্রয় নিজে
পেছ নাযের জিনিষ গ্রহণ করি কেননু বুঝে? আজকাল বিদ্যায়
বা আমি সে বিদ্যা গ্রহণ করি কেননু? আজাদেশ পালন করা বর্ম-
কার্য—মূল্য দিয়া কখনও কি সে ক্রম করা যায়? বর্ম কি নাহি,
পাটা, না বিস্ক্যাস, রোষ্ট, যে প্রকার হাতে আমি তাহাকে কিনিয়া
আনিব? এ সামান্য জ্ঞান আমার নাই। আমি সভ্য ও শিক্ষিত
বলিয়া গণ্য করিতেছি, পৈতৃক উপার্জিত অর্থ কিংবা নিজে উপার্জন
করিয়া সকল রকম সুখভোগ করিতেছি, প্রতি বৎসরে নব নব সস্তানের
শিতা হইতেছি আর এ সামান্য জ্ঞান আমার নাই।

আজকার কার্যে কেন—আজকাল আমাদের সকল কার্যেই এইরূপ
ভাব—এইরূপ ভাবে দুই নৌকায় পা দিয়া আজ আমাদের
জিহ্বা, বহুযন্ত্র, বৈশিষ্ট্য, সমাজ, ধর্ম সমস্তই ধ্বংসের পথে অতি

ভুল-ভাঙ্গা

পতিতে নামিয়া চলিয়াছে 'সমস্ত কাষেই এইরূপ ছ' চাল চালিয়া
 নিজেদের সমাজের ও জাতীয়তার সর্বনাশ করিতেছি। ভক্তি, বিশ্বাস
 নাই; অথচ বাজারে নাম গইবার জন্য বাটিতে প্রতিমা পূজার ব্যবস্থা
 করিয়া। পূজার ফল লাভ করিবার জন্য নিজের নামে নকল করাইয়া
 পূজা করাইল।; কিন্তু পূজার নিমিত্ত অনুসারে নিজে উপবাস করিয়া
 না। ও এণ প্রথমতঃ আল্লাহ ভক্তি ও বিশ্বাস নাই; দ্বিতীয়তঃ উপবাস
 করিলে আমার বটে বটে; নাহি ওপূজা সম্বন্ধে হইবার পূর্বে আমি
 পরিপাটিক্রমে গাছের বালিমা এবং আমার কোনও আত্মীয় বা
 আত্মীয়া আমার ভায়া উপবাস করিলেন। নবীর পরীক্ষণার্থ
 লাগুদাত হইলে যদি আত্মীয়বর্গের মধ্যে কেহ উপবাস না করিলেন
 তাহা হইলে হয় আমার কোনও ভক্ত পরিবারে বসিয়া, না হয়
 কোনও ব্রাহ্মণ মূলা লইয়া আমার বটয়া উপবাস করিলেন। আমি
 অসমর্থ বিবাহ প্রচলনের জন্য খুব বক্তৃতা করিতেছি; 'কিন্তু সর্ব
 বিবাহ না দিয়া জাতীয় সর্বনাশ সাধন করিতেছে' এই কথা বলিয়া
 সকলকে কতই ধিকার দিতেছি; কিন্তু নিজের পুত্র-কন্যার বিবাহ
 সর্বণে দিতেছি। বক্তৃতায়, প্রবন্ধে, আলোচনে হিন্দু-ধর্মের ঘোরতর
 নিন্দা করিতেছি, অপেক্ষক হিন্দু-ধর্ম পরিত্যাগ করিবার জন্য অসংখ্য
 উপদেশ দিতেছি—এমন কি নিজে প্রকাশ্যে ও চুরি করিয়া মাদা,
 গোস্ব পণ্যাদি খাইতেছি কিন্তু নিজে চিত্তভাবে হিন্দু-ধর্ম পরিত্যাগ
 করিতেছি না—হ'য়ের মাঝামাঝি থাকিতেছি; ভিন্ন-ধর্মের আচার
 দৈনিক জীবনযাপন করিতেছি, কিন্তু পুত্র-কন্যার বিবাহ, পিতৃ-মাতৃ
 আদর, যত্নের সমস্তটিকিয়া প্রভৃতি বহুবিধ কার্য হিন্দু-ধর্মের মতো করিতেছি।

ভুল-ভাঙ্গা

করিতেছি এবং তাহার ভিতরও খিচুড়িভাব প্রবেশ করাইতেছি।
ছিনাম বড়া-সাহেব, হঠাৎ—বড়া আকারের হিন্দু না হইলেও—বড়ি
আকারের হিন্দু বনিয়া যাইতেছি (অবশ্য অল্পদিনের জন্ত)। মূর্তি
পূজার ঘোরতর নিন্দা করিতেছি; পুতুল পূজা করে বনিয়া কতই
উপভাস করিতেছি; যে ধর্ম্মে মূর্তি পূজা করিতে গলে সে ধর্ম্মের কোনও
বিধান মানিতেছি না, হঠাৎ—নিজের ভ্রাসনে মহা ধুমধাম করিয়া
শালগ্রাম শিলার প্রতিষ্ঠিত করিয়া বসিলান—এং তাহার নিত্য পূজা
বিহীন ডিরবিল চলে সেই নিমিত্ত দেবতার সম্পত্তি করিয়া ছিনাম।
আচার, ব্যবহারে, লোক-লৌকিকতায় হিন্দু-ধর্ম্মের বিধানের দাবি
দিয়া চমি না, স্বাক্ষর সন্তান হইয়া গাড়ী জপ করি না, নিজের পুত্র
বিহাতে ‘গায়ত্রী-জপ-রূপ’ মহা কুমৎস্বারের কার্য্য না করে তাহাকে
সেইরূপ উপদেশ দিতেছি, সেই ভাবে শিক্ষিত করিতেছি, দুইদিন
তাহাকে বিলাত পাঠাইব, কিন্তু তবুও হিন্দু-ধর্ম্মানুসারে তাহার
উপনয়ন দিতেছি।

এই ভাবে, এই যে দু'মুখো সাপে সূর্য্যাজের সঙ্গে দংশন
করিতেছে ইহাতে সূর্য্যাজের অঙ্গ-কত-বিকৃত হইয়া বাইতেছে
আমিরা সূর্য্য-বিষয়ে নিশিষ্টহীন হইয়াছি—কোনও বিষয়ে আমাদের
নিশিষ্টতা নাই। আজ-কাল আমাদের জাতীয় একটা বেশ পর্য্যন্ত
নাই; আমাদের জাতীয় বেশেও একটা খিচুড়ি-ভাব চুকাইয়াছে। ধর্ম্ম,
আচার, ব্যবহার, আহার, বিহার, লোক-লৌকিকতা প্রভৃতি
প্রত্যেক বিষয়েই খিচুড়ী-ভাব—কোনও কিছুতেই, ‘জাতীয় নিশিষ্টতা’
একটি যে মহা-জিনিস সে জিনিসটি নাই। এইটাই নাম কি

ভূল-ভাঙ্গা

শিক্ষা ? ইহারই নাম কি সভ্য হওয়া ? জাতীয় শিল্প-রক্ষা যেমন প্রয়োজনীয়, 'জাতীয় পরিচয়ের' জন্য বিশিষ্টতাও সেইরূপ প্রয়োজনীয় । (অপরের সহিত বেশ-ভূষার এক হইলেই প্রাণে-প্রাণে মিলন হয় না ।) একটা বিশিষ্টতা সর্ব-বিষয়ে রক্ষা করা চাই-ই চাই । নচেৎ আমাদের সমাজের চিহ্ন একেবারে লোপ পাইবে । যাহা হইয়াছে তাহা অপেক্ষা জাতীয় অবনতি আর কি হইবে ? এমন যাহা হইবার হয়— একটা হও ।

যদি প্রাক্করিতে হয় তৌশাক্তীয় বিধান অনুসারে প্রাক্কর কর— পরচন্দ্রের মতন বিধান ক্রম করিও না । যদি বল যে, 'কল শাক্তীয় বিধানের কোনও গুরুত্ব নাই ; শুধু কেবল পরমা উপাঙ্গনের ফলস্বরূপে ব্রাহ্মণগণের দ্বারা কৃত—বেশ, তাহা হইলে এই সকল বিধান একেবারে পরিত্যাগ কর ; অল্প সময় হেতাবে দিনযাপন করিয়া থাক— পিতামাতার মৃত্যু হইলেও সেই ভাবে দিন যাপন কর—প্রাক্কর ও অন্যান্য বিধির এইরূপ বৃথা অতিনয় ও অপমান করিও না ।

আর, যদি এই সব বিধান সত্য হয়—বথার্থই যদি ইহাতে পিতামাতার প্রেতরূপ মোচন ও স্বর্গবাস হয় এবং পুত্রের হাতে পিও পাইলে বথার্থই যদি তাহাদের মরলোকগত আত্মার তৃপ্তি হয়— তাহা হইলে— তাহাদের আত্মার যুক্তি ও তৃপ্তি কামনার প্রাক্করাদির আয়োজন করিয়া তাহাদের আরাধন করিয়া অনশেষে 'নিয়ম-ভঙ্গের' পূর্বে মৃত্যু করিয়া সেই কার্য পণ্ড করিলে তাহাদের কি ভয়ানক ক্রোধ, কি ভয়ানক পরিতাপ হইবে এটা কি ভাবিয়া দেখা উচিত নয় । ইহাতে কি লক্ষ্যনাশ হইয়া থাকিবে না ? একপ করিলে পরকালে কি শাস্তি হই

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

এক জন-জন-বিত্ত যে, পাশ্চাত্য সভা দ্বারা নূতন আলোক ও
শিক্ষা লাভ করিয়া কেবল কলিকাতার পাণ্ডাঘর গম্ভীর আঁতর ছিল না ।
সেই জন-জন-বিত্ত প্রদেশে বিস্তার লাভ করিয়াছিল । পূণ্য ক্ষেত্র
স্বর্গ-মন্দির-মন্দির নাহা দুই-চারিজন ধনীর গৃহে প্রথমে অল্প-বিস্তার বিস্তার
লাভ করে এবং ক্রমে, ক্রমে আরও অনেক পুরাতন ও নূতন ধনীকে
স্ব-অর্থী ভূক্ত করিয়া লয় ।

তৈরব প্রসাদ একে ৬ কালীদায়ের একজন ধনী অধিবাসী ;
কালীদায়ে তিনি একজন ধনী ও বিশিষ্ট ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত । মহুরে
তাঁহার তিন চারি খানি বাড়ি আছে—সে বাড়িগুলি ভাড়া দেওয়া হয়,
তাঁহা হইতে তাঁহার বেশ আয়ও আছে । ইহা ছাড়া নিকটবর্তী
দেহাভে বা গ্রামে তাঁহার জমিদারী আছে—তাঁহা হইতেও তাঁহার বেশ
মোট আয় আছে ।

তৈরব প্রসাদ মহুরে থাকেন না—মহুর হইতে কিঞ্চিৎ দূরে তাঁহার
একটি সুসজ্জিত ও সুন্দর বাগান-বাড়ি আছে—তিনি সেই বাগান-
বাড়িতে বাস করেন । তৈরব প্রসাদের পুত্র-সন্তান নাই, কেবল মাত্র একটি
কন্যা আছে । কিছুদিন হইল তিনি বিপদীক হইয়াছেন । এই সকল
ভাড়া-বাড়ি ও জমিদারীর জন্য ছাড়া আরও তিন চারি মহুর মুন্সী
কামনা করিয়া প্রতি মাসে উপার্জন করেন । তাঁহার ব্যবসায়ের

কেবল কেবলমাত্র কাশীধামেই সীমাবদ্ধ ছিলনা—তিনি কলিকাতা হইতে মাল ক্রয় করিতেন এবং কাশীধাম ও পশ্চিমস্থ দুই চারিটি মহর ও অনেকগুলি গ্রামে তাহা বিক্রয় করিতেন। এই ক্রয় বিক্রয় কার্য্য করিবার জন্য কয়েক জন উপযুক্ত কর্মচারী ছিল, তাহার। ভৈরব প্রসাদের প্রতিনিধি-রূপে নানা দেশে গমনাগমন করিয়া ব্যবসায়-সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিত। ভৈরব প্রসাদ তাঁহার কাশীধামস্থ আবাসে অবস্থান করিয়াই, নানারূপ মাথা খেলাইয়া ও কর্মচারিবর্গকে উপদেশ দিয়া সমস্ত ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করিতেন। ঘোবন কালে— মাল ক্রয় করিবার সময় তিনি মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় যাতায়াত করিতেন বটে কিন্তু অন্য যে সকল মহর ও গ্রামে তাঁহার দোকান ছিল—সে সকল স্থানে তিনি কখনও যাইতেন না। অধুনা ছোটাবস্থা পুঙ্খ হওয়াতে তিনি আর কলিকাতায় পর্য্যন্ত যাইতেন না। কাশীতে বসিয়াই সকল কার্য্য পরিচালনা করিতেন।

ব্যবসায়-স্থলে অনেক “খিচুড়ি-ভাবাপন্ন বাঙ্গালী” ও সাদাসংস্পর্শে আসিয়া ভৈরব প্রসাদও অনেকটা আধুনিক খিচুড়ি-ভাষা ভইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি তাঁহার বাস-বাটির ড্রয়িং-রুম সমুহেই বা সজ্জিত করিয়াছিলেন কিন্তু সেই ঘরের মধ্যে তাকিয়া বসিয়া বিছানা পাতা ছিল। ভৈরব প্রসাদ প্রতিদিন মধ্যাহ্ন ভোজের পর, আর সাদহবী-ডালে চলিয়া চেয়ারে বসিতে পারিতেন না; তিনি তখন তাঁহার বিশাল উদরে হাত বুলাইতে বুলাইতে সেই ঢালী বিছানার উপর চিৎ-পটাঙ হইয়া শুইয়া পড়িতেন। ওরূপ সময়ে হাজার গেট আসিলেও তাহার সম্মানের জন্য,—এমন কি, কোনও সুসভ্য মহিলা

ভুল-ভঙ্গা

আমি সেও—তাঁহার সম্মানের জয় এ নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে পারিতেন না। তিনি প্রতি দিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় চা পান করিতেন। কিন্তু সেই চা গঙ্গাজলে পল্লত হইত এবং তাঁহার কেমন একটি বদ্ অভ্যাস ছিল যে তিনি কোনও পানীয় বস্তু ‘লোটা’ ভিন্ন পান করিতেন না—এই জন্য তিনি ঐকু গঙ্গাজলে প্রস্তুত চা লোটা করিয়া পান করিতেন, কখনও cup (কাপ) ব্যবহার করিতেন না। শিক্ষিত ও সভ্য বঙ্গুগণের সম্মুখে, তাঁহাকে সভ্যতার গাতিরে সিগারেটের ধূমপান করিতে হইত কিছু এদিকে আবার ভরসা তামাক ঘন ঘন না খাইলে তাঁহার ক্ষুধা হইত না, রাতে সুদ্রা হইত না, সকালে উদর সার্ব হইত না—এইজন্য তিনি মধ্যে মধ্যে এই বিপদে পড়িয়া বাইতেন। তাঁহার সভ্য ও শিক্ষিত বঙ্গুগণ যদি কখনও তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়া নানারূপ সন্মতা অর্জিপে অধিক সময় অতিবাহিত করিতেন তাহা হইলে তাঁহার তামাকের ধূমপানের অভাবে ভৈরবপ্রসারের বড়ই ক্লেশ হইত। তাঁহার উদর এত অধিক ক্ষোভ হইতে আরম্ভ করিত যে কিছুক্ষণ কষ্টে তাঁহার মনে হইত যে, তিনি বুঝি বা বেলুনের মতন একমই উড়িয়া যাইবেন। কতকটা শরীর-স্বাধীন হইবার ভয়ে তিনি, ‘খুব বেশী বয়স হইয়াছে’ বলিয়া কতকটা বিবাহ দিবেন না—এই ভাৱে তাঁহার বঙ্গুবর্গের নিকট বিবাহ দিবেন হইয়াছিলেন। ‘সাহসিক কন্যা’ কথা সাজীবন অতি-সাহিত্য করিতে, তাঁহার সহিত বাহ্যতে মনোহর পূর্কই তাঁহার প্রেম হয়—এই কথা তিনি অনেক অধঃপন করিয়া অযাধ্যা থ নায়ে একটি যুগলকে তাঁহার ভাবী-স্বামী নির্বাচিত করিয়াছিলেন এবং কতকটা সহিত সুবোধে মেলা-মেশা করিতে তাঁহাকে আজ্ঞা দিয়াছিলেন—কিন্তু

তিনি স্থিরসঙ্কল্প কবিরাছিলেন যে, হিন্দু-মতে কন্যার বিবাহ দিবেন।
বলা বাহুল্য, অযোধ্যানাথও তাঁহার স্বজ্ঞাত ও স্বদর্শ।

ভৈরব প্রসাদের সন্তার নাম লছমী। লছমী সুন্দরী। তাহার
দেহের বর্ণ যেরূপ সুন্দর, তাহার মুখশ্রীও সেইরূপ মনোহর। সে
অসামান্য ও অপূর্ব সুন্দরী নয় বটে কিন্তু সে সুন্দরী; তাহাকে যে কেহ
দেখিলেই বলিলে যে, সে সুন্দরী। তাহার রূপ মুনিমনোহর নয় বটে
কিন্তু সে রূপ যে মানব-মানোহর এ কথা নিশ্চয়। এবং সে রূপ যে দুইয়া
জন-মনোহারা ও যুবা-জন-মনাকর্ষণকারী—একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়
পারে। লছমীর বয়স এখন দশদশ বর্ষ। এখন তাহার সর্বদা যে
উখলিয়া গড়িবেছে। একে এই রূপ, তাহার উপর আবার ভরা যৌবন—
ইহাকে চিক, ‘দাদু-দাদু ভরা’ মৌতে দুকল-বাপী প্লাবন’ কা বলিলে
তাঁহা যে অসম্ভব। ‘দাদু-দাদু’ মপূর্ণ প্লাবন অসম্ভব, তাহার চলচল-কায়,
মুখরোচক হাস্যগোলা—এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

লছমীর বয়স এখন পনের বৎসর সেই সময় লছমীর মাতা পরলোকে
গমন করেন। লছমীর মাতা, কন্যার বিবাহের জন্য তাঁহার নাম
ভৈরব প্রসাদের উপর পূর্ব হইতে ‘ভৈরব প্রসাদ’ নামে রাখিয়া
কবিভেলিলেন কিন্তু ভৈরব প্রসাদ একবারে গৌণ পিতা বোধিতলেন
যে, ‘অধিক বয়স না হইলে কিছুতেই কন্যার বিবাহ দিবেন না’ এই জন্য
লছমীর মাতা, স্বামীর সহিত অনেক বাদ-বিসম্বাদ ও বাক্য-এক
কাম্বালাটি করিয়াও, তাঁহার জীবিতাবস্থায় কন্যার বিবাহ দেওঁয়াইতে
পারেন না। তবু, কন্যা সম্বন্ধে ভৈরব প্রসাদের অন্তরাত্ম যে সব
অভিপ্রায় ছিল, সে সকলে তিনি প্রাণপণে বাধা দিতেন বলিয়া তাঁহার

ফুল-ভাঁস।

জীবিতাবস্থায় ভৈরব প্রসাদও সে সকল বিষয়ে বড় একটা সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন না। লছমীর মাতার মৃত্যুর পর তিনি লছমীর ভাবী-স্বামীর অনুরোধে বহু যত্ন ও অর্থব্যয় করিতে লাগিলেন কিন্তু তাঁহার প্রস্তাবানুযায়ী বিবাহ করিলে, তাঁহার স্বজাতির মধ্যে বড় একটা কলহ সম্ভব হইলেন না। সকলেই বলে যে, 'বিবাহ দিতে হয় তো। এখনই বিবাহ দাও, ও রকম ভাবে বচুর কতক 'এপ্রেটিস্' খেটে তারপরে বিবাহ দিলে তে আমরা রাজী নই।' ভৈরব প্রসাদ মহা বিপদে পড়িলেন—তাঁহার করিতে তাঁরদের মৃত্যুর ও অসম্ভ্যতার জন্য তিনি মনে মনে ভয়ানক তাঁহা হইলেন,—এত ভয়ানক রাগিলেন যে, রাগের চোটে তাঁহার সমস্ত স্বজাতিকে তিনি এক ঘরে করিয়া দিলেন। তাঁহার সুসভা বন্ধুগণ উপদেশ দিলেন যে, "ভিন্নভাবে বিবাহ দাও"—তিনি কিন্তু এ উপদেশ সম্মত হইলেন না; এর বেলায় 'সমাজ সংস্কার, জাতীয় উন্নতি,' প্রভৃতি গালভরা, বড় বড় কথাগুলি সব ভুলিয়া গেলেন।

"বাদশী ভাবনা বস্যা সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" অবশেষে, প্রায় দুই বৎসর পরে তিনি অযোধ্যানাথের সন্ধান পাইলেন।

অযোধ্যানাথ ঐ কাশীরই একজন ধনবান্ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির একমাত্র পুত্র কিন্তু বর্তমানে সে একরূপ নিঃস্বন। অযোধ্যানাথের পিতা যত দিন জীবিত ছিলেন ততদিন তাহার খুব সুখ, ঐশ্বর্য ছিল, কিন্তু তাহার পিতার মৃত্যুর পর সে একেবারে পথের ভিখারীর মত হইল। অযোধ্যার পিতার অনেক দেনা ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর সকল পাওনাদারে মিসিয়া একযোগে নালিশ ও ডিক্রী করিয়া তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি নিগাম করিয়া লইল। এইরূপে সমস্ত পিতৃ ঋণ পরিশোধ হইল

বটে অযোধ্যা কিন্তু একেবারে কপর্দক-হীন হইল ; সুখের উচ্চতরে সুখে সঞ্চরণ করিতে, করিতে সে সহসা একেবারে দুঃখের চারিদিক—অন্ধকারময় নিরন্তর-স্তরে' সবেগে নিপতিত হইল ।

এইরূপ ভাগ্য-বিপর্যয়ে অযোধ্যা প্রথম ছুই, চারিদিন একটু কাতর হইয়া পড়িলেও অতি শীঘ্রই প্রকৃতিস্থ হইল । জীবিকা-নির্বাহের জন্ত সে চাকুরীর অন্বেষণে বহির্গত হইল । চাকুরীর অন্বেষণে ঘুরিতে, ঘুরিতে সে ভৈরব প্রসাদের সহিত পরিচিত হইল । অযোধ্যা বি, এ, পাস করিয়াছিল ; তাহাকে শিক্ষিত দেখিয়া এবং তাহার পিতৃ-পরিচয় পাইয়া তাহাকে সং ও সম্ভ্রান্তবংশ-সম্মত জানিয়া ভৈরব প্রসাদ মনে, মনে সন্তুষ্ট করিলেন যে, ইহাকেই লছমীর ভাবী-স্বামী নির্বাচন করিলান । ইহারই সহিত—প্রথমে প্রেম সঞ্চারের অবসর দিয়া—পরে লছমীর সহিত বিবাহ দেওয়াইব ।

ভৈরব প্রসাদ প্রথমটার তাঁহার মনের সঙ্কল্প মনে, মনেই রাখিয়া গিলেন । ভৈরব প্রসাদ, অযোধ্যাকে বলিলেন—“দেখ বাপু তুমি সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে, তোমার বাপ একজন বিশিষ্ট লোক ছিলেন, তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব না থাকলেও পরিচয় ছিল ; এখন দুর্ভাগ্য ক্রমে তোমার এই দুর্দশা উপস্থিত হ'য়েছে বলে আমি তোমার বা, তা একটু কাছে চোকাতে পারি না । আমি তোমাকে, আমার কন্যার গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত করলুম । এই কার্যের জন্ত তুমি উপস্থিত জলপানি স্বরূপ একশত টাকা মাসিক পাবে এবং আমার বাড়ীতে থাকতে ও খেতে পরতে পাবে ।”

ভাগ্যহীন অযোধ্যানাথ এতটা আশা করে নাই । সে ভাবিয়াছিল যে, এখানে যদিও চাকুরী পাওয়া যায় তাহা হইলে বড় ঘোর পঞ্চাশ,

ভুল-ভাগা

ষাট টাকা মাহিনার একটা গোমস্তাগিরী কি মুহুরীগিরী, চাকুরী হইবে এবং তাহাকে নানা দেশে ঘুরিয়া, ঘুরিয়া কাজ করিতে হইবে। এক্ষণে এই একেবারে অপ্রত্যাশিত কথা শুনিয়া সে মহা আনন্দিত হইল। দীনের প্রতি দীননাথের এই দয়া দেখিয়া, নির্বাকবের প্রতি জগদ্বন্ধুর এই অযাচিত বন্ধুত্ব দেখিয়া, সে, সেই দয়াময়ের শ্রীচরণে মনে, মনে বারংবার প্রণাম করিতে লাগিল। এবং সেই অব্যক্ত, অচিস্তনীয় দয়াময়ের বর্ণনাতীত, ভাবাতীত দয়ার কথা স্মরণ করিতে, করিতে বিভোর হইয়া গেল; কিছুক্ষণ আর কোনও কথা কহিতে সক্ষম হইল না।

সে নীরব, কিন্তু তাহার বাহ্যিক অবস্থা দেখিয়া ভৈরব প্রসাদ তাহার মনের ভাব কতকটা বুঝিতে পারিতে ছিলেন এইজন্ত তিনিও কিয়ৎক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ এই ভাবে অতীত হইবার পর তিনি বলিলেন—“দেখ, আমার অনেক দিন হতে সাধ যে, আমার কন্যাটি বেশ শিক্ষিতা হইবে, ভাল ক’রে ইংরাজি পড়তে ও লিখতে পারবে, স্বাধীন ভাবে স্বাধীন-চিন্তা করতে পারবে, ভারত-সুশভ জড়সড় ভাব ত্যাগ ক’রে পাঁচজন শিক্ষিত, সজ্জনের সঙ্গে মিশতে পারবে। এই রকম অনেক সাধ আমার মনে আছে কিন্তু আমার পরিবারের অর্থালক্ষ্মীর^১ মার জন্তে আমি এতদিন এ সাধ পূর্ণ করতে পারিনি। যদি বল—“কেন আপনার জীতো নেয়েমানুষ এবং এখনও আমাদের দেশের এতটা উন্নতি হয়নি যে স্ত্রী, স্বামীর অপেক্ষা বয়সে বড় হবে—সুতরাং সে যেয়ে মানুষ আবার আপনার অপেক্ষা বয়সে ছোট, অতএব আপনি কেন তার কথায় কর্ণপাত করতেন?” এ কথার উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, আমার জী মেয়েমানুষ হ’লেও এবং আমার অপেক্ষা বয়সে

ছোট হ'লেও আমি তাঁকে—আমি তাঁকে—অর্থাৎ কিনা আমি তাঁকে একটু ভয় করতুম। কারণ সে স্পষ্টই ব'লত যে, আমি লছমীকে কোনও মতেই পাঁচজন পুরুষের সামনে বেকতে দোবনা। কারণ এখন সে বড় হয়েছে। আর একটা ব্যাটাছেলের কাছে ব'সে যে ঐ বুড়ো-খাড়ী মেরে লেখা-পড়া শিখবে সেটি আমি বেঁচে থাকতে হবেনা। মেরে আমার, দশবৎসর বয়স অবধি পণ্ডিতের কাছে প'ড়েছে তাতে ওর বা বিত্তে হয়েছে তাই যথেষ্ট। ও চিঠি-পত্র লিখতে, প'ড়তে ভাল রকম পারে, ভাল বই, টাইও ভাল রকম প'ড়তে পারে। যখন পণ্ডিত ছাড়িয়ে দেওয়া হয় সে সময় তো মাষ্টার রাখবার জন্তে বুলোবুলি করেছিলে কিন্তু আমি তা রাখতে দিইনি। তারপর এই দু' বৎসর চ'লে গেল—এতদিন ধ'রে ও তো নিজেই বেশ বই টাই পড়চে, চিঠি লিখচে।" এর বেশী লেখাপড়া শিখে ওর কি দরকার? এখন যা শেখবার দরকার তা আমার কাছে এই দু' বৎসর ধ'রে শিখে ও সে-কাছে পাকা হয়ে গেছে। এখন ঘর-গেরস্তানোর কাজ শেখা দরকার, সেটা ভাল ক'রে শিখিয়ে পাকা করে দিয়েছি। ওকে নিরক্ষরা বা অশিক্ষিতা বলতে তো পারবেনা। আর লেখাপড়া শেখবার ওর কোনও দরকার নেই ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কথা ব'লে তার পরে ব'লত যে, 'দেখ, আমি যা, যা বললুম তার যদি একটু এদিক ওদিক হয় বা ঐ সব কথার যদি একটুও অন্যথা কর তাহলে আমি নিশ্চয়ই গলায় দড়ি দোব।" দেখ অযোধ্যা! এই সব নানা কারণে আমি লছমীকে মনের মতন ক'রে তৈরী করতে পারিনি। তা এখন যখন আমার স্ত্রী ব্যাটারি স্বর্গে চলে গেল তখন আর কার খাতিরে মনের সাধ বিসর্জন দোব বল? সেই জন্তে তোমার

ভুল-ভাল

বিশেষ কর্ত্তর বলে দিচ্ছি যে, তুমি লছমীকে বেশ ভাল করে ইংরাজী, ফরাসী নভেল টভেল পড়িয়ে পাক্কা রকম শিক্ষিতা করে দেবে। আমার স্ত্রী যে রকম ভাব শিক্ষিতার কথা বলত' সে রকম ভাবে মেয়েকে শিক্ষিতা করলে আমার মন তৃপ্তি হবে না! লছমীকে এমন ভাবে শিক্ষিতা করবে যাতে ওর মনের স্বাধীন প্রবৃত্তির দ্বারগুলি সব একেবারে খুলে যায়; খোলা জানালা দিয়ে মুক্ত আকাশ পানে চাইলে—আকাশে উড্ডীয়মান স্বাধীন ও অবাধ-গতি পাখীর মতন স্বাধীন ভাবে ওড়বার সাধ যাতে ওর মনে হয় এমনই ভাবে ওকে শিক্ষিতা করবে। মোট-কথা, ওর মনে যাতে কোনও রকম কুসংস্কার থাকতে না পারে এমনি ভাবে ওকে শিক্ষিতা করবে—বুঝলে?

অযোধ্যা এক রকম সুখেই, ভৈরব প্রসাদের আবাসে বসবাস করিতে লাগিল। সে প্রতিদিন প্রাতঃকালে লছমীকে ইংরাজী পুস্তক পড়ায় এবং সন্ধ্যার শকুন্তলা ও মেঘ-দূতের ব্যাখ্যা করিয়া শোনায় ও পড়ায়; এতদ্ব্যতীত তাহার আরও একটি নির্দিষ্ট কর্তব্য-কর্ম ছিল; মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর প্রতিদিন মধ্যাহ্নে ভৈরব প্রসাদ যখন তাহার বিশাল ভঁড়ি উঁচু করিয়া চিং ইঁয়া গুঁয়া থাকতেন সেই সময় অযোধ্যা ইংরাজী সংবাদ পত্র পাঠ করিয়া তাঁহাকে শুনাইত।

এইভাবে প্রায় ছয়মাস অতীত হইয়া গেল। অযোধ্যা প্রথম হইতেই লছমীকে দেখিয়া একটু ভাল বাসিয়া ফেলিয়াছিল। ইহাকে অর্থাৎ—লছমীকে তাহার বড়ই পছন্দ হইত; সে লছমীকে দেখিতে বাস্তু হইত। লছমীর 'রূপরাশি, তাহার' চক্ষু—অস্ত্র সর্বলের অপেক্ষা—অধিক মনোহর, অধিক সুন্দর বলিয়া প্রতিভাত হইত; লছমীকে যখন, তখন

ভুল-ভাগা

দেখিবার জন্য তাহার মন ব্যাকুল হইত, তাহার মনে হইত যে, লছমীর সহিত যদি তাহার বিবাহ হয় তাহা হইলে বড় ভাল হয় ইত্যাদি লক্ষণ-গুলিকে যদি ভালবাসার লক্ষণ বলেন তাহা হইলে সে, লছমীকে ভাল বাসিয়া ফেলিয়াছিল।

লছমীর মনও অযোধ্যার দিকে বেশ একটু ঢলিয়াছিল। লছমী যুবতী ; স্বভাব-ধৰ্ম্মে এবং মাতার মৃত্যুর পর, পিতৃ-প্রদত্ত শিক্ষাতে ও আত্ম-বাস্তবিক কৰ্ম্মে তাহার মনটা এখন খাঁ, খাঁ করিতেছিল ; সে প্রাণের ভিতর একটা বিরাট শূন্যতা অনুভব করিতেছিল। এইরূপ সময়ে স্ত্রী, শিক্ষিত যুবক অযোধ্যাকে দেখিয়া ও তাহার সহিত মেলামেশা করিতে পাইয়া লছমীর মনে হইতেছিল যে—এখনই ছুটিয়া গিয়া উহাকে বন্ধি টানিয়া লইয়া প্রাণের শূন্য স্থান পূর্ণ করি। লছমী শান্ত শিষ্ট ও সুশীলা এবং অল্প দিন মাত্র স্বাধীনতার অল্প আশ্বাদ পাইয়াছে তাই সে তাহার মনের দুৰ্জ্জয় বাসনা মনেই চাপিয়া রাখিল। এইরূপ ভাবে মনের ভাব চাপিয়া রাখিতে প্রথমটার তাহার বিশেষ কষ্ট হয় না, কিন্তু যত দিন যাইতে লাগিল এই কষ্টের মাত্রাও তত বর্দ্ধিত হইতে লাগিল কিন্তু তবুও সে মনের ভাব চাপিয়া রাখিত এবং অযোধ্যাকেও কোনও রূপে প্রস্তাব দিত না।

শিক্ষক ও ছাত্রীর মধ্যে বেশ একটা মজার ব্যাপার চলিতেছিল। দুজনেই মনে, মনে দুজনকে চায় ; উভয়ের অনর্শন উভয়েরই পক্ষে কষ্টকর ; পরস্পরেই, পরস্পরকে পাইতে একান্ত লালসিত ; যুগলের মনের মধ্যে কথার সাগর বহিয়া যাইতেছে, একটা প্রকাণ্ড উপন্যাস তৈয়ারী হইয়া যাইতেছে কিন্তু কেহই মুখ ফুটিয়া কাহাকেও এ সবকিছ

ভুল-ভাঙ্গা

কোনও কথা প্রকাশ করিয়া বলিতেছে না। অযোধ্যা, প্রতিদিনই লছমীকে দেখিতেছে, পড়াইতেছে, তাহার সহিত নির্জনে অনেকক্ষণ ধরিয়া অবস্থান করিতেছে, চুরি করিয়া লছমীর মুখের দিকে, অবসর পাইলেই অপলক নেত্রে চাহিয়া দেখিতেছে এবং চুরি ধরা পড়িয়া গেলেই দিবা ভাগ মানুষটির মতন আকাশ পানে এমন ভাবে চাহিয়া দেখিতেছে যাহাতে বেশ স্পষ্টই মনে হয় যে—এক জন গ্রহ-তারকা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ও একাগ্রমনা জ্যোতির্বিদ—কোনও নব গ্রহ আবিষ্কারের আশায় এক মনে আকাশ পানে চাহিয়া গ্রহগণের গতিবিধি নিরীক্ষণ করিতেছে।

লছমীর অবস্থাও ঐ রকম, তবে চুরি বিদ্যায় সে অযোধ্যার অপেক্ষা কিছু কম পারদর্শিনী এবং তাহার চুরি যখন ধরা পড়িয়া যায় তখন সে আকাশ পানে চাহেনা—টপ্ করিয়া তাহার নিজের পদ-যুগলে পরিহিত জুতা জোড়াটির পানে এমন ভাবে চাহিয়া থাকে যাহাতে মনে হয় যে, সেই জুতা জোড়াটার ভিতর, সে এমন কিছু শোভা দেখিয়াছে, যাহা অপলক নেত্রে ও বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে দেখিয়াও তাহার মনে তৃপ্ত হইতেছে না।

দূরে, দূরে থাকা এক রকম মনের ভাল। এ রকম কাছে থাকিয়া—যাহাকে বন্ধের উপর ধরিতে ইচ্ছা করে তাহাকে বন্ধে ধরিতে পাইব না, যাহাকে প্রাণের কপাট খুলিয়া প্রাণের গোপন-কথা বলিতে ইচ্ছা করে তাহাকে তাহা বলিতে পাইব না—বলি, বলি করিয়াও বলিতে পাইব না এটা বড়ই দুঃখময়, বড়ই হৃদয় ভেদী, প্রায় প্রাণ-ঘাতী ব্যাপার। এইরূপ সাংঘাতিক অবস্থার প্রায় ছয় মাস অতীত হইয়া যাইবার পর, একদিন মধ্যাহ্নে ঠৈরব প্রসাদ ইহাদের নিকট নিজের মনো-

ভুল ভাঙ্গা

ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে—“দৈখ লছমী আমি মনে করছি যে অযোধ্যার সঙ্গে তোমার বিয়ে দোব—এসম্বন্ধে তোমার যদি কোনও আপত্তি থাকেতো আমার বলে। আর অযোধ্যা তুমিও শোন—দেখ তুমি শিক্ষিত ও সম্রাটবংশীয় স্ত্রী যুবক, তোমাকে আমি লছমীর স্বামী নির্বাচিত করলে, লছমীর প্রতি আমার কোনও অবিচার করা হবেনা বা তার প্রতি আমার কর্তব্যের কিছু ক্রটিও হবেনা। আমি যে রকম ভাবে লছমীর বিবাহ দিয়ে আমার স্বজাতীর মধ্যে একটা সং দৃষ্টান্ত স্থাপন করে যেতে চাই সেই রকম ভাবে বিবাহ দেবার যোগ্য পাত্র তুমি। এই সকল নানা কারণে আমি ইচ্ছা করি যে, তোমার সঙ্গেই লছমীর বিবাহ দোব। আমার ধারণা যদি ভ্রান্ত না হয় তাহলে বোধ হয় তোমরা স্বীকার করবে যে—তোমাদের উভয়েরই উভয়ের প্রতি একটু ভালবাসার সঞ্চার হয়েছে। এটা যদি ঠিক হয় তাহলে তোমরা স্থির জেনো যে তোমাদের প্রণয় ব্যর্থ হবে না, তোমাদের দুজনের বিবাহ দিয়ে আমি তোমাদের দুটিকে এক ক’রে মিলিয়ে দোব। তবে কিঞ্চিৎ বিলম্বে; আরও কিছু দিন গত হোক, তোমাদের ভালবাসাটা আরও বর্দ্ধিত হোক, তার পর শুভমিলন হবে।”

তৈরব প্রসাদের মুখে এই সকল মধুময় কথা শুনিতে শুনিতে অযোধ্যা ও লছমীর মনে হইতেছিল যে, তাহাদের কর্ণে যেন মধু বৃষ্টি হইতেছে। তৈরব প্রসাদের কথা শেষ হইতেই লছমী আরক্ত-বদনে ও সলজ্জভাবে সেই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। তৈরব প্রসাদ ভাবিলেন যে—কল্লার লজ্জা হইয়াছে তাই সরম ভরে পলায়ন করিল। অযোধ্যা ভাবিল যে—লছমীর বোধ হয় তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা নাই তাই সে

ভুল-ভাঙ্গা

বিরাগ ভরে পলায়ন করিল। লছমী সম্বন্ধে তৈরব প্রসাদ ও অযোধ্যা উপরোক্ত যে ধারণা মনে, মনে পোষণ করিতেছিল তাহাতে উভয়েরই ভুল হইয়াছিল। আমাদের ধারণা যে—‘লছমী সরম ভরে কিংবা বিরাগ ভরে সেই ঘর হইতে পলায়ন করে নাই। তাহার পিতা মখন তাহার বিবাহের কথা বলিতেছিলেন তখন তাহার কর্ণে মধু বর্ষিত হইতেছিল— পিতার সেই মধু-বর্ষী কথা অধিকক্ষণ ধরিয়া শুনিতে পাছে তাহার কাণে অধিক মধু জমিয়া গিয়া পিপীলিকা ধরিয়া যায় কিংবা মধুলোভে মত্ত অনিকুল আসিয়া কটাস-কামড়ে কর্ণমূল ফুলাইয়া দেয়—এই ভয়ে সে, সেই ঘর হইতে পলায়ন করিয়াছিল।

যেদিন মধ্যাহ্নে তৈরব প্রসাদের নিকট হইতে তাহারা জানিতে পারিল যে, তাহাদের উভয়ের মিলন হইবে সেই দিন সন্ধ্যার পর লছমীর পড়িবার সময়, পড়িবার ঘরে প্রবেশ করিতে, শিক্ষক ও ছাত্রী উভয়েরই একটু লজ্জা হইতেছিল। ঠিক সন্ধ্যা সাত ঘটিকার সময় পাঠ আরম্ভ হইত, আজ সাড়ে সাতটা বাজিয়া গিয়াছে কিন্তু পাঠ-গৃহ নির্জন; তথায় শিক্ষক ও ছাত্রী কেহই নাই। তাহাদের দুজনেরই লজ্জা করিতেছিল বটে কিন্তু পাঠ-গৃহে যাইবার জন্ত ও প্রাণের ভিতর প্রবল ইচ্ছা হইতেছিল। এই রকম “লজ্জা-লজ্জা করে আবার ইচ্ছে ইচ্ছেও করে” ভাবটা বেশীক্ষণ আর স্থায়ী হইল না। যখন আট ঘটিকা বাজিয়া গেল, তখন উভয়েরই মনে হইল যে—“আর বিলম্ব করা হবেনা—এইবার পড়ার ঘরে যেতেই হবে।”

• অযোধ্যা অপরাহ্ন হইতেই উদ্ভানে ভ্রমণ করিতেছিল, লছমী তাহার পিতার নিকট বসিয়া—পিতার, ও পিতার নিকট সমাগত পিতৃ-বন্ধুগণের

ভুল-ভাঙ্গা

গল্পগুস্তব প্রবণ করিতেছিল। আট ঘটিকা বাজিতেই, প্রণয়-দেবতার অদৃশ্য হস্তের রজ্জু আকর্ষণে উভয়েই, বিভিন্ন স্থান হইতে পাঠ-গৃহাভিমুখে আগমন করিতে লাগিল।

লছমীর পাঠ-কক্ষ বাটির মধ্যস্থলে অবস্থিত। পাঠ-কক্ষের সম্মুখ দিয়া একটি দীর্ঘ পথ, বাটির দুই প্রান্তস্থিত বারান্দায় গিয়া মিলিয়াছে। সেই পথের এক দিক হইতে লছমী তাহার পাঠ-কক্ষাভিমুখে আসিতেছে। প্রাণে প্রবল ইচ্ছা—তবুও, কি একটা অজ্ঞাত লজ্জার তাহার মনটাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, প্রতিদিনই এই ঘরে সে প্রবেশ করে—তাহার পিতা হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য দাস, দাসী পর্যন্ত তাহাকে প্রবেশ করিতে দেখে এবং সেজন্য তাহার কোনও প্রকার লজ্জা, কোনও দিনই হয় নাই। আজ কিন্তু—পাছে তাহাকে কেহ দেখিয়া ফেলে—এই কারণে তাহার বড়ই লজ্জা হইতেছিল। এই প্রকার লজ্জায়, সে পশ্চাৎ দিকে মুখ ফিরাইয়া—কেহ আসিতেছে কি না—দেখিতে, দেখিতে, পিছু হাঁটিতে হাঁটিতে তাহার পাঠ-কক্ষের দিকে অতি সন্তর্পণে চলিয়াছে। অবোধার মনের ও আজ ঠিক ঐ অবস্থা, লছমীর মত সেও পিছু হাঁটিতে, হাঁটিতে পাঠ কক্ষের দিকে অতি সন্তর্পণে চলিয়াছে। এইরূপ ভাবে পিছু হাঁটিয়া চলিতে, চলিতে তাহার দুইজনে পাঠ-কক্ষের সম্মুখে আসিবামাত্র দুইজনের দেহে, দেহে ঠেকিয়া গিয়া, দুইজনেই পশ্চাৎ দিক হইতে একটা ধাক্কা খাইল। ধাক্কার চোটে চমকিত হইয়া দুজনেই একযোগে চকিতে পশ্চাৎ দিকে ফিরিল। পশ্চাৎ ফিরিয়াই উত্তরে উত্তরকে দেখিতে পাইয়া প্রথমে বিস্মিত, চমকিত, পুলকিত হইয়া অবশেষে কিরংকণের জন্ত উভয়েই বাহুজ্ঞান হারাইল। অল্পকণ পরে যখন তাহাদের বাহুজ্ঞান ফিরিয়া

ভুল-ভাঙ্গা

আসিল তখন উভয়ে দেখিল যে, তাহারা দুইজনেই দুইজনের সবেগ-আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ এবং উভয়েরই ওষ্ঠাধর সুখা পানে নিযুক্ত।

বাস্—এইদিন হইতে লছমী, অযোধ্যার সহিত ভাল রকম মেলামেশা ও গল্প-গুজব করিতে আর ইতঃস্ততঃ করিত না। অযোধ্যাও আর, লছমীকে প্রাণের কথা বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিত না। এই দুই প্রণয়ী-যুগলের মধ্যে সম্বংশ-সুলভ-নৈতিক-জ্ঞানজাত যে একটা সঙ্কোচ ছিল—যে সঙ্কোচ ইহাদের দুজনকেই, পরস্পরের সহিত প্রেমভাবে মেলামেশা করিতে ও প্রণয়-গুজবে মত্ত হইতে বিরত রাখিত—তৈরব প্রসাদের মুখ হইতে বিবাহের আশা প্রাপ্ত হওয়াতে ইহাদের সেই সঙ্কোচ বিদূরিত হইল। সেইদিন হইতে—‘কে, কাহাকে অধিক ভালবাসে’—‘কাহার ভালবাসা অধিক গভীর’—‘সর্বাগ্রে কে ভালবাসিয়াছিল’ প্রভৃতি চির-প্রচলিত ও চির-পুরাতন অগচ্চ চির-নূতন মধুময় ব্যাখ্যালাপে ইহাদের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত। এই মধুময় আলাপে মগ্ন হইয়া ক্রমাগত একাগ্র-অনুশীলন করিতে করিতে যখন ইহারা একটু ক্লান্ত হইয়া পড়িত তখন মধ্যে মধ্যে পরস্পরে পরস্পরের অধর-সুখা পান করিয়া চাঙ্গা হইয়া উঠিত; আবার দ্বিগুণ উৎসাহে আড়ে-হাতে লাগিয়া যাইত।

এইভাবে আরও ছয় মাস অতীত হইয়া গেল। এখন প্রণয়ের কথার ও মধ্যে মধ্যে মুখ-চুষনে আর ইহাদের মন উঠিতেছে না। বিবাহের জন্ত উভয়েরই মন মহা ব্যস্ত হইয়া উঠিল। এ বিষয়ে একদিন দুজনে অনেকক্ষণ ধরিয়া অনেক রকম পরামর্শ করিয়া অবশেষে তৈরবপ্রসাদের নিকট নিজেদের মনোভাব প্রকাশ করিল।

তৈরবপ্রসাদ একদিন প্রাতঃকালে একখানি ভাল কুশন্ চেয়ারে

ভুল-ভাঙ্গা

হুই পা তুলিয়া উবু হইয়া বসিয়া, হুই হাতে একটি লম্বা কলিকা ধরিয়া ভূরুা তামাকু সেবন করিতেছিলেন। এটি তাঁহার নিত্য-কর্ম এবং এ সময় তাঁহার মনটি বড়ই প্রফুল্ল থাকে। অযোধ্যা ও লছমী তাঁহার এই ক্ষুণ্ণের সময় তাঁহার নিকট একত্রে আগমন করিল। ভৈরবপ্রসাদ মনের স্মৃথে ভূরুা থাইতেছিলেন, এইজন্য উহারা উভয়ে দণ্ডায়মান থাকা সত্ত্বেও প্রথমটায় কোনও কথা কহিলেন না। কিছুক্ষণ ধূমপান করিয়া অবশেষে একটি দীর্ঘ ও স্মৃথটান টানিয়া, একমুখ ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে উহাদের হুইজনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—“কিহে অযোধ্যা তোমরা দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বোস’, বোস’ একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে ব’সে পড়ো—লছমী তুইও মা বোস্।”

প্রেমিক-যুগল কিন্তু বসিল না এবং কোনও কথাও কহিল না, পূর্ববৎ ভাবে নীরবে দণ্ডায়মান হইয়া রহিল। তাহাদের এইরূপ ভাব দেখিয়া ভৈরবপ্রসাদ বিস্মিত হইলেন এবং বলিলেন,—“কিহে তোমরা ব’সছনা যে? আর আমার মুখের দিকে ওরকম ফাল্-ফাল্ ক’রে চেয়ে, হাত-জোড় ক’রে দাঁড়িয়ে র’য়েছ যে? কি ব্যাপকরটা বল দেখি শুনি?”

অযোধ্যা সহসা হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িয়া করযোড়ে বলিল,—“আমাদের প্রতি আপনি দয়া করুন; দয়া ক’রে আমাদের দু’জনের বিবাহ-কার্য সম্পাদন কর্তে অনুমতি দিন।”

ভৈরবপ্রসাদ বলিলেন,—“ব্যা, কি ব’ল্ছ হে! বিবাহ-কার্য সম্পাদন কর্তে অনুমতি দোব কিহে! ওহে, ওকি কথা হে!”

অযোধ্যা বলিল,—“আজ্ঞে এ বিষয়ে আমরা উভয়ে একমত হ’য়ে

ভুল-ভাঙ্গা

আপনার চরণে নিবেদন জানাতে এসেছি। আপনি দয়া ক'রে আমাদের বিবাহ দেবার——”

ভৈরবপ্রসাদ চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—“বিবাহ—বিবাহ—ও কথাটি ভুলে যাও—ওটি এখন হ'চ্ছে না। আরও তিনটি বৎসর চূপ ক'রে থাকতে হবে। লছমীর বয়েস এখন সতেরো বৎসর; আরও তিন বৎসর পরে, লছমীর বয়েস কুড়ি বৎসর হ'লে পরে, তবে আমি তোমাদের বিবাহ দোব। যদি অল্প বয়েসেই বিয়ে দোব তাহ'লে তো লছমীর মার ইচ্ছামত অনেকদিনই ওর বিয়ে দিয়ে দিতুম। তা'হলে কি আর ওকে লেখাপড়া শেখাতুম, না তুমি ওর সঙ্গে মেলামেশা করবার সুযোগ পেতে। ওকথা এখন ভুলে যাও। এখন দু'জনে দু'জনকে ভালবেসে যাও, কেবল ভালবেসে যাও। দু'জনে দু'জনকে ভালবেসে মিত্রতা বর্দ্ধিত কর; সহযোগীতা ক'রে আত্মীয়তা বর্দ্ধিত কর—বুঝলে? তারপর তিন বছর বাদে বিবাহ।”

অযোধ্যা বলিল,—“আজ্ঞে আনরা দু'জনই দু'জনকে খুব ভালবেসেছি আর উভয়ের বিচ্ছেদ উভয়ের পক্ষেই বড় কষ্টকর হয়ে পড়েছে।”

ভৈরবপ্রসাদ বলিলেন—“ও ভালবাসা কোনও কর্মের নয়। এত অল্পদিনে ভালবাসা হ'তে পারে না। এখনও আরও তিন বৎসর ভালবেসে যাও—কেবলমাত্র ভালবেসে যাও, আর কিছু নয়—খালি ভালবাসা। তোমরা পরস্পরে পরস্পরের স্বামী-স্ত্রী হবে, এই কথা মনে রেখে ঐ ভাবে দু'জনে দু'জনকে ভালবেসে যাও। কিন্তু কার্যতঃ দু'জনে ভাই-ভগ্নীর মতন ব্যবহার করো—বুঝলে?”

অযোধ্যা মাথা মাড়িয়া সন্মতি জ্ঞাপন করিল। লছমী পূর্ক হইলেন

কোনও কথা কহিতেছিল না ; এখনও নীরবে রহিল । ভৈরবপ্রসাদ
এ সকল কথাগুলি বলিয়া, সেই কক্ষ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিলেন,
কিন্তু একটুখানি অগ্রসর হইয়াই পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন এবং
বলিলেন,—“দ্বাধ, আমি তোমাদের দু'জনেই বেশ ভাল ক'রে বলে
দিচ্ছি যে, 'তোমরা ভবিষ্যতে দু'জনে, দু'জনের স্বামী-স্ত্রী হবে, এই
কথাটি বর্তমানে কেবলমাত্র মনে মনে জানবে । কিন্তু কার্য্যতঃ তাই-
ভগ্নীর মতন ব্যবহার দু'জনেই করবে । এই কথাটি বিশেষ ক'রে মনে
রাখবে । অযোধ্যা, তুমি এখন লছমীকে লেখাপড়া শেখাও, লছমী
শিখুক । তুমি এখন পাশ্চাত্য জগতের নানাদেশের ও নানা পুস্তকের—
নানারকম গল্প-গুজব কর, লছমী সে সব শুনুক । পাশ্চাত্য দেশের নানা
রকম উপভাস প'ড়ে, তোমরা এখন প্রকৃত ভালবাসা কি, তাই শিক্ষা
কর ; তারপর অন্য কথা । যা যা ব'ল্‌লুম বেশ ক'রে দু'জনে মনে
রাখবে, নইলে আমি অনর্থপাত ক'রব ।” এই কথা বলিয়া তাহার সদাসর্বদার
সঙ্গী লাঠিগাছটি ঠক্ ঠক্ শব্দে ভূমে ঠুকিতে ঠুকিতে সবেগে প্রস্থান করি-
লেন । অযোধ্যা ও লছমী নীরবে হতভম্বের প্রায় দণ্ডায়মান হইয়া রহিল ।

এই ঘটনার পর একমাস অতীত হইয়া গিয়াছে । ভৈরবপ্রসাদ
পূর্ব হইতেই অধিকাংশ সময়ই লছমী ও অযোধ্যাকে নিজের কাছে^১ কাছে
রাখিতেন ; এই ঘটনার পর হইতে যে সময়টা তাহারা নির্জনে থাকিবার
অবসর পাইত, সেই সময়ের মধ্যেও একাধিকবার তাহাদের নিকটে
সহসা গমন করিয়া, তাহারা কি করিতেছে, তাহার উপর লক্ষ্য রাখিতেন ।
এই সময় হইতে সকলেই দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রণালীর কিঞ্চিৎ
কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হইয়া গেল ।

ভুল-ভাঙ্গা

প্রতিদিন প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোথানের পর প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে তৈরবপ্রসাদ তাঁহার ড্রয়িংরুমে বসিয়া চা পান করিতেন— এই সময় লছমী ও অযোধ্যাকে তাঁহার নিকটে বসিয়া চা পান করিতে হইত। চা পানের কিয়ৎক্ষণ পরে, লছমী অযোধ্যাকে সঙ্গে লইয়া তাহার পড়িবার ঘরে প্রবেশ করিয়া পড়িতে বসিত। তাহাদের পড়াশুনা দুইঘণ্টা অবধি চলিত। তৈরবপ্রসাদ এই দুইঘণ্টাকাল ড্রয়িং রুমে বসিয়া চিঠিপত্র পড়িতেন এবং কর্মচারীবর্গকে লইয়া বৈষয়িক কর্ম সম্পাদন করিতেন। তৎপরে স্নানাদির পর কত্থা লছমী ও ভাবী জামাতা অযোধ্যাকে লইয়া অন্তরমহলে প্রবেশ করিতেন এবং তথাকার ভোজন কক্ষস্থলে বিস্তৃত তিনখানি কার্পেটের আসনের উপর বসিয়া তিনজনে একত্রে মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপন করিতেন। আহারাদির পর তিনজনেই আবার ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করিতেন। এ সময়টা তিনজনে নানাক্রপ গল্পগুজব ও সংবাদপত্র পাঠে অতিবাহিত করিতেন। তৎপরে অপরাহ্নে—তিনজনেই উদ্যানে যাইতেন। উদ্যানে গমন করিয়া তৈরবপ্রসাদ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেন ও উদ্যানের কার্যাদি পরিদর্শন করিতেন। অযোধ্যা এই সময়টা কোনও দিন উদ্যানের মধ্যে ভ্রমণ করিত আবার কোনও দিন বা উদ্যান হইতে বাহির হইয়া সদর রাস্তার উপর খানিকটা বেড়াইত; কোনও দিন বা গাড়ী জোতাইয়া সহরে চলিয়া গিয়া খানিকটা ঘুরিয়া আসিত। লছমী এই সময়টা পিতা বা অযোধ্যা কাহারও নিকট থাকিত না। তাহাদের উদ্যান বাটির দুই চারিখানি বাটির পরে মিঃ ঘোষা নামে একজন বিলাত কেরত বাঙ্গালী পত্নী ও পাঁচটি কত্থা লইয়া বাস করিতেন। মিঃ ঘোষার এই পাঁচটি কত্থার মধ্যে তিনটি বুবতী

ও দুইটি কিশোরী। এই পাঁচটি কন্যার সহিত লছমীর খুব ভাব ছিল। আমরা এই পাঁচটি কন্যাকে অতঃপর লছমীর সঙ্গিনীগণ বলিয়া অভিহিত করিব। ইহাদের সহিত আর দুই একবার আপনাদের সাক্ষাৎ হইবে।

এই অপরূহ সময়ে—লছমী কোনও কোনও দিন মিঃ ঘোষার বাটিতে গমন করিয়া তাহার সঙ্গিনীগণের সহিত নানারূপ ক্রীড়া কৌতুকে অতিবাহিত করিয়া সন্ধ্যার পর গৃহে প্রত্যাগমন করিত; আবার কোনও কোনও দিন বা তাহারা লছমীদের বাটিতে আগমন করিত এবং সকলে মিলিয়া টেনিস খেলিত। মিঃ ঘোষার বাটার চারিদিকে—ভৈরব প্রসাদের উদ্যান বাটির মতন—অনেকটা করিয়া খোলা জমি নাই। তাহার বাটিটিও ক্ষুদ্র এবং বাটির চারিপাশে যেটুকু সামান্য জমি খোলা অবস্থায় পতিত আছে তাহাও আবার নানারূপ বাহারী গাছ ও ফুলের পরিপূর্ণ, সেইজন্য বিদ্যুী কন্যাগণের প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও তথায় টেনিস কোর্ট নাই এবং এই জন্যই তাহারা ভৈরবপ্রসাদের উদ্যানস্থ সুবৃহৎ টেনিস কোর্টে আসিয়া মধ্যে মধ্যে লছমীর সহিত টেনিস খেলিয়া যায়।

সন্ধ্যার পর ভৈরবপ্রসাদ কন্যাকে ডাকিয়া লইয়া বাটির ভিতর প্রবেশ করিতেন এবং বাটির পশ্চাদিকস্থ বৃহৎ গাড়ী-বারান্দার ঝুটপরিভাগে বাইরা উপবেশন করিতেন। এই সময়ে ভৈরবপ্রসাদের—মিঃ ঘোষার স্ত্রী—তিন, চারিটি সুসভ্য বন্ধু আগমন করিতেন। অযোধ্যা যেখানেই ঘাউক না কেন, এই সময়ের পূর্বে প্রত্যাগমন করিয়া তাহাকেও এই স্থানে উপবেশন করিতে হইত। এই সময় সকলে নানারূপ মিষ্টান্ন সহ-যোগে চা পান করিতেন। চা পানের পর বন্ধুগণের সহিত ভৈরবপ্রসাদ

ভুল-ভাল

তাস খেলিতে বসিতেন এবং অযোধ্যাকে লইয়া লছমী পড়িবার ঘরে চলিয়া যাইত।

ভৈরবপ্রসাদ তাস খেলিতে, খেলিতে তথা হইতে মধ্যে, মধ্যে উঠিয়া যাইতেন এবং লাঠি গাছটি ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে সহসা লছমীর পড়ার ঘরে প্রবেশ করিয়া—তাহারিা দুই জনে—‘প্রণয় গুঞ্জে মাতিয়াছে কিনা’—সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতেন। এই গোয়েন্দাগিরি দুটি বেলা, পড়িবার সময় হইত; এই জন্ত লছমী ও অযোধ্যাকে একটু সম্মত থাকিতে হইত। বটে কিন্তু অবশেষে একটি কারণে তাহাদের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল।

ভালবাসা দিন, দিন বাড়িতেই থাকে; কমিবার দিকে যায় না। পঃস্বপ্নের সঙ্গ-সুখ লাভ করিবার দারুণ পিপাসা ও অমৃতময় প্রণয়-গুঞ্জে মাতিবার অদম্য ইচ্ছা, প্রেমিক-প্রেমিকার মনে সদাই বলবতী হয়। এতেন্তে বিবাহ হইল না এবং বিবাহের আশায় এখনও দীর্ঘকাল ক্ষুণ্ণ প্রাণে অবস্থান করিতে হইবে; তার উপর আবার, সেটুকু মধুময় প্রণয়-আলাপ ও দুই চারিটি চুশন বিনিময় হইতেছিল, সেটুকুও ভৈরবপ্রসাদের কড়া কড়িতে ও গোয়েন্দাগিরিতে বন্ধ হইল—এই দুই কারণে লছমী ও অযোধ্যার মনে মহা দুঃখ ও নিরাশাব সঞ্চার হইল। দুজনেই—নিজের, নিজের জীবন বুঝা ভাবিল। দুজনেরই মনে হইল যে, ‘এ প্রাণ আর রাখিল না।’ দিবসের অধিকাংশ সময়ই ভৈরবপ্রসাদ, তাহাদের কাছে, কাছে রাখেন; এক পড়িবার সময় তাহারা একটু নির্জনে থাকিতে পায় বটে কিন্তু তাহাতেও ঐ প্রবল প্রতিবন্ধক। তাহারা পড়িবার ঘরে প্রবেশ করিয়া প্রথমে একখানি বই লইয়া অতি অল্পকাল পড়িতে থাকে তারপর ক্ষুণ্ণ সেই একটু প্রেমালোকে মগ্ন হইয়াছে অমনই ভৈরবপ্রসাদ ‘বা তা’ একটা

বাঞ্চে ছুতানাত্ত'র সেই বরে 'যখন তখন' প্রবেশ করিতেন—অমমই বাধা হইয়া তাহাদিগকে প্রেমালাপ বন্ধ করিতে হইত। এইভাবে ক্রমাগত বাধা পাঠিয়া তাহারা অতীব নিরাশ হইয়া প্রেমালাপ বন্ধ করিল।

'প্রণয়েব-ঠাকুর' চিরদিনই 'প্রেমিক-প্রেমিতার' সত্য। তিন চারি দিন পরে ইহারা দুই জনে লক্ষ্য করিয়া দেখিল যে, ভৈরব প্রসাদ যখনই গোয়েন্দাগিরি করিতে আসেন, তখনই ঠক—ঠক করিয়া একটা শব্দ হয়। এই ঠক-ঠক শব্দ তাহাদের নৃত্যদেহে জীবন-সঞ্চার করিল। বহুফণের বিরতির পর তাহারা পড়িবার বরে মিলিত হইয়াই—সর্বপ্রথমে একটি চুপন বিনিময় করিত। তার পরে দুই জনে দুই খানি বহি সম্মুখে খুলিয়া রাখিয়া প্রণয়-গুঞ্জান মত্ত হইত। কারণপর সহসা যেই ঠক-ঠক শব্দ শ্রুতিতে পাই, অগ্নি পুণ্ডকে মনঃসংযোগ করিত।

জরুলতাই বলুন, আঃ নদ্রা-দোষই বলুন, যাহাই হউক একটি স্নায় ভৈরব প্রসাদের 'ভুল'। ভৈরব প্রসাদ 'যখন তখন' তাহার নিশাল উদরে হাত না বুধাইয়া থাকতে পারিতেননা এবং একগাছি মোটা বাঁশের লাঠি ভুলে ঠক-ঠক করিয়া না চুকিয়া এক পদ ও চালতে পারিতেননা। এই 'মোটা, বাঁশের লাঠি গাছটি এক দণ্ডও কাছ-ছাড়া করিতেন না; সন্ধ্যা-সন্ধ্যাত মগ্নে রাখিতেন, এমন ১০ শয়নকালেও এটিকে খাটের পার্শ্বে রাখিয়া শয়ন করিতেন।

কিছুদিন গোয়েন্দাগিরির পর ভৈরব প্রসাদের দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে, 'তাহার আদেশ লক্ষ্য ও অবোধ্য্য যথাবথ ভাবে পালন করিতেছে— তাহারা ঠিক ভাই—ভগ্নীর ব্যবহারে চলিতেছে।' এই বিশ্বাসে তিনি নিশ্চিত ছিলেন।

একটু

বেকাইনি ;

ভুল-ভাল

লছমী প্রতিদিন সক্যার পর সাতটা হইতে 'নয়টা' অবধি পড়িত। ভৈরবপ্রসাদ তাঁহার নক্স-বাক্সবক্স লইয়া বাজি এগার ঘটিকা অবধি তাম খেলিতেন। প্রতিদিন পড়িবার পর লছমীকে দ্বাত্র নয়টা হইতে এগারটা অবধি পিতার ও তাঁহার বক্স-বাক্সবগণের নিকট বসিতে হইত। ভৈরবপ্রসাদ লছমীকে বিশেষ কারয়া আদেশ দিয়াছিলেন যে, আনাদের দ্বারা তাম খেলার সময় তুমি প্রতিদিন সেইখানে এসে বসে থেলা দেখবে আর আমার শিক্ত ও দণ্ড নক্সগণের সঙ্গে মিশবে, আনাদের গল্পগুচ্ছ শুনবে—তাহলে তুমি দণ্ড-ভগণের অনেক কায়দা-বারন শখতে পারবে, বদুর্বা হতে পারবে।

বাঁও সাড়ে নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। অযোধ্যা ও লছমী এখনও পড়িবার ঘরে বসিয়া গুচ্ছ-গুচ্ছ-কুম-ফুম কাঁবতেছে। 'নারা-শক্ষা' সম্বন্ধে একটি চংরাঙী প্রবন্ধ লিখিতে ভৈরবপ্রসাদ আদেশ করিয়াছিলেন সেই-কল্প গত-কলা এবং অগ্ন লছমী বড়ই ব্যস্ত ছিল। প্রবন্ধটিও অগ্ন ভৈরব-প্রসাদ খুব তাড়া লাগাইয়াছিলেন সেইকল্প লছমী এই দুই দিন একেবারে প্রোক্ষালিপের অবসর পায় নাই। প্রায় সাড়ে নয়টার সময় প্রবন্ধটি শেষ করিয়া, কাগজ-পত্রগুলি গুছাইয়া রাখিয়া লছমী ও অযোধ্যা দুই চারিটি ভালবাসার কথা কহিয়া যেই একটি চুইন করিবার উত্তোগ করিয়াছে এমন সময় এক ঠেল ঠক্-ঠক্-ঠক্। ঠক্-ঠক্ শব্দ শুনিতে পাইয়াই তাহারা চমকিয়া উঠিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। অযোধ্যা টপ্ করিয়া এক-খানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল; লছমী প্রবন্ধের কাগজগুলি ইতস্ততঃ শিক্ত করিয়া পুনরায় সেগুলি গুছাইতে লাগিল। ঠক্-ঠক্ শব্দে ভূনিতে করত যে-কিভাবে, কিসে ভৈরবপ্রসাদ সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া একবার ঘরের

চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন তৎপরে লছমী ও অযোধ্যার মুখের উপর একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—“রাজি নাড়ে নয়টি কখন বেজে গেছে, এখনও আমাদের খেলার ভায়গার কেন গেল না লছমী? তোমার না বিশেষ ক’রে বলে দিয়েছি যে আমি যখন ঐ সব বড়, বড়, রথী, রথী বন্ধু নিয়ে গল্পগুজব ক’রব বা তাম খেলব সে সময়টা তুমি সেখানে বসবে, তাহলে তোমার বিশেষ উপকার হবে। কিন্তু আমি আশ্চর্য্য হই যে তুমি আমার বন্ধু-বান্ধবের সাক্ষিত মেনামেলা ক’রে জ্ঞান লাভ ক’রতে কেন প্রায়ই অবহেলা কর? তোমার তিন, চার বার ক’রে ডাকলে তবে তুমি বাও—তাঁহে নেহাৎ অনিচ্ছা সত্ত্বে। ছিঃ হুঃ তোমার এত ব্যবহার বড় দুঃখজনক এবং—এবং—কি বলব?—হ্যাঁ, অত্যন্ত নকারজনক।”

লছমী বলিল—“বাবা তোমার ঐ সব বড়ো বন্ধুদের তত্ত্বদ্বয়ে আলপি জনতে, জনতে আমার বিবর্ত ধরে গেছে। একবারে না গেলে নেহাৎ তুমি মনে এষ্ট ক’রবে—তাই এক একবার যাই। তা ছাড়া “নারী-শিক্ষা” প্রবন্ধটা শেষ করবার ক্ষেত্রে তিন, চার বার তাড়া দিবে গেলে সেই প্রবন্ধটা শেষ করলুম তাই আজ একটু দেরী হয়ে গেল।”

ভৈরবপ্রসাদ বলিলেন—“প্রবন্ধটা শেষ করে ফেলেছ? বাঃ—বাঃ বেশ, বেশ। অযোধ্যা তোমার শিক্ষাদান-কার্য্য বেশ ভাল ফল প্রসব করেছে। তোমার উপর আমি বড় সন্তুষ্ট হয়েছি—আমি ভাল দেখে একটা সোণার হাত-বাঁড় তোমার উপহার দিতে চাই। তুমি কাল নিজে পাঞ্জারে গিবে পছন্দ করে কিনে আনবে; দুখালে? এখন এস—গাড়ী বারান্দায় এস।”

স্বপ্ন-ভাঙ্গা

ভৈরবপ্রসাদ ভূমে লাঠি ঠুকিতে ঠুকিতে ঠক-ঠক শব্দে গাড়ী বারান্দার দিকে চলিলেন, অবোধা ও লছমী তাঁহার পশ্চাদাঙ্গসরণ করিল।

সকলে গাড়ী-বারান্দায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আজ আর হাস খেল হইল না। ভৈরব-প্রসাদ গাড়ী-বারান্দায় উপবিষ্ট বন্ধুগণের সম্মুখে আজ কেবলই কল্লার বিজ্ঞাবদ্ধার ও তাঁহার ইংরাজী প্রবন্ধ রচনার সূচ্যতি করিতে লাগিলেন। এই সঙ্গে অবোধার ভাগ্যও কিঞ্চিৎ প্রশংসা বৃষ্টি হইল---সে নেচাং একেবারে বাদ পাড়ল না। আরও গোটা কতক সগার ৮ সিগারেটের শ্রাদ্ধ করিয়া বন্ধুগণ অজ্ঞকাবে মত দিবার হইলেন। ভৈরব প্রসাদ, লছমী ও অবোধাকে লইয়া রাত্রিকালীন আহার সম্পন্ন করিতে গেলেন। ভৈরব প্রসাদ রাত্রিকালে আর তাঁহার সেই অন্ধ মতলস্ত ভোজন-কক্ষে ভোজন করিতেন না। (Dining Room) ভোজন-কক্ষ নামে অভিহিত, বহির্বাটিত একটি কক্ষে তাঁহার রাত্রিকালীন ভোজন সমাধা করত। এই ভোজন-কক্ষটি ড্রিং রুমের পার্শ্বে অবস্থিত এবং এই ভোজন-কক্ষটি পাশ্চাত্য-ভোজন-কক্ষের মতন সজ্জিত আছে। এই কক্ষটির মধ্যস্থলে একটি বৃহৎ লম্বা টেবিল স্থাপিত আছে এবং এই টেবিলটির চারিদিকে কয়েকখান চেয়ার সজ্জিত আছে। এতদ্ব্যতীত তিনটি আলমারি ও দুইটি সেক্স-ওয়াল ছোট আলমারি সেই কক্ষে আছে। এই সকল আলমারি নানা রকমের পোর্সিলেনের বাসন, ছুরি, কাঁটা, চামচ, ছোট তোয়ালে, বড় রুমাল প্রভৃতি দ্রব্যে সজ্জিত। ভৈরব-প্রসাদ এই কক্ষে বসিয়া রাত্রিকালে কষ্ট করেন। তিনি, লছমী ও অবোধাকে লইয়া এই কক্ষস্থ টেবিলের দিকে যে কিভাবে উপবেশন করেন। পাতক ঠাকুর তিন খানি কাংস-নিশ্চিত

খালিতে করিয়া আটার রুটি, ডাল, তরকারী, ও দুই তিন রকমের আচার
ও কিছু মিষ্টান্ন সাজাইয়া আনিয়া এই টেবিলের উপর খালিগুলি বসাইয়া
দেয়—তৎপরে ইহারা সকলে ছুরি, কাটা ও চামচের সাহায্যে ঐ সকল
ভোজ্য-দ্রব্য ভোজন করেন। আচারাদির পর সকলে—স্ব, স্ব ভিন্ন, ভিন্ন
শয়ন-কক্ষে শয়ন করিতে যান।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

ঠিকার পর আরও কিছুদিন অতিবাহিত হইয়া গেল। একদিন অপরাহ্নে অঘোষা সত্বে বেড়াইতে গিয়া কণ্ঠ গাড়ি জুড়িয়াব হুকুম দিতেছিল এমন সময় ভৈরব প্রসাদ তাহাকে বলিলেন—“প্রথমে অঘোষা আজ আমি একবার সন্ধ্যাবেলায় দিকে যাব মনে করছি। আজ আর তুমি নদীরে যেওনা।” এর কথা বলিয়া ভৈরব প্রসাদ বহু পরিবর্তন করিতে গেলেন।

ভৈরব প্রসাদের দৈনিক জীবন-যাত্রা অতিবাহিত করিতে ফল পাঠ করিয়া পাঠকগণ অবগুই বুঝিয়াছেন যে “ভৈরব প্রসাদ একটি বিষয় কুনো লোক, তিনি কখনও তাঁহার এই উজ্জ্বল-পটিকার গাণ্ডী আত্মকন করিয়া বাহিরে কোথাও বাহির হন না।” আপনাদের এ অনুমান যথার্থ। ভৈরব প্রসাদ আজকাল বাতীর বাহিরে কোথাও পারতপক্ষে গমন করেন না তবে প্রায় একমাস অন্তর—কখনও বা পনের দিন অন্তর—তিনি অপরাহ্নে একবার কুন্ঠা বাহির হন এবং সন্ধ্যাবেলা বা ক্যান্টন-মেণ্টে গমন করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করেনও তাঁহাকে সেলাম করিয়া আসেন। এই কার্যটি তঁক নিয়মিতরূপে তিনি বহুদিন হইতে সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন। “তান তাঁহার আত্মীয়স্বজন ও কুন্ঠা-স্বর্গের নকট গল্প করিয়া বলেন যে,—“ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তঁকে বড়ই ভালবাসেন ও স্নেহ করেন তাই আমি তাঁর সঙ্গে যথোপযথো করিতে যাই। আমি বেশীরভাগ পনের দিন অন্তর তাঁর কাছে

গিয়ে সেলাম দিয়ে আসি ; কোনও, কোনওবার একমাস অন্তর যাই। যদি কখনও আমার যেতে, একমাসের পরে আরও দু, তিন দিন দেবী হয়ে যায় তাহলে সাহেব মহা চিন্তিত হয়ে পড়েন। তিনি তখন বলেন যে, "ভৈরব তোমার এবার আসতে এত দেবী হ'ল কেন? আমার অত্যন্ত ভাবনা হয়েছিল তোমার জন্ত। আমি ভাবলেম যে তুমি হয়ত কিছু পীড়া প্রাপ্ত হয়েছ—এই ভাবনার গত দু রাত্রি আমি নিদ্ৰা যেতে পারিনি ভাল ক'রে—খানা যেতে পারিনি উদর ভ'রে।" এ রকম সম্মান কটা লোকের হয় বল দেখি—শুনি। আমার বড় লজ্জা করে তাই আমি মুখ কুটে বলি না; নতলে আমি যদি মুখ কুটে একবার বলি তাহ'লে সাহেব আমার, মহারাজা বাহাদুর টাইটেল দিয়ে দেন।"

এবার এক মাস অতীত হইয়া আরও চারি পাঁচ দিন অতীত হইয়া গিয়াছে তবুও সাহেবকে সেলাম দিতে যাওয়া হয় না। সেট জন্ত ভৈরব প্রসাদ আজ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। অযোধ্যার সহরে যাওয়া বন্ধ করিয়া—সেই গাড়ীতে করিয়া তিনি সিকরোর দিকে যাত্রা করলেন।

ভৈরব প্রসাদ বাহির হইয়া নাইবার কিছুক্ষণ পরে লছমী হাত, মুখ মুইয়া ও কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া অন্দর মহল হইতে বাহিরে আসিয়া দেখিল যে অযোধ্যা একখানি আরাম-কেন্দারায় শুইয়া পড়িয়া একখানি ইংরাজী নভেল পড়িতেছে। লছমী ধীরে, ধীরে অযোধ্যার নিকটে আসিয়া—আরাম-কেন্দারার হাতলের উপর নিপতিত অযোধ্যার হাতখানি টানিয়া বলিল—~~ভুল~~ অযোধ্যা দুজনে বাগানে গিয়ে এক সঙ্গে একটু বেড়াইগে চল। অনেক দিন এক সঙ্গে হাত ধরাধরি ক'রে বেড়াইনি;

ভুল-ভাগা

আজ যখন ভাগাক্রমে অনেকদিন পরে বাবা বাড়ীর বার হয়েছেন তখন চল একটু বেড়ান যাক। আর তরুণ একমাস আবার এ সুযোগ আসবে না।”

অযোধ্যা এই খানি পাথর উঠিয়া বসিয়া বলিল—“চল”। তৎপরে দুইজনে ঠাত পরামর্শ করিয়া বাগানে চলিয়া গেল এবং নানা রকম গল্প করিতে, করিতে বেড়াইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ বেড়াইবার পর লক্ষ্মী বলিল—“অযোধ্যা এইবার পিছনকার বাগানে যাওয়া যাক চল। ওদিকটায় অনেক ফুল ফুটে আছে—গোটা-কতক ফুল তুলে আনিগে চল।”

ভৈরব প্রসাদের এই উদ্যান বাটির ঠিক মধ্যস্থলে অট্টালিকাটি অবস্থিত এবং এই অট্টালিকাটি বেষ্টন করিয়া চারিদিকে উদ্যান অবস্থিত এবং এই উদ্যানকে বেষ্টন করিয়া চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর অবস্থিত থাকিবে। এই উদ্যান-বাটির প্রান্ত-সীমা নির্দেশ করিতেছে। প্রাচীরের মধ্যস্থলে, রাজপথের উপর এই উদ্যান-বাটির সর্বত্র ফটক অবস্থিত। অট্টালিকার সম্মুখ-ভাগস্থ উদ্যানকে ইহার অধিবাসীরা “নামনের-বাগান” এবং অট্টালিকার পশ্চাৎভাগস্থ উদ্যানকে “পিছনকার-বাগান” বলিয়া অভিহিত করে।

লক্ষ্মী ও অযোধ্যা পিছনকার বাগানে উপস্থিত হইয়া এদিক, ওদিক বেড়াইতে লাগিল। কিছুক্ষণ বেড়াইবার পর লক্ষ্মী বলিল—“অনেক ঘোরা হ’য়েছে, আমি বড় পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি; চল ই পাথরের বেদীটার ওপর এসে একটু বিশ্রাম করিগে।”

এই পিছনকার বাগানের প্রায় প্রান্তদেশে একটি মন্দির-বেদী স্থাপিত

আছে। লছমী ও অযোধ্যা—অটোলিকার দিকে পিছন ফিরাই—এই বেদীটির উপর উপবেশন করিল।

তখন সন্ধ্যা হইতে সামান্য কিছু বিলম্ব ছিল। কিছুক্ষণ উপবেশন করিবার পর অযোধ্যা বলিল,—“এল লছমী, এইবার বাড়ীর ভেতর যাই চল। সন্ধ্যা হ’লে আর বড় দেরী নেই।”

লছমী বলিল,—“আমি আর একটু বিশ্রাম না ক’লে আর এক পাও চলতে পারব না। প্রায় দেড় ঘণ্টার ওপর বেড়িয়ে আমি বড় ক্লান্ত হ’য়ে পড়েছি। আর একটু ব’স। আচ্ছা আমার কাছে বসতে তোমার ভাল লাগছেনা নাকি?” এত কথা বলিয়া লছমী অযোধ্যার স্বস্তি নিজের মাথাটি রাখিয়া, তাতার অঙ্গে হেলান দিয়া বলিল।

অযোধ্যা বাম হস্ত দ্বারা লছমীর গলদেশে বেষ্টন করিম্ভ এবং মূর্ধ্ন ও স্মিষ্টে সান্ধ্য-বায়ু দ্বারা আন্দোলিত লছমীর মস্তকের সম্মুখভাগস্থ কেশশৃঙ্খলি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে, করিতে বসিতে লাগিল,—“লছমী আর কতদিন আমরা এ বকমভাবে আশায় আশায় দিন কাটাব?” লছমী কোনও কথা বলিল না। অযোধ্যা পুনরায় বলিল—“তুমি বেশ নিশ্চিন্ত আছ; আর কিছু বড়ই ছুখে, বড়ই কষ্টে দিন কাটাচ্ছি। আমাদের বিবাহ হ’লে যতই বিলম্ব হ’লে আমি ততই হতাশ হয়ে যাই। তুমি কিছু বেশ নিশ্চিন্ত আছ।”

লছমী বলিল,—“এর আর উপায় কি ক’রতে পারি বল? আমি কি সাধ ক’রে নীরবে দিন কাটাচ্ছি?”

অযোধ্যা বলিল,—“তুমি নিশ্চয়ই আমার ভালবাসনা তাই নিশ্চিন্ত

ভুল-ভাল

আর নীরবে দিন কাটাতে পারছ। আমি কিছু তোমার যে কত ভাল-
বাসি, তা যদি জানতে তাহলে আর—”

অযোধ্যা কথায় বাধা দিয়া লছমী বলিল,—“তুমি যদি এত কথা
বুঝে থাক তাহলে তুমি আমায় যা ভালবাস তা বেশ বোঝ, যাচ্ছে।”

অযোধ্যা বলিল—“কি তোমার আমি ভালবাসি না।”

লছমী বলিল,—“কখনও নয়। যে ভালবাসে সে নিজের মন দিয়ে
“ভাল-ভালবাসার-লোকেব” মন বুঝতে পারে। তুমি যদি আমায় ভাল-
বাসতে তাহলে তোমার নিজের মন দিয়ে বুঝতে পারতে যে, আমি
তোমায় ভালবাসি কি না, আমার ভালবাসা কতটা গভীর।”

অযোধ্যা বলিল—“তুমি দাঁট বস; আমি কিছু তোমার এত মনে
আমু নিশ্চেষ্টে ভাবের প্রশংসা করতে পারি না।”

লছমী বলিল,—“নীচের না থেকে কি কদর বল? যখন বাবার অসু-
স্থিতি না হলে উপায় নেই অগত্যা বাবার মনের ভাবও ঐ রকম ভীষণ তখন
কি ক’রে না থেকে উপায় কি?” এত কথাগুলি শেষ করিয়াই লছমী
নিজের বাহু-যুগল দিয়া অযোধ্যাকে বেঁধেন করিয়া বলিল—“আপ—বাবার
মুখ চেয়ে আমাদের এখন কিছুদিন ধৈর্য ধরে থাকতে হবে। তাতে সব
দিকে ভাল হবে। আমাদের কোনও ভয় নেই—তুমি যখন আমার
ভালবাস আর আমি যখন তোমার ভালবাসি তখন ভগবান আমাদের
সহায় হবে। কিসেব ভয় তোমার? আমি তো তোমায় প্রাণের চেয়ে
ভালবাসি। তুমি ভিন্ন অত্ৰ কারো সঙ্গে আমি বিবাহ-বন্ধনে কখনও
আবদ্ধ হব না এটাতো জান?”

অযোধ্যা বলিল—“ঠিক বলেছ লছমী, যখন তুমি আমার স্বার্থ ভাল-

বাস আর আমি তোমায় যথার্থ ভালবাসি তখন দয়াময় ভগবান নিশ্চয়ই আমাদের সহায় হবেন। লছমী একটা কথা আমার বুকেরে বলতে পার ?”

লছমী বলিল,—“কি কথা ?”

অবোধা বলিল,—“দেখ, ‘তুমি আমার ভালবাস’ এই কথাটা তুমি প্রথম বেদিন মুখ কুটে আমার বল’ সেদিন এই কথাটি আমার বড় মিষ্টি লেগেছিল। তারপর তোমার মুখে ঐ কথাটি কত শত বার শুনেছি। আজ তুমি আবার ঐ কথাটি এখন আমার বলতে—ঐ শত শতবার শোনা অতি পুরান কথাটি ঠিক শ্রুতনের মতন মিষ্টি লাগল কেন লছমী ?”

লছমী গৃহ শাস্ত্র সহকারে বলিল—“তুমি যে বখন তখন বল, আমার সবই মিষ্টি; সেই ভুলেই বেশি হয় আমার কথাগুলো তোমার মিষ্টি লাগে।”

অবোধা প্রেমভরে বলিল—“সত্য লছমী, তোমার মুখের কথাগুলি বড় মিষ্টি; তার চেয়ে আবার, তোমার মুখখানি আরও অধিক মিষ্টি। সেই ভুলেই তোমার মুখে চুমো খেতে অত ভালবাস।”

লছমী বলিল—“তা মন্দ নয়, জল খাবারের পরসং বেঁচে যায়। তা এটা জানত যে—অধিক মিষ্ট পাইলে পীড়া হয়।”

অবোধা বলিল—“তা হয় হোক। পীড়ার ভয়ে যে মিষ্টি খেতে বিরত থাকে সে বনে গিয়ে বাস করুক। আমি পীড়ার ভয় করি না অতএব আমি অধিক পরিমাণে মিষ্টি খাব।” এই কথা বলিয়া সে লছমীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া সাদরে একটি চুম্বন করিল।

লছমী জীবৎ লজ্জাপূর্ণ স্বরে মোখিক—“আঃ বাঃ”—বলিল বহুট কি

ভুল-ভাঙ্গা

ক্লে'ও অযোধ্যার গলাটি জড়াইয়া ধরিয়া মুখে দুইটি চুষন করিল। অযোধ্যা এইবার লছমীকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া তাহার মুখে দুইটি প্রতি-চুষন করিল। ইহাদের চুষন বিনিময়ের মত শব্দ মিলাইতে না মিলাইতে একটি উচ্চ ও কঠোর শব্দ স্বানত হইল—“আবার ? আবার ? যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে ; আর নয় ; আর চুমু গেলনা। পবনদার আর চুমু গেল না।”

অযোধ্যা ও লছমী এক কঠোর শব্দে চমকিত হইয়া পশ্চাৎ কি'রয়া চাহিয়া দেখিল যে, ভৈরবপ্রসাদ কট্ মট্ ধরিয়া চাহতে চাহিতে দণ্ডায় মান আছেন। ইহারা দুইজনেই, ভৈরবপ্রসাদকে দেখিয়াই অগ্রে তাহার দাঁতের দিকে চাহিল, এবং দেখিল যে, তাঁহার অতি প্রিয় লাঠি-গাছটি তাঁহার দাঁতে নাই।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সচিত্র সাক্ষাৎ কাঁতে হাইদার সময়, পূর্ব-প্রথমা তাঁহার কক্ষের দ্বারে লাঠি-গাছটি রাখিয়া, ভৈরবপ্রসাদ তাঁহার কক্ষে শূণ্য হস্তে প্রবেশ করিয়াছিল। তৎপরে তাঁহার সচিত্র সাক্ষাৎ সন্ধান করিয়া ভৈরবপ্রসাদ কক্ষের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন যে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের পেস্কার তথায় দণ্ডায়মান আছে। পেস্কারকে ভৈরবপ্রসাদ খাতির কারতেন ; পেস্কারও যে তাঁহাকেও অন্ন-স্বল্প খাতির করিত না এমন নহে। ইহাদের দুইজনের সাক্ষাৎ হওয়াতে, দুইজনে নানারূপ আলাপ করিয়া দুইজনকেই আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। ভৈরবপ্রসাদ মধ্য আপ্যায়িত হইয়া পেস্কারের সচিত্র কথানান্ত্রি কাহিতে কহিতে একেবারে নীলের গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন এবং বিদায় গ্রহণ করিয়া দাঁড়ী চালাইতে হুকুম দিলেন।

ভৈরব প্রসাদ, তাঁহার বাটিতে উপনীত হইয়া যখন গাড়ী হইতে নামিতে যাউনেন সেই সময়ে লাঠির কথা তাঁহার মনে পড়িল। তিনি শূন্য হস্তে গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া চালককে বলিলেন—“দেখ ভৈরব, আমি খ্যাজিষ্ট্রট সাহেবের বাড়ীতে, তাঁর খাস-কামরার দরজায় আমার লাঠিটা ভুলে ফেলে এসোছি। তুমি এখনই গিয়ে আদালী ভৈরবকে আমার নাম ক’রে সব ব’লে লাঠিটা চেয়ে আনগে।” চালক বলিল—“আচ্ছা ভৈরব আমি এখনই যাচ্ছি।”

গাড়ীর চালককে উক্ত কথা বলিয়া ভৈরব প্রসাদ অটোলিকার ভিতর প্রবেশ করিয়া অবোধা ও লছমাকে অন্ত্রষণ করিয়া পরিচারকদের নিকট জানিলেন যে, ‘তাঁহার বাগানে বেড়াইতেছে।’ ভৈরব প্রসাদ অটোলিকা হইতে বাহির হইয়া ‘পিছনকার বাগানে’ প্রবেশ করিলেন এবং কিয়ৎদূর অগ্রসর হইয়া নতুন অবোধা ও লছমার চুখন বাপার দুপিয়া সজ্জিত হইয়া দাঁড়াইলেন। তৎপরে পূর্ব-কথিত কথাগুলি বলিতে বলিতে তাহাদের ঠিক পশ্চাতে গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

পূর্বের বালরাতি অবোধা ও লছমী অটোলিকার নাকে পিছন ফিরিয়া বলিয়াছিল কাজে কাজেই তাহারা ভৈরব প্রসাদের আগমন জানিতে পারে নাই। তাঁর উপর অদৃষ্ট দোষে আজ আবার তাঁহার আত্ম প্রিয় লাঠি গাছটিও তাঁহার হাতে ছিল না।

লছমী, পিতার হাতে লাঠিটি নাই দেখিয়া, লাঠির উপরে মনে মনে ক্রমান্বয়ে চটিতেছিল। সে ভাবিতেছিল যে, অল্প অল্প দিন বাবার হাতে লাঠিটা থেকে ‘ঠক-ঠক’ শব্দ ক’রে তাঁর আগমন বার্তা জানিয়ে দেয়, আর ঠিক আজকের দিনটাই কিনা লাঠিটা বাবার হাতে রয়েল না।

ভাগা-ভাগ

অযোধ্যাও এখন এই লাঠিটির কথাই ভাবিতে ছিল বটে কিন্তু সে, লক্ষ্মীর ভাবনার ঠিক বিপরীত কথা ভাবিতেছিল। তৈরবপ্রসাদের কাছে অত লাঠিটি ছিলনা বলিয়া লক্ষ্মী মনে, মনে লাঠিটির উপর মহা ক্রোধান্বিত হইতেছিল; অযোধ্যা কিন্তু, এটুকু লাঠিটির উপর মহা সন্তুষ্ট হইতেছিল। অযোধ্যা ভাবিতেছিল যে, “ভাগা ভাগ যে” তৈরব প্রসাদের পাতে আজ এখন লাঠিটি নেই তাই রক্ষা নয়ত আজ এখন নিশ্চয়ই লাঠি গাছটি তার পিঠে সজোরে পড়িত। শুধু পড়া নয়— পড়িত আর প্রেমভাবে তার কতক ওঠা, নাবা ক’রে সোহাগে একেবারে দু’খণ্ডে বিভক্ত হইত যেত। সঙ্গে, সঙ্গে তার অকৃত্রিম প্রেমের চিহ্ন-স্বরূপ, গোটা কতক তালপত্রের দাগ পিঠের ওপর চির-জীবনের মতন রেখে যেত।”

করজনেট কিছুক্ষণের জন্য নীরব হইয়া রাহিল। ক্ষণ পরে সেই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া তৈরবপ্রসাদ বলিলেন—“হ্যাঁ হে অযোধ্যা, তোমার জা আশি বিশেষ করে বলে দিয়েছিলুম যে, তোমরা দুজনে, ‘ভবিষ্যতে দুজনের স্বামী, জা হবে’ এত কথা কেবল মাত্র মনে রেখে ভালবেসে যাবে আর দুর্ভমানে, কার্যতঃ ভাই, বোনের মতন ব্যবহার ক’রে যাবে? জা এই রকম ভাবে চুমো খেয়ে কি তোমরা ভাই, বোনের মতন ব্যবহার করার লাখছ? হ্যাঁ! ‘ভাই, বোনেতেও চুমো খায়’ এ কথা তোমরা বলতে পার বটে—জা, ভাই, বোনে কি ওই রকম ঘন, ঘন চুমো খায়—না—ও রকম জোরে জাপটে ধরে চুমো খায়? আমার পরম বন্ধু ও বিশেষ কলাগকর্মী ন্যাজিট্রেট সাহেবের প্রাসাদ থেকে এখানে কিরে এসে, তোমরা খুঁজতে খুঁজতে এই জারগায় এসে দেখি যে, তোমরা এমন

বিত্তোর হঠে বসে আছে যে, আমার মতন এমন একটা অল-অ্যাক্ট মর্দ এসে তোমাদের পিছনে দাঁড়িয়েছে সেটা টের পেলো না। তারপর তোমরা চুষ খেলে, আমি তা দেখলুম কিন্তু কিছু বললুম না, কারণ তাই, বোনেতে একবার চুষ খেতে পারে। তারপর আবার যখন তোমরা চুষ খাওয়া-খাঙ্গি ক'রে তাই, বোনের গাণ্ডী অতিক্রম ক'রলে তখন আমি আগে আত্মহারা হ'য়ে এগিয়ে এসে তোমাদের বাধা দিলুম। আমি তোমাদের এই রকম ব্যবহারের কারণ জানতে চাই—এখনই চাই। আমি তোমাদের মধ্যে একজনকে উদ্দেশ্য ক'রে এ কথা বলছি না—আমি তোমাদের দু'জনের কাছ থেকেই এর কৈফিয়ৎ চাই।”

অযোধ্যা আর কি কৈফিয়ৎ দিবে—ভাঃ পিতার প্রাণ কঁপিত-ছিল। সে শুঁই-গাঁই করিতে লাগল, স্পষ্ট কথা কিছু কহিল না। লছমী কিন্তু পিতার কথা শেষ হইতেই কথা কহিয়া, তাহাদের দুইজনের কৈফিয়ৎ একাই দিল। লছমী এখন আর পূর্বের মতন লজ্জাশীলা ও স্বল্পভাষিনী নাই। এই অল্পদিনের মধ্যেই তাহার পূর্ব-স্বভাবের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। সে এখন শিক্ষিতা ও সভ্যতালোক-প্রাণী বিন্দুসী রমণী—সে কি জ্ঞান ভয় করিয়া বা খ্যাতির করিয়া কথা কহিবে? ‘সকলেই সমান’ এই শিক্ষা যখন সে পাইয়াছে ও পাইতেছে তখন তাহার এই পরিবর্তনের জ্ঞান কোনও দোষ তাহাকে দেওয়া যায় না। নাচিতে নামিয়া ঘোমটা টানিবাব আবশ্যক কি?

লছমী তাড়াতাড়ি পিতাকে বলিল—“বাবা আমরাও কোন গুণের কাজ করিনি। আপনি আমাদের যে শিক্ষা ভাবে চক্ষুতে বসিয়েছেন আমরা ঠিক সেই রকম ভাবেই চলি। তবুও আপনি ঐ চুলো খাওয়ার

২. ভুল-ভাল

কথা ব'লে আমাদের ভৎসনা করলেন ব'লে, যদিও আমাদের কুখ্যতি
করা উচিত তবুও আমরা কুখ্যতি হনুম না এই ভেবে যে, আপনি সভা-
তার আলোক পেলেও ভাল রকমে শিক্ষিত হন। দেখুন বাবা, এই
কারণেই আপনি আমাদের পবিত্র-চূষনে দোষ দেখলেন। বাবা,
আপনি নিজেকে সভ্য ব'লে পরিচিৎ করেন, আমাকে সভ্য ক'রতে
শিক্ষিতা ক'রছেন অথচ এই চূষন দেখে আপনি ক্ষেপে উঠছেন।
সভ্য সমাজে চূষন অতি পবিত্র জিনিস তাই সভ্য লোকেটা, যখন, তখন
কেখানে, সেখানে; যার তার সামনে চূষন করে আমার কথায়
যদি আপনার বিশ্বাস না হয় তাহলে আপনি ইংরাজি মতল পড়ুন। কংরা
সভ্য-সমাজেও গতিবিধি লক্ষ করুন তাহলেই আমার কথার সত্যতা
বুঝতে পারবেন। চিঃ বাবা আপনি এক সভ্য হ'লে শেষে এই
অজ্ঞতার মতন কথা ক'রে ফেললেন? সভ্য সমাজে যদি আপনার এ
কথা শোনে তাহলে আপনাকে সমাজ-চ্যুত বলে দেবে। আপনার
বন্ধুবান্ধবরা আপনার সঙ্গে এক সঙ্গে ব'সবেন। আপনার চা আর
মিষ্টান্নতে খুংকার দেবে, আপনার সিগার সিগারেটে পানঘাত ক'রবে।”

ভৈরবপ্রসাদ বাগা ভাবে বলিলেন “ও, ও কথা জানতুম না।
মায়ী, মাতা, মাতা কি নাচেবদা কেখানে, সেখানে; যার তার
সামনে; যখন, তখন চুষ খায়? হ্যাঁ ঠিক কথাই বটে; আমি
নিজেইতো কংরার ইন্টিমানে দেখেছি যে, নাচেবদা সকলের সামনেই
সব চুষ খাওয়া-খাশি করচে। সচমী আম তোর বুড়ো বাপ Old Affec-
tionate father, আমার বাপ কর। আমার এই অজ্ঞাত বন্ধবরা
পানের জন্তে আমার বাপ কর। অবোধা আজ থেকে হুমি খুদ চুষ

ভুল-ভাঙ্গা

খেও। চুমু যখন এত পবিত্র জিনিষ তখন তুমি যত চুমু খাবে তোমার তত পূণ্য হবে। হ্যাঁ আর একটি কথা ; অযোধ্যা, তুমি লছমীকে পড়াবাব পর আজ থেকে আমার একটু ক'বে পড়িও। আমি মনে, মনে গল্প ক'বতুন যে, আমার স্বজাতিদের মধ্যে, আমি সর্বাপেক্ষা সভ্য আর শিক্ষিত, আব আমার চাল চলন ঠিক সাহেবদের মতন। এখন কিন্তু দেখছি আমি সম্পূর্ণরূপে সভ্য হতে পারিনি। অযোধ্যা আজ থেকে নিশ্চয়ই আমার পড়িও।”

লছমী সাস্তনা-সূচক স্ববে বলিল—“বাবা, আপনি আর আত্মগোপন ক'রবেন না। এ বিষয়ে আপনার তত দোষ নেই। আমাদের স্বজাতি-দের মধ্যে আপনি শিক্ষিত, সভ্য, শ্রেষ্ঠ এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আপনি আমাদের জাতের গোবব। তবে, সকল বিষয় আপনার জ্ঞান না থাকতে পারে—কাবণ, সভ্যতাব স্রোত দিন, দিন বর্ধিত হচ্ছে ; সভ্যতার নিয়ম প্রণালী প্রভৃ ৩ দিন, দিন নতুন ভাবে আবিষ্কৃত হচ্ছে।”

ভৈরব প্রসাদ ব্যস্ত ভাবে বলিলেন—“সেই জন্মেই তো আমি ভাল ক'বে লেখাপড়া শিখতে চাই। আমি যা চলন-সই গোছের সভ্য আছি তার চেয়ে আবও বেশী সভ্য হ'তে চাই। আমি এতদিন মনে ক'রতুম যে, কেবল ঘর-দোর বিলাতী ফ্যাসানে সাজালে ; চা, চুপুট খেলে ; টেবিলে খেলে , হুঁচারটে ইংরিজি বুলি আওড়ালে ; মেয়েকে Free love (অবাধ প্রেম) ক'বতে শেখালে আর বেশী বয়েসে মেয়ের বিয়ে দিলে সভ্য হওয়া যায়। এখন দেখছি সভ্যতা-স্রোত বৃদ্ধি পাওয়াতে, আমাদের মতন সভ্য লোকদের মধ্যে—যখন, তখন, বার, তার সামনে ; যেখানে, সেখানে চুমু খাওয়াব পদ্ধতি দাঁড়িয়েছে। এর পরে সভ্যতা

ভুলভাঙ্গা

শ্রোত বাড়তে, বাড়তে যখন—‘যার, তার সামনে ; যেখানে, সেখানে
চুমু খাওয়ার পদ্ধতির’ ওপর উন্নতি হ’য়ে—‘যে যাকে পাবে সে তাকে চুমু
খাবে’ এই পদ্ধতিটা দাঁড়াবে তখন আমি মনের সাথে, ‘যাকে, তাকে’
‘যত পারব’ তত’ চুমু খাবো আর সেই পূণ্যে স্বশরীরে স্বর্গে চলে যাব।
এখন চল, সব বাড়ীর ভেতর চল। অযোধ্যা, লছমীর পড়া শেষ হয়ে
গেলোই, বেশ ভাল দেখে একখানি আধুনিক ইংরিজী নভেল নিয়ে আমার
ঘরে এসে আমার পড়াবে—বুঝলে ?”

উদ্যান হইতে সকলে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

নগদ মূল্য বিধান ক্রয় করিয়া শরৎচন্দ্র আনন্দিত মনে কামাইতে বসিল । কামাইতে বসিবার পূর্বে সে একবার কেবল মনে, মনে বলিল যে—“দামুনে যখন বিধান দিয়েছে তখন নিশ্চয়ই ভূতে আমার কিছু অশিষ্ট ক’রবে না না আমার ওপর রাগ ক’রবে না ।” শরৎচন্দ্র, কেন এই ভূতের কথা বলিল সে মজার রহস্য কিছু পরেই জানিতে পারিলেন ।

শরৎচন্দ্রের আদেশ অনুসারে, নাপিতটি, তাহার মস্তকের পশ্চাভাগ ও তই পার্শ্বদেশ ক্ষুর দিয়া কামাইয়া দিল কিন্তু মস্তকের উপরিভাগের চুল কাটিল না । কেবল, যে অংশ ক্ষুর দিয়া কামাইয়া দিল, তাহার উপরে এক অঙ্গুলী পরিমিত স্থান কাঁচি দিয়া অল্প, অল্প ছাঁটিয়া—কেশহীন স্থানে ও কেশযুক্ত স্থানে একটা সামঞ্জস্য করিয়া দিবার রূথা চেষ্টা করিল ।

শরৎচন্দ্রের চুল ছাঁটিবার ভঙ্গী দেখিয়া পুরোহিত মহাশয় গম্ভীর ভাবে এবং ভাবুকের মত ভাবে গদ-গদ হইয়া বলিলেন—“বাবু, আপনি দেখছি আপনার মস্তকের অর্দ্ধভাগ কামিয়ে ফেলেন ? ওঃ আপনার তাহলে পিতৃভক্তি আছে । আপনি যখন মূল্য দিয়েছেন তখন আপনি অনায়াসে, আপনার মস্তকের তিল-পরিমিত স্থান না কামালে পারতেন । কিন্তু আপনার হৃদয়ে পিতৃভক্তি এত প্রবল যে, আপনি মূল্য দেওয়া সত্ত্বেও, পিতাকে একেবারে বঞ্চিত করলেন না—তার খাতিরে অর্দ্ধেকটা

ভুল-ভাঙ্গা

মাথা কামালেন। রীতিমত মূল্য দিয়ে সম্পূর্ণরূপে-না-কামাবার অধিকারী হ'রেও যে আপনি স্বেচ্ছায়, পিতৃভক্তির যুগ-কাঠে আপনার অর্ধেক চুল বলি দিলেন, এতো কলিকালে একটা ছলভ ব্যাপার। সহস্র পাঁটা বলি দিলে যে ফল লাভ হয়, আপনার এই চুল বলি দেওয়াতে তা অপেক্ষা লক্ষগুণ অধিক ফল লাভ হয়েছে। ওঃ কি ত্যাগ-স্বীকার! উঃ কি স্বার্থ বিসর্জন! ধন্য আপনি।” আমরাও বলি বাবুগো ধন্য আপনি, পুরোহিত মহাশয় আপনিও ধন্য।

ভৃত্য দীননাথ ওরফে দীন্না, এতক্ষণ অতি কষ্টে আত্মসংযম করিয়া বসিয়াছিল। এক্ষণে সে আর নীরব থাকিতে পারিল না। পুরোহিত মহাশয়ের দিকে একটু অগ্রসর হইয়া বলিল—“তাহলে, বাবু আমাদের অর্ধেক ফল পেয়েছেন?”

পুরোহিত মহাশয় সগৰ্বে বলিলেন—“নিশ্চয়ই। শাস্ত্রের আদেশ মত সমস্ত মাথাটা কামালে যখন পুরো ফল পাওয়া যায় তখন অর্ধেকটা মাথা কামালে অর্ধেক ফল পাওয়া যাবেনা? নিশ্চয়ই যাবে। শাস্ত্রকাররা কি ঘুষখোর রে ব্যাটা মুখ?”

দীন্না বলিল—“বাবু যখন আপনা হতেই অর্ধেক ফল পেয়ে গেছেন তখন কোন্ আক্কেলে আপনি পুরো মূল্য নিচ্ছেন?”

পুরোহিত মহাশয় নিজের কথার নিজে ঠকিয়া গিয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া বলিলেন—“হ্যাঁ।” পুরোহিত মহাশয় মনে করিয়াছিলেন যে, ঐরূপ কথা বলিয়া বাবুর খোসামোদ করিলে, আরও কিছু অর্থলাভ হইতে পারে—এই জন্তই তিনি ঐরূপ কথা বলিয়াছিলেন। তিনি তো অ-
“মোলাহব শ্রেণীর পাকা লোক নহেন যে চারিদিক সামলাইয়া খোসা

কথা বলিতে পারিবেন—কাজেই এইরূপ বে-সামান হইয়া গেলেন ;
ব্যাপার অন্তরূপ দাঁড়াইল ।

পুরোহিত মহাশয় “হ্যাঁ” বলিয়া নীরব হইয়া গেলেন বটে কিন্তু
তাহাতে নিস্তার পাইলেন না । দীক্ষু শ্লেষপূর্ণ স্বরে বলিল—“হ্যাঁ কি ?
দিন, দিন, অর্দ্ধেকটা টাকা ফেরৎ দিন । বাবু যখন নিজের হাতেই অর্দ্ধেক
ফল পেয়েছেন তখন পূর্ণ মূল্য নিলে আপনার প্রবঞ্চনা করার পাপ হবে ।
আপনার মতন পদ্মপুরাণাচার্য্য আর পাতালখণ্ডতীর্থ লোক কি জেনে
শুনে গঙ্গার তীরে পাপ ক’রতে পারে ? দিন, দিন, অর্দ্ধেকটা টাকা দিন ।”

সে এই কথা বলিয়া পুরোহিত মহাশয়ের সম্মুখে হস্ত প্রসারিত করিল ;
পুরোহিত মহাশয় এতক্ষণ ভাবিয়াও দীক্ষুর এই যুক্তি খণ্ডন করিবার
কোনওরূপ উপযুক্ত উত্তর ভাবিয়া না পাইয়া, দীক্ষুর উপর মনে মনে
মহা ক্রোধান্বিত হইলেন । তিনি মনে, মনে ভাবিতে লাগিলেন যে—
যদি তাঁহার দেহে শক্তি থাকিত এবং সেই সঙ্গে তাঁহার ব্যাঘ্রের স্তায় দীর্ঘ
নখর থাকিত তাহা হইলে তিনি এই দণ্ডে, ঐ পাষণ্ড, বদমাইস্যাণ্ড দীক্ষু
ব্যাটার ঘাড়, দুই হাতে মটকাইয়া দিয়া, তাহার উষ্ণ-রক্ত আকর্ষণ পরিমাণে
পান করিতেন । যাহা হউক, যখন সে উপায় নাই তখন অগত্যা
তাঁহাকে এ বিষয়ে নিরস্ত থাকিতে হইল । তিনি অতি কষ্টে ক্রোধ নমন
করিয়া কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিলেন—“ওরে ব্যাটা মূর্থ, ব্রাহ্মণকে
একবার দান ক’রলে তা আর ফিরিয়ে নিতে নেই । তা ছাড়া, বাবুর
খেয়েই তো আমরা নাখুব । আমরা বাবুর আশ্রিত লোক—আমরা না
হয় দু’টাকা বেশীই নিলুম । ঐ বাবুর কামান হয়ে গেছে—যা, যা ;
।ন্দী করা রেখে, এখন বাবুকে চান করিয়ে দিগে যা ।”

ফুল-ভাঙ্গা

কৌর-কার্য্য সম্বন্ধীয় ব্যবসায় ব্যাপার সমাধা হইয়া বাইবার পর শরৎচন্দ্র উঠিয়া আসিল এবং দৌলকে বলিল—“বাড়ী থেকে আসবার সময় তোকে যে সব জিনিস আনতে বলেছিলুম তা এনেচিস তো ?”

দৌল ঘাড় নাড়িয়া বলিল—“আজ্ঞে হ্যাঁ সবই এনেছি। আপনি ততক্ষণ চান ক’রবেন চলুন। আমি এগিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি, আপনি আমার পিছু পিছু নেমে আসুন ; কোনও ভা. নেই—বেশ বাঁধান ঘাট—জলের ভেতরে অনেক দূর অবধি সিঁড়ি আছে।”

শরৎচন্দ্র বলিল—“আসবার সময়—গাড়ীর চালে চড়িয়ে তোকে বে ছ’ঘড়া জল আর তোয়ালে, সাবান আনতে বলেছিলুম সেগুলো চট ক’রে গাড়ী থেকে আগে এইখানে নিয়ে আর।”

দৌল ঘাট হইতে দ্রুতপদে উপবে উঠিয়া গিয়া রাজপথে দণ্ডায়মান গাড়ী হইতে তোয়ালে, সাবান ও ছইটি শূণ্য ঘড়া লইয়া পুনরায় শরতের নিকট প্রত্যগমন করিল।

শরৎচন্দ্র তাহার হস্তাহত সুবর্ণখচিত-রৌপ্যময়-সাবানের বাক্স হইতে সাবানখানি তুলিয়া লইয়া তাহাকে বলিল—“আমি এই খানটার বসছি, তুই আগে আমার মাথায় এক ঘড়া জলের খানিকটা ঢেলে দে, তারপরে আমার সর্বান মাথা হ’য়ে গেলে বাকী জলটা ঢেলে দিবি—বুঝি ? নে, চাল—চাল—”

মহা বিস্মিত হইয়া দৌল বলিল—“ঘড়া থেকে জল ঢেলে দোব কি ক’রে ! আমি তো শুধু দু’টো খালি ঘড়া এনেছি।”

শরৎচন্দ্র বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া বলিল—“সে কি রে ব্যাটা খালি ঘড়া এনেচিস কি বলে। এখানে আসবার জন্যে বাড়ী থেকে যখন গাড়ীতে

উঠি, তখন তোক না বলেছিলুম যে, ছোটো ঘড়া ক'রে কলের জল নিয়ে গাড়ীর চালে তুলে গঙ্গার ঘাটে নিয়ে চল—র'য় ?”

দীলু বলিল—“আপনি ঘড়া ছোটো নিতে বলেছিলেন বটে—তা আমি মনে করলুম যে, ‘গঙ্গার ঘাট থেকে বাড়ী ফেরবার সময় ছ'ঘড়া গঙ্গা জল আনতে হবে ব'লে আপনি ঘড়া ছোটো নিতে বলেছেন’—তাই আমি খালি ঘড়া ছোটো এনেছি। যাচ্ছি গঙ্গায়, সেখানে আবার জল নিয়ে যাব কি ক'রতে।’ নিন, চলুন,—চান করবেন চলুন—বেলা অনেক বেড়ে গেল।”

দীলুর কথা শুনিয়া শরৎচন্দ্র রাগিল, নহা রাগিল। বেশী রাগ হইলে লোকে অন্ধ হইয়া যায় শুনিয়াছি, আজ সেটা প্রত্যক্ষ দেখা গেল। বিশ্বাস হইতেছে না ? ‘ক্রোধে অন্ধ হইয়া যাওয়া’ কথাটা কবির কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিতেছেন ? আচ্ছা যদি তাহাই হইবে তাহা হইলে শরৎচন্দ্র চোখে দেখিতে পাইতেছে না কেন ? দীলু, শরতের চাকর ; দীলু, তাহার পদসেবা করে, তাহার জুতা ঝাড়িয়া দেয়, তাহার সকল রকম পরিচর্যা করে—সে কিঙ্ক ক্রোধে অন্ধ হইয়া দীলুকে তাহার চাকর বলিয়া চিনিতে পারিল না। সে দীলুকে, তাহার স্বপুত্র, শ্রাণক, পুত্র প্রভৃতি মনে করিয়া বিবম ভ্রম করিতে লাগিল এবং “ব্যাটা,” “শালা,” প্রভৃতি ঐ শ্রেণীর অনেকগুলি মধুর বাক্য দীলুর প্রতি প্রয়োগ করিয়া, সে কখনও দীলুর পিতা, কখনও জামাতা, কখনও ভগ্নিপতি, কখনও বংশের আদি-পুরুষ হইতে লাগিল ও নানারূপ শোণিত-সম্বন্ধ-যুক্ত সম্পর্ক পাতাইতে লাগিল।

দীলু চাকর ও নীচ-জাতীয় ব্যক্তি, তবুও তাহার সহিত

• ফুল-ভাঙ্গা

শোণিত-সম্বন্ধ-যুক্ত সম্পর্ক পুতাইবার নিমিত্ত শরৎচন্দ্র ভয়ানক ভিন্ন ধারিয়া বসিল এবং দীক্ষুর নিকট বারংবার সেই প্রস্তাব করিতে লাগিল।

শরৎচন্দ্র ধনী, দীক্ষু দরিদ্র; কিন্তু তবুও—অতি দরিদ্র হইয়াও সে কোনও মতে ধনী শরৎচন্দ্রের শত্রুর অথবা শ্যালক হইতে চাহিল না। এবং অত বড় ধনী ও মানী লোকের শত্রুর কিংবা শ্যালক হইতে পাঠিয়াও সে ভিলমাত্রও গৌরব বোধ করিল না। সে, এই প্রস্তাবে একেবারে অসম্মত তো হইলই, অধিকন্তু ধীর ভাবে অথচ দৃঢ়তার সহিত শরৎকে বলিল—“বাবু আপনি ভদ্র লোক, বড় লোক, তার ওপর আবার কলেজে প’ড়েছেন কিন্তু আপনি, আমায় শালাও ব’লছেন আবার ব্যাটাও ব’লছেন। যা বলবেন একটা বলুন। আমরা গরীব, পেন্ডের দায়ে দেশ ছেড়ে বিদেশে যখন গতির খাটাতে এসেছি তখন সব নাথা পেতে নোব। শালা ব’লবেন তো শালাই বলুন, ব্যাটা ব’লবেন না। ছেলে কি কখনও শালা হয়? ছেলের বোনকে কি কখনও বিয়ে করা যায়? আমাদের গরীবের ঘরে তো যায় না।”

দীক্ষুর এই সকল কথা শুনিয়া শরৎচন্দ্র একটু নরম হইয়া গেল। তাহার রাগটাও কমিয়া গেল—তাহার দৃষ্টি-শক্তিও ফিরিয়া আসিল—সে চক্ষে বেশু স্পষ্টই দেখিতে পাইতে লাগিল। চশমার পেবল-প্রস্তরে যে সকল উপাদান ও গুণ বর্তমান আছে, দীক্ষুর উপরোক্ত কথাগুলিতে সেই সকল উপাদান ও গুণ বর্তমান আছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় নাই বটে কিন্তু ব্যাপার দেখিয়া মনে হয় যে, দীক্ষুর কথাগুলিতে নিশ্চয়ই পেবল-প্রস্তরের গুণ বর্তমান—তবে তাহা কত শক্তি ধারণ করে, মাইনস জিরো কি মাইনস কাইভ (-০ কি-৫) সে বিষয় “দে মল্লিক”

কিংবা “লরেন্স মৈও’র” দোকানে যাইয়া পরীক্ষা করাইগেই জানিতে পারা যাইবে ।

যাহা হউক, দীক্ষকে এইবার ঠিক চিনিতে পারিয়া শরৎ বলিল—
“ওরে গালাগাল কি তোকে দিই রে—গালাগাল দি তোর আক্কেলকে ।
তুই কি রকম বে-আক্কেল লোক বল দেখি ! এই যে তুই কলের জল
নিরে এলিনি, আমি এখন চান করি কিসে বল দেখি ?”

দীক্ষ মহা বিস্মিত হইয়া বলিল—“সে কি বাবু—চান ক’রবেন কিসে
কি ? মা গঙ্গার সামনে এসে চান করবার ভাবনা ?”

শরৎ বিরক্তভরে বলিল—“গঙ্গায় যদি চানই ক’রব তাহলে তোকে ঐ
ঘড়া ছ’টো করে কলের জল আনতে ব’লব কেন ?

দীক্ষ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া ‘ছাড়া-ছাড়া’ কথায় বলিল—“গঙ্গায়
চান করবেন না ! আজকের দিন গঙ্গা-চান না ক’রলে কখনও চলে কি ?”

শরৎ বলিল—“তা চলুক আর না চলুক, আমার তাতে ব’য়ে গেল ।
আমি কিছুতেই, ময়লা আর রোগের-আড্ডা এই গঙ্গাজলে চান ক’রতে
পারবনা ।”

এই কথা শুনিয়া দীক্ষর মন হইতে বিস্ময়, ভাব একেবারে দেশ
ছাড়িয়া পলায়ন করিল । সে হুঃখিত হইল—মহা হুঃখিত হইল । হুঃখের
প্রাৰল্যে সে ক্ষুব্ধ ও কৰুণ স্বরে অথচ জীবৎ চিৎকার করিয়া বলিল—“বাবু
-বাবু আজকের দিনটার জন্তে আপনার ওসব পাপ কথা বন্ধ করুন ।
কর্তাবাবু জন্মের মতন গেছেন, আর তা কিরবেন না—তার স্বর্গের
জন্যে, তাঁর ভৃত্যের জন্যে—তাঁর মুখ মনে ক’রে আপনি আর ছ’তিনটে
দিন যথেষ্টাচার ক’রবেন না । এর পরে আপনাকে কেউ আর ব’লতে

ভুল-ভাঙ্গা

আসবে না, আর আপনিও এমন দিন আর পাবেন না। সারা জীবনটার মধ্যে আজকের এই দিন আর কখনও ফিরে আসবে না। এর পরে অনেক রকমের অনেক দিন পাবেন কিন্তু আজকের এই দিন আর কখনও পাবেন না বাবু আর কখনও পাবেন না। এর পরে ‘এই দিনের’ জন্তে আপনাকে অনুতাপ ক’রতে হবে—‘এই দিন’ হেলান হারিয়েছেন বলে আপনাকে অনেক কাদতে হবে। বাবু, আপনাকে কোলে পিঠে ক’রে মানুষ করেছে; আপনার চেয়ে আমি ঢের বড়ো; আমি দুনিয়ার অনেক ব্যাপার দেখেছি; আমার এই সামান্য কথাগুলো শুনুন বাবু শুনুন। লোকের বাপ, যা একবারই মরে; তাঁদের মরবার ঠিক পরের কাজগুলো লোককে সমস্ত জীবনের মধ্যে একবার মাত্রই ক’রতে হয়। অন্য কাজ যেমন সংশোধন ক’রে নেওয়া যায় এ কাজ আর তা করা যায়না। কাজে-কাজেই—এরপরে আপনার বত বথেচ্ছাচার করবার ইচ্ছে হয় ক’রবেন কিন্তু এখন এই ভেবে দে—‘যখন সারা জীবনের মধ্যে এ দিন আর ফিরে পাব না, যখন এর পরে ভুল খ’রতে পারলেও সে ভুলের আর সংশোধন ক’রতে পারব’না তখন এ রকম ক্ষেত্রে শাস্ত্রের আদেশ গুলো মেনে বাই; এতে আমার কোনও ক্ষতি হবে না, কোনও অপকাবু হবে না’—এই ভেবে, বাবু, এই কথাগুলো ভেবে আপনি ‘নিয়মগুলো’ সব মেনে চলুন।”

পরচক্র বলিল—“ওরে ব্যাটা, আমি কি কিছু জানিনা মনে করিস? তাই জন্তে আমার নিয়ম মেনে চ’লতে বগচিস? আমি কি নিয়ম মেনে চলচিনা? যদিও এসব নিয়ম মেনে চলাকে আমি কুসংস্কারের কাজ বলে জানি তবুও আমি একটা কারণে, বিশেষ একটা প্যাঁচে পড়ে আমার

ভুল-ভাঙ্গা

বিবেকের বিরুদ্ধবাদী হয়ে এই সব নিয়ম মেনে চলছি। আমি যদি নিয়ম মেনে না চলতুম তাহলে কি আর পুকুর ঠাকুরকে মূল্য দিয়ে ব্যবস্থা কিনতুম? না—এই গঙ্গার ঘাটে এসে তোর সঙ্গে মিছে বকা-ব'কি করতুম? আমি এতক্ষণ তাহলে শোফায় গুয়ে সিগারেট ফুঁকতুম। তবে যে গুলো নিয়ম নয় সে গুলোও মানতে ব'ললে আমি শুনব কেন? ওরে ব্যাটা গঙ্গার ভেতর ডুবে চান ক'রলে যে ফল হয়, 'গঙ্গা—গঙ্গা' ব'লে নর্দমার জলে খুব দূরে থেকে, চান ক'রলেও ঠিক সেই ফল হয়—তা আমি তো গঙ্গার ধারে বসে রয়েছি। বাবা তো শাস্ত্র মেনে চলত কিন্তু, মা যখন মধ্যে মধ্যে গঙ্গা-চান করবার জন্যে বাবাকে অনুরোধ উপরোধ ক'রত তখন তো বাবা কিছুতেই মাকে গঙ্গা-চান ক'রতে পাঠাত না। বাবা তো স্পষ্টই মাকে ব'লত যে—'গঙ্গার ভেতর নেমে চান ক'রলে যা ফল হয়, বাড়ীতে থেকে 'গঙ্গা-গঙ্গা' ব'লে নর্দমার জলে চান ক'রলেও সেই ফল হয়—মন চাঙ্গা তো কটোরামে গঙ্গা।' শুনলি তো বাবা কি বলতেন? মন যদি চাঙ্গা হয় তাহলে একটা ছোট খুঁটির ভেতরও গঙ্গা পাওয়া যায়—তা ও দুটো তো বড় কলসী। একই ফল যখন পাওয়া যাবে তখন পরিস্কার, খাঁটি জলে চান না ক'রে, ঐ ময়লা, কাদাগোলা আর রোগের-আড্ডা জলে চান ক'রব কেন?"

দীর্ঘ বলিল—“বাবু, আপনার মন তো সে রকম চাঙ্গা নয়। তা যদি হোত তাহলে আপনি মা গঙ্গার জলকে কখনও ময়লা, রোগের আড্ডা বলতেন না। ওসব কথা যেতে দিন। দোহাই বাবু, সাত দোহাই আপনার, কর্তাবাবুর মুখ চেয়ে আপনি আজ সব তর্ক ছেড়ে দিয়ে গঙ্গা-চানটা সেয়ে ফেলুন। এতে আপনার কোনও ক্ষতি হবে না অথচ

ভুল-ভাঙ্গা

এ কটা বিশেষ নিয়ম রয়েছে। কর্তাবাবু যে আপনাকে বড় ভাল-বাসতেন, বড় যত্ন ক'রতেন, আপনার সুখের জন্যে তিনি নিজেকে কত কষ্ট করতেন—আপনি এই সামান্য একমাসে সে সব কি ক'রে ভুলে গেলেন বাবু? আমি চাকর—তঁার আপনার-জন নই—পর; আমি কিন্তু তাঁর মুখখানি আর তাঁর দয়ার কথা কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না।” এই কথা শুনি বলিতে, বলিতে দীলু কাঁদিয়া ফেলিল।

শরৎচন্দ্র কিন্তু দীলুর ক্রন্দন দেখিয়া বিচলিত হইল না। অশিক্ষিত ও ছোটলোকে কাঁদে, কাপুরুষে কাঁদে। সে শিক্ষিত, ভদ্র; তার উপর সে তো আর কাপুরুষ নয় যে কাঁদিবে কিংবা কারা দেখিয়া বিচলিত হইবে। তাহার মনের জোর আছে (অবশ্য এই সবের বেলায়)। তাই সে বিরক্ত হইয়া বলিল—“তুই থাম, থাম—তোকে আর ওস্তাদী ক'রতে হবেনা। নেহাৎ ছেলেবেলা থেকে আমায় মানুষ করিচিস তাই—যখন, তখন ওস্তাদী ক'রে যা, তা বলিস তবুও—কিছু বলিনা। কিন্তু তোর দেখাছি ক্রমে বড় বাড় বেড়ে যাচ্ছে। তুই কিছু কি জানিস্ যে, দব কথায়নিছে ওস্তাদী করিস? গঙ্গাজলে চান ক'রে আমি, আমার সব নষ্ট করি আর কি? বাড়ীতে যে মাষ্টার আমায় পড়ায় সে বিলেত-কেরতা তা জানিস্ তো। সেই মাষ্টারের কাছে আমি অনেকবার শুনেছি যে, গঙ্গা জলে কোনও মতে চান করা উচিত নয়; গঙ্গাজল অতি নোংরা আর গঙ্গা জলে চান করলে টাইফয়েড হয়।” এ ছাড়া, আমি মেডিকেল রিপোর্টে পড়েছি যে—‘এই টাইফয়েড রোগটা একই স্থানবাসী হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে হিন্দুদেরই বেশী হয় এর কারণ হিন্দুরা গঙ্গাজল করে আর গঙ্গাজল খায়।’ বুঝলি এখন যে, গঙ্গার জলে টাইফয়েড

ভুল-ভাগা

রোগের বীজাণু আছে। আমি কি আর সাধ ক'রে একটা দিন যাত্রাও
গঙ্গা চান ক'রতে চাইচি না। ও জলে চান করলেই আমার টাইফয়েড
হবে। নাঃ বাবা, কাজ নেই ওতে চান ক'রে। আপনি বাঁচলে বাপের
নাম। বা, তুই কোথাও থেকে দু'ঘড়া কলের জল যোগাড় করে নিয়ে
আয়। এর জন্যে যদি দু'পাঁচ টাকা দাম দিতে হয় তাও দিয়ে আনবি।
বা, বা, দেরী করিসনি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

একটি বৃদ্ধ লোক গঙ্গা-স্নান করিতে আসিয়া—শরৎচন্দ্রের নিকটবর্তী স্থানে বসিয়া—অঙ্গে তৈল-মর্দন করিতেছিলেন । বৃদ্ধ লোকটির বয়ঃক্রম প্রায় সত্তর বৎসর । তিনি, তাঁহার দয়সের অন্ত্রপাতে বেশ সবল ও সুস্থ-কায় । তিনি প্রতিদিন নিয়মিত রূপে গঙ্গা স্নান করেন ।

আগে যেমন নিয়মিত রূপে গঙ্গা-স্নানার্থীর সংখ্যা খুব বেশী মাথায় ছিল এখন ততটা বেশী না থাকিলেও এখনও এমন কতকগুলি লোক আছেন যারা বিশ্বাস করেন যে, নিয়মিত রূপে গঙ্গাস্নান করিলে শরীর খুব ভাল থাকে এবং গঙ্গার মাটি নিয়মিত রূপে মাথিয়া স্নান করিলে অনেক প্রকার দূরারোগা রোগ একেবারে সারিয়া যায় এবং নীরোগীর সাধারণ স্বাস্থ্য খুব ভাল থাকে । এই জন্য এখনও অনেকগুলি লোক নিয়মিত রূপে পতাহ গঙ্গাস্নান করেন এবং যাহারা অবগত আছেন তাঁহারা গঙ্গার মাটি মাথিয়া কন্দম-স্নান করেন ।

গঙ্গার প্রায় প্রত্যেক ঘাটেই প্রতিদিনই, এইরূপ নিয়মিত গঙ্গাস্নানার্থীর দল সমবেত হন । ঘাটে যে উড়িয়া ডাক্তারগণ থাকে—তাঁহার নিকট এই সকল স্নানার্থীর টিকা, তামাক, হুঁকা প্রভৃতি গচ্ছিত থাকে । ইহারা—দড়ি দিয়া বাধা একটি ছোট তৈলপূর্ণ শিশি হাতে বুলাইয়া লইয়া এবং বগল-দাবায় গামছা, কাপড় লইয়া প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে—নিজ, নিজ সুবিধামত নির্দিষ্ট ঘাটে আসিয়া সমবেত হন এবং সর্বাগ্রে

ভুল-ভীষা

এক ছিলিম তামাক খাইয়া তৎপরে সঙ্গে উতলাদি মর্দনের পর আবার এক ছিলিম করিয়া তামাক সেবন করিবার পর স্নান করিতে নামেন ।

আমাদের কথিত বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিও প্রতিদিন গঙ্গাস্নান করেন—এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে । তিনি গঙ্গার ঘাটে উপস্থিত হইয়া প্রথমে এক ছিলিম তামাক সেবন করিয়া পথ-শ্রম অপনোদন করিতেন । তৎপরে প্রায় এক ঘণ্টা ধরিয়া সর্বাঙ্গে তৈল-মর্দন করিতেন । তৈল-মর্দনের পর আবার আর এক ছিলিম তামাক খাইয়া তবে স্নান করিতেন ।

এই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি তৈল মর্দন করিতে, করিতে শরতের সময় কথাই অতীব কোতূহল-পূর্ণ চিত্তে গুনিতে লাগেন । তিনি এতক্ষণ কোতূহল হইয়া শরৎচন্দ্র বটিক সমস্ত ব্যাপার কেবল দেখিতেছিলেন । এক্ষণে শ্রদ্ধা নন্দমা অবধি গড়ায় দেখিয়া তিনি আর কেবল দর্শকের অধিকার করিয়া থাকিতে পারিলেন না । তিনি বিনীত ভাবে শরৎকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—“দশাই মাপ ক’রবেন—একটা কথা বলি, জুগুগ্রহ ক’রে গুলুন । আপনি যদি রোগে আক্রান্ত হতে না চান তাহলে আপনার গঙ্গা স্নানই করা উচিত ।”

শরৎচন্দ্র একজন অপরিচিত বক্তৃক সহসা এইরূপ ভাবে সম্বোধিত হওয়ার অতীব বিস্মিত হইয়া, বৃদ্ধের প্রতি কোতূহলপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল—“আপনার কথার অর্থ কিছু বুঝতে পারলাম না ।

বৃদ্ধ বলিলেন—“বুঝতে পারলেন না ? আচ্ছা, আমি ভাল ক’রে বুঝিয়ে দিচ্ছি । আপনি কিন্তু আগে আমার দু’একটি কথার উত্তর দিন । আচ্ছা—মানুষের অশোচের সময়, তার কলেরা হওয়ার বেশী সম্ভাবনা না—টাইফয়েড হওয়ার বেশী সম্ভাবনা ?”

ভুল-ভাল

শরৎ বিবর্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে বৃদ্ধের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বিবর্তিতরে বলিল—“তা আমি ব’লতে পারি না। আর সে সব কথায়—”

শরতের কথা শেষ হইতে না দিয়াই বৃদ্ধ চট করিয়া বলিলেন—“নে কি মশাই, আপনি ব’লতে পারেন না কি বলুন? আপনার কথাবার্তা শুনে, আপনি যে একটা ‘পণ্ডিত-লোক’ সে কথাটা বেশ বোঝা যাচ্ছে। আপনি, আপনার অদ্ভুত বিনয়-গুণ দেখাবার জন্যে আমার কাছে আত্ম-গোপন ক’রচেন। তা দেখুন, আপনার গৃহ-শিক্ষক বিলাত-ফেরৎ এই কথা শুনে এবং গঙ্গা-স্নানে আপনার অনিচ্ছা দেখে, আপনি যে একজন ‘বিজ্ঞান-জানিত-লোক’ এটা আমি বেশ বুঝতে পেরেছি। তা, আপনি যখন ‘বিজ্ঞান-জানিত-লোক’ তখন আপনি নিশ্চয়ই খুব সাবধানে থাকুন এবং বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে জীবন যাপন করেন। সাবধানে থাকলে; বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে আগে থাকতে Precaution নিলে কোনও রোগই—বেশীর ভাগ—কাছে ঘেঁসতে পারেনা।”

শরৎচন্দ্র বলিল—“নিশ্চয়ই পারেনা। বেশীর ভাগ কেন—একে-বারেই কাছে ঘেঁসতে পারেনা। এইজন্যই তো আমি গঙ্গাজলে চান ক’রতে চাইছি না।”

বৃদ্ধ বলিলেন—“বেশ, বেশ। এইবার আমার কথাটি মনোযোগ দিয়ে শুনুন। দেখুন—আপনি ‘বিজ্ঞান-জানিত-লোক’ এবং খুব সাবধানে জীবন যাপন করেন, সুতরাং এক্ষেত্রে আপনার টাইফয়েডে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু মশাই হাজার সাবধানী হ’লে আপনার এই আশোচর্য সময় আপনি নিশ্চয়ই সব বিষয়ে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে চ’লতে পারেন নি। আপনি যখন ‘বিজ্ঞান-জানিত-লোক’ হ’লেও কাচা

ভুল-জ্ঞান

গলায় দিয়েছেন, শুধু পা ক'রেছেন, গঙ্গার ধারে কামাতে এসেছেন তখন, আপনার নিজের ইচ্ছে অবশ্য না থাকলেও—বাড়ীর মেয়েদের অজুরোধে আর কালাকাটিতে, গত একমাস ধ'রে আহালাদি সম্বন্ধে নিশ্চয়ই অনেক অনিয়ম যে আপনি ক'রেছেন একথা আমি বেশ বুঝতে পারছি। তাহলেই এক্ষেত্রে আপনার কলেরা হওয়ার আশঙ্কা খুব বেশী, সেটা বোধ হয় আপনার মতন 'বিজ্ঞান-জানিত-লোক'কে আর ভাল ক'রে বুঝিয়ে বলতে হবেনা। আহালাদির জিনিস আর সময় সম্বন্ধে অনিয়ম হলেই কলেরা হওয়ার আশঙ্কা প্রবল।”

শরৎচন্দ্র মহা আগ্রহের সহিত বলিল—“মশাই ঠিক ব'লেছেন, ঠিক ব'লেছেন। গত একমাস ধ'রে আমি প্রতিদিন হবিষ্য করিনি বটে, কিন্তু মধ্যো মধ্যো—আজ দশপিণ্ডি, কাল অ'মুক, পরন্তু তোমুক—ঐ রকম এক একটা ফ্যাচাঙের জন্তে আমার সেই আলোড়ন, কাঁচকলা, কচু, ঘেঁচু দিয়ে তৈরী, সেই আধ-কাঁচা, ভীষণ হবিষ্য খেতে হ'য়েছে। আর আহালাদির জিনিস আর সময় সম্বন্ধে অনিয়ম তো প্রায়ই হ'য়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে কলেরা হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশী।”

বৃদ্ধ বলিলেন,—“অন্ততঃ বিজ্ঞানের খাতিরে হওয়াত' উচিত। দেখুন, এই কারণেই—অশোচের সময় গঙ্গা-জ্ঞানের আর গঙ্গাজল পানের ব্যবস্থা আছে। যদি বলেন কি কারণ? তাহ'লে বলি শুধু! আপনি যদি গঙ্গাজলে স্নান আর গঙ্গাজল পান করেন তাহ'লে আপনার—ঐ যে কলেরা হওয়ার আশঙ্কা—সেটা কেটে যাবে।”

শরৎ অবজার হাসি হাসিয়া বলিল,—“কি পাগলের মত

ভুল-ভাঙ্গা

কথা বলেন মশাই। আপনার গঙ্গার আর সে শক্তি নেই; আপনি বোধ হয় ভুলে যাচ্ছেন যে, এটা কলিকাল।”

বৃদ্ধ বিনোদভাবে বলিলেন,—“না মশাই, এটা যে কলিকাল তা ভুলিনি। আর আপনাকে যে কথাটা বললুম সেটা কলিকালেরই লোকের কথা। আপনারা যাদের মাথায় তুলে নাচেন তাদেরই কথা। আমাদের পূর্বকালের লোকেরা এই কথা বলে গেছেন সে সব কথা ব’লছি না—ভয় নেই।”

শব্দ বলিল—“অগতের, একালের সভা ও শিক্ষিত লোকদের তো মাথা খারাপ হয়নি যে তারা আপনারদের মেকালের লোকদের মতন ব’লবে যে, ‘গঙ্গার চান ক’রলে পুণ্য হয়, সর্বরোগ নাশ হয়।’ যেতে দিন না ওসব কথা। আপনি কুম্ভকারাপন্ন লোক ব’সে ব’সেছেন, সাময়িক হুঁশেছেন যে আমি—বাপ ম’রে যেতে ‘ঘাট-কামান’ ক’র্ত্তে এসে গঙ্গাস্নান ক’র্ত্তে রাজী হ’চ্ছি না—তাই আমায়, ছ’ একটা শাস্ত্রের বচন ঝেড়ে গঙ্গা-চানে রাজী ক’রিয়ে, ফাঁকুতাল্লা একটু পূণ্য-সঞ্চয় ক’রে নেবেন এই কথা মনে ভেবেছেন তো? তা আমি অনেকক্ষণ দৃষ্টিতে পেরেছি।”

বৃদ্ধ বলিলেন,—“মশাই, আমার ঘাড়ের ওপর তো ছোটো মাথা নেই যে, আমি আপনার মতন ‘বিজ্ঞান-জানিত-লোককে’ সেই সব সেকালে শাস্ত্র-কথা বোঝাতে বাবো। আমি ‘যা-তা’ একটা বোঝাতে গেলে আপনি যদি বিজ্ঞান বলে আমার খানিকটা মাটীতে পরিণত ক’রে ফেলেন কিংবা আমার যদি একগ্রাস জলে পরিণত ক’রে ফেলেন ‘চক্-চক্’ ক’রে ধেরে ফেলেন তাহ’লে আমার দশটা কি হয় সেটা আমি ভেবে

ডুল-ভাঙ্গা

দেখেছি। আমি আপনাকে যা বলছি, তা আপনার নিজেরই ভালর
জন্তে বলছি। শুধুন—এই বিংশ শতাব্দীরই কতকগুলি জ্ঞানী ও
চিকিৎসা-বিজ্ঞানে অদ্ভুত পারদর্শী সচেতন ডাক্তার, অনেক পরীক্ষার
পর বলেছেন যে, গঙ্গার জলে কলেরা রোগের জীবাণু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।
তারা একপাত্র কলের জলে আর একপাত্র গঙ্গার জলে কলেরা রোগের
কতকগুলি জীবাণু সম-পরিমাণে ছেড়ে দেন। তারপর যাত্র করে
সেকেণ্ড পরে তারা সেই পাত্র দুইটি পরীক্ষা করে দেখলেন যে, গঙ্গার
জলে কলেরার যে জীবাণুগুলো ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল সেগুলো ধ্বংস
হয়ে গেছে; আর কলের জলে কলেরার যে জীবাণুগুলো ছেড়ে দেওয়া
হয়েছিল সেগুলো অধিক সংখ্যায় বেড়ে উঠেছে।”

শরৎচন্দ্র ব্যগ্রভাবে বলিল,—“হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে পড়েছে বটে। কি
একটা Medical Journal'এ এই রকম Report বেরিয়েছিল বটে।
তারা আরও কি কি—”

বুদ্ধ বলিলেন,—“হ্যাঁ, তারা আরও বলেছিলেন যে, ‘কলেরা-মহামারী
ক্ষুদ্র ও ঘন, ঘন অবস্থার বাসগৃহ-বিশিষ্ট স্থানে শীঘ্র আত্ম-প্রকাশ
করে এবং অতি শীঘ্র ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। কাশীর মতন
ক্ষুদ্র সহরে লোকসংখ্যা এত অধিক এবং কাশীবাসীরা এত
ঘন ঘন ভাবে গৃহ নির্মাণ করে বাস করে যে, সেখানে সর্বদাই
কলেরা আত্ম-প্রকাশ করত এবং এত শীঘ্র ও একরূপভাবে বিস্তৃত হয়ে
পড়ে যে, কাশীবাসীরা অতি অল্পকালের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে
যেত; এ পৃথিবীতে তাদের চিহ্ন পর্যন্ত থাকত না। কিন্তু কাশী-
বাসীরা নিয়মিতরূপে গঙ্গাজল পান গঙ্গাজান করে বলে সেখানে ধ্বংস-

ভুল-ভাগ্য

ভাষে কলেরা হওয়া সম্ভব সুরূপভাবে হ'তে পারে না। এবং কখনও কখনও কলেরা আত্ম-প্রকাশ ক'রলেও তাদের মেরুম ভাবে ধ্বংস ক'রতে পারে না ; আর অতি অল্পদিনের মধ্যে কলেরাকে দেশ ছেড়ে পালাতে হয়।' মশাই ! এই তো হ'ল আধুনিক শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞের কথা। আমি এই কারণেই আপনাকে বলছিলাম যে, যদি রোগাক্রান্ত হ'তে না চান তাহ'লে এখনই গঙ্গান্নান ক'রুন। শুধু আজকের দিনটা নয়—আজকের দিন, কালকে শ্রাব্দের দিন আর পরশু নিয়ম-ভঙ্গের দিন—এই তিনটে দিনই আপনি গঙ্গান্নান ক'রুন আর গঙ্গাজল পান করুন। আপনি হাজার বিধান ক্রম করুন তবুও এই তিনটে দিন আপনাকে আহারাদি সম্বন্ধে অনেক অনিয়ম ক'রতেই হবে ; কেননা আপনি এ কার্যে অতীর্ণ হয়েছেন। এক যদি, একাধা একেবারে পরিত্যাগ ক'রতেন তাহ'লে না হয় যা ইচ্ছে তাই ক'রতে পারতেন। মশাই ! আপনি পাশ্চাত্য-পণ্ডিতের বাক্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতের বাক্য হচ্ছে 'Prevention is better than cure' অতএব Prevention হিসাবে আপনি এই তিনটে দিন গঙ্গাজল পান করুন আর গঙ্গান্নান করুন। বুঝলেন ?"

শরৎচন্দ্র সঙ্গমপূর্ণ দৃষ্টিতে বৃদ্ধের দিকে চাহিয়া বলিল,—“মশাই আপনি ঠিক ব'লেছেন। আপনার কথা শুনে আমার পেটটার ভেতর কি রকম 'গুড়-গুড়' ক'রছে ; গা'টাও কি রকম ব'মি ব'মি ক'রছে। বাস্তবিক মশাই, আমি এই Reportএর ব্যাপারটা একদম ভুলে গেছিলাম—নইলে আমি গত একমাস ধ'রে রোজই গঙ্গাজল খেতুম। আমার না বলেছিল যে—‘ওরে শরৎ অশৌচের সময় গঙ্গাজল ভিন্ন

ডুল-ডাঙ্গা

অল্প কোনও জল খেতে নেই’—মায়ের ঐ কথা শুনে আমি খিঁচিয়ে উঠেছিলুম। এ ব্যাপারটা মনে থাকলে কোন উজ্জ্বল খিঁচোতো ? সত্যিইত’ Strem Water (স্রোতের জল), এতে ওরকম একটা বিশেষগুণ থাকা কিছু আশ্চর্য নয়। আচ্ছা, তাহ’লে চান ক’রে ফেলা যাক ?”

বৃদ্ধ বলিলেন,—“হাঁ, যান চান ক’রে ফেলুন গে—‘জয় মা গঙ্গা’ ব’লে ক’সে গোটা কতক ডুব দিন গে।” এই কথা বলিয়া বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি একটু যত্ন হাসিলেন এবং চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন যে, কোতুহল-পরবশ হইয়া অন্যান্য যে দুই চারিটি ভদ্রলোক নিকটে অবস্থান করিতেছিলেন তাঁহারাও মুগ্ধ টিপিয়া হাসিতেছেন।”

“মহাশয়ের সঙ্গে যখন আলাপ হ’ল তখন দয়া ক’রে আমার বাড়ীতে এক আধবার বাবেন।” এই কথা বলিয়া বৃদ্ধকে নিজের নাম ঠিকানা জানাইয়া শরৎচন্দ্র স্নান করিতে গমন করিল। সে দীর্ঘ চাকরের হাত ধরিয়া অতি সন্তর্পণে গঙ্গার জলে নামিল। কোমর অবধি জলে নামিয়া সে আর অগ্রসর হইল না ; সেই স্থানে দাঁড়াইয়া নাকে ও কাণে অঙ্গুলী দিয়া তিন চারিটি ডুব দিল।

শরৎচন্দ্র অত অল্পজলে দাঁড়াইয়া ডুব দিতেছিল বলিয়া, ডুব দিবার সময় তাহার পৃষ্ঠদেশ জলের উপরে থাকিতেছিল। ইহা দেখিয়া দীর্ঘ বলিল,—“বাবু আর একটু নেমে চান করুন, আপনার পিঠে যে একদম জল লাগছে না। ও কি রকম চান হচ্ছে বাবু!”

শরৎ বলিল,—“পিঠে জল নাই লাগুকগে, আমি আর নাযছি না—সাঁতার জানিনা, শেষে ডুবে ম’রব নাকি ?” মাত্র দুই তিনটি

ভুল-ভাঙ্গা

ভুব দিবার পরই শরৎচন্দ্র উপরোক্ত কথাগুলি দীক্ষকে বলিয়াছে, এমন সময় সামান্য দূর দিয়া একখানি টিমার চলিয়া গেল। ষ্টীমার চলিয়া যাওয়াতে প্রজার উপর দিয়া একটু জোরে স্রোত বহিয়া গেল এবং সেই স্রোতগুলি ঘাটের উপর সজোরে, মশকে আঘাত করিতে লাগিল; নিকটবর্তী নৌকাগুলি সজোরে ছলিতে লাগিল। এই ব্যাপারে শরৎচন্দ্র ‘বাবারে’ ‘মারে’ বলিয়া লাফাইতে লাফাইতে জল হইতে ঘাটের উপর উঠিয়া পড়িল।

“আহা কি করেন, উঠে পড়েন কেন?—এখনও যে ভাল ব’রে সর্ব্বাক্ষেপণ ভেজেনি; এখনও সিকমত চান করা হ’লনা আর আপনি জল থেকে উঠে পড়েন যে?” এই কথাগুলি বলিতে বলিতে দীক্ষ শরতের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

শরৎচন্দ্র সর্ব্বাগ্রে একটি ধাক্কা দিয়া তাহাকে সম্মুখ হইতে সরাইয়া দিয়া, আরও চার পাঁচটি সিঁড়ি আতিক্রম করিয়া কিঞ্চিৎ উপরে উঠিয়া দাঁড়াইল, তৎপরে দীক্ষ মুখ খিঁচাইয়া বলিল,—“জল থেকে উঠে প’ড়বনা তো কি জলের তেতর দাঁড়িয়ে ম’রব নাকি? ওবাবা কি ভয়ানক ঢেউ; ঢেউগুলো বুকে লাগতে আমার দম বন্ধ হ’য়ে বাধার মতন হ’য়েছিল। আর একটুক্ষণ জলে থাকলে আমার ‘নাকানী-চোবানী’ খাইয়ে ডুবিয়ে মারত’। ওঃ—শালার জাহাজ গেল, আর সমুদ্রের মতন ঢেউ বইয়ে দিয়ে গেল। বাবা——”

দীক্ষ বলিল,—“তা ব’লে বাবু, আপনার চান না সেরে ওঠবার কোনও দরকার ছিল না—ওইটুকু জলে দাঁড়িয়েছিলেন, আপনার ডোববার কোণ ভয় ছিলনা।”

ভুল-ভাঙ্গা

শরৎ বলিল—“ওঃ ব্যাটা—তাকি আর ছিল! বুঝেছি তোমার মতলব—কেন তুমি ওকথা ব’লছ তা বুঝেছি। আমি জলে থেকে ওই ঢেউয়ের মাঝে প’ড়ে ‘নাকানী-গোবানী’ খেতে খেতে ‘হাঁক-পাঁক’ ক’রতুম আর তুমি ব্যাটা ওপরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখতে আর মনে মনে আমোদ পেতে।”

দীপু বলিল,—“কি অজ্ঞায় কথা যে বাবু বলেন তা বুঝতে পারিনি। আমি কি ওই ভেবে আপনাকে চান করবার কথা বললুম!”

শরৎ বলিল,—“নিশ্চয়ই! আমি একটা ‘লেখাপড়া জানা লোক’ আমি কি বুঝতে পারিনি মনে করিস? ওরে ব্যাটা Educationএর (শিক্ষার) একটা মূল্য আছে জানিস। থাকগে ও নিরে আর কথা বাড়িয়ে কাছ নেই। আমি ওই উড়ে ঠাকুরের কাছে গিয়ে কাপড় ছেড়ে নিচ্ছি—তুই শিগ্গীর ক’রে চান ক’রে নিরে আর।” ~~এই~~ কথা বলিয়া শরৎচন্দ্র উপরের দিকে উঠিয়া গেল।

দীপু আর অধিক বাক্যব্যয় করিল না। শরৎকে গঙ্গাস্নান করিতে দেখিয়া সে মনে বড়ই আনন্দ পাইয়াছিল—প্রাণে একটা তৃপ্তি অস্বত্ব করিতেছিল। সে মনে মনে শরৎকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতে লাগিল,—“হাররে বাবু! সাহেবরা বলেছে ব’লে তুমি আজ মা গঙ্গার ~~মা~~ হাঙ্গর বুঝলে। কিন্তু তোমার নিজের জাতের, প্রাচীনকালের মহাপুরুষরা যে, সাহেবদের বলবার অনেককাল আগে থেকে মা গঙ্গার মাহাঙ্গর সম্বন্ধে অনেক বেশী কথা ব’লে গেছেন—সেটা একবার ভেবে দেখলে না? ‘মা গঙ্গার জলে ওলাউটার বীজ মরে যায়,’ কেবলমাত্র এই কথাটুকু অল্প-লোকেরা জানতে পেরেচে, কিন্তু তোমার পূর্বপুরুষরা যে,

ভুল-ভাঙ্গা

অনেক আগে থেকে বলে গেছে যে, ‘মা গঙ্গার জলে সর্বরোগ নাশ হয়—‘অন্ত-লোকেরা’ এখনও সে কথা জানতে পারিনি; তাদের জ্ঞান বাড়ুক তখন তারাও বলবে যে, ‘আমরা অনেক পরীক্ষা করে দেখেছি যে গঙ্গা নদীর জলে সকল রোগের বীজ নাশ হয়’। তারপরে, তবে তোমাদের মতন বাবুদের এ কথা বিশ্বাস হবে। ‘গঙ্গার জলে শুলাগঠার বীজ নাশ হয়’ এ কথা, সাহেবরা বলবার আগে তো বিদ্যান (?), আর সভ্য (?) বাবুরা বিশ্বাস না করে উপহাস করে উড়িয়ে দিতেন, এখন সেই উপহাসের-কথা বিশ্বাস করে নিজেদের লজ্জা হয়না। আমি তো মূর্থ আর অসভ্য লোক তাই এটা ঠিক বুঝতে পারিনা—আমায় কেউ বুঝিয়ে দিতে পারে যে—যে সব লোক, নিজেদের জাতের আর ধর্মের প্রাচীন পুঁথিগুলোকে অবিশ্বাস করে নিজেদের, একটা অসভ্য-জাতের বংশধর বলে জগতের মাঝে পরিচয় দে’য়, তারপর অন্য এক দেশের, অন্য এক ধর্মের লোক যখন তাদের বলে দি’য় তখন তারা নিজেদের জাতের আর ধর্মের প্রাচীন পুঁথিগুলোর কথা বিশ্বাস করে—সেই সব লোক কি করে নিজেদের সভ্য আর শিক্ষিত বলে? বলতে একটু লজ্জা করেনা? নিজের মনের কাছেও কি নিজেকে একটু ছোট বলে বোধ হয়না? দূর, ছাই—কেনই বা তা হবে? এরা সব যে, গ্রামের মাঝখান দিয়ে যায়। যাক্কে আর বেলা বাড়িয়ে কাজ নেই—চানটা সেরে ফেলি। নাগো সর্বরোগ-নাশিনী, সর্বপাপ নাশিনী গঙ্গা তোমার জয় হোক না।”

এই কথা বলিয়া জলের অতি নিকটে উপস্থিত হইয়া দীক্ষ একটি প্রণাম করিল এবং কিঞ্চিৎ জল হাতে করিয়া লইয়া নিজের মাথার উপর

ভুল-ভাল

ছিটাইয়া দিয়া, অমুচ্চ-স্বরে বলিল—“মা গঙ্গা, চান করবার জন্তে বাধ্য হ’য়ে তোমার পবিত্র জলে পা দিতে হচ্ছে, সেজন্য মাপ ক’র মা।” এই কথা বলিয়া দীর্ঘ গঙ্গার জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং কখনও সাতার দিয়া, কখনও ডুব দিয়া, খুব আনন্দ ও উৎসাহ ভরে স্নান করিতে লাগিল।

বঠ পরিচ্ছেদ ।

নবীনচাঁদ ঘোষ কলিকাতা শহরের একজন বিখ্যাত ধনী ও ব্যবসায়ী ছিলেন । ব্যবসা করিয়া তিনি অগাধ অর্থ উপার্জন করিয়া মৃত্যুকালে অনেক দৈন্য সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন ।

পূর্বে তাঁহার অবস্থা ভাল ছিল না । নবীনচাঁদের পিতা সামান্য গৃহস্থ ছিলেন । তিনি একখানি বাটি, নগদ তিন সহস্র মুদ্রা এবং তিনটি পুত্র রাখিয়া এই নগর পৃথিবী পরিত্যাগ করেন । তাঁহার তিন পুত্রের মধ্যে নবীনচাঁদ সর্ব কনিষ্ঠ ছিলেন । পিতার মৃত্যুর পর তিন সহোদরে পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তি আপোষে বিভাগ করিয়া লইল । নবীনচাঁদের ইচ্ছা ছিল যে, তিন সহোদরে মিলিয়া কোনরূপ ব্যবসায় লিপ্ত হন । কিন্তু তাঁহার সহোদর যুগল তাহাদের স্বত্ত্বের পরামর্শে এ বিষয়ে একেবারে অসম্মত ছিল বলিয়া নবীনচাঁদ প্রস্তাব করেন যে—“আমি এষ্ট বসত-বাটির কোনও অংশ লইব না, তোমরা দুইজনে তাহা সমান দুই অংশে বিভাগ করিয়া লও, আমাকে ঐ নগদ তিন সহস্র মুদ্রা প্রদান কর ।” নবীনচাঁদের প্রস্তাবে তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর রামনাথ ও কনিষ্ঠ সহোদর হরিনাথ একবাক্যে সম্মত হইলেন । নবীনচাঁদ নগদ তিন সহস্র মুদ্রা লইয়া—তাঁহার প্রাপ্য, বসত-বাটির এক তৃতীয়াংশের দাবী পরিত্যাগ করিলেন এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠাশ্রম ও মধ্যমাশ্রম যেমন ঐ নগদ টাকার কোনও অংশ পাইলেন না—তেমনি তাঁহারা বসত-

ভুল-ভাগ্য

বাটিটি সমান দুই অংশে পাইলেন নবীনটাদকে আর তাহার কোনও অংশ দিতে হইল না :

এইরূপভাবে আপোষে বিষয় বিভাগ করিয়া লইয়া তিন সহোদরই কক্ষক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। নবীনটাদের সহোদর-যুগল একটা সওদাগরী অফিসে চাকুরী করিতে প্রবেশ করিল। তাহারা পঁচিশ টাকা বেতনে চাকুরী করিতে আরম্ভ করিল ; তৎপরে ত্রিশ বৎসর পরে সংবাদ লইয়া জানা গেল যে—‘তাহাদের বেতন, এই সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর ধরিয়া বাড়িতে, বাড়িতে এখন পঁচাত্তর টাকার দাঁড়াইয়া গিয়াছে এবং আর বাড়িবার দিকে অগ্রসর হইতেছে না। বেতন বেচারী এই সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর ধরিয়া বাড়িবার দিকে চলিয়াছে, সুতরাং এই দীর্ঘ দিনের পথ চলিয়া যাওয়াতে বেচারাকে বাত-ব্যাধিতে ধরিয়াছে তাই সে বেচারী আর চলিতে না পারিয়া পঁচাত্তরের ঘরে আসিয়া, চলচ্ছক্তিহীন হইয়া পড়িয়া আছে। ইহারা সেক্ষণ বুদ্ধিমান হইলে এই বাত-ব্যাধিগ্রস্ত বেতনকে গরম তৈল মালিশ করিয়া কার্য্যক্রম করিতে পারিত। কিংবা যে ভাগ্যবানের হাতে বেতন বেচারার দেহ ও প্রাণ রক্ষিত, সেই ভাগ্যবানকেও তৈল-দান করিতে পারিলে—বেতন বেচারী ব্যাধিমুক্ত হইয়া পুনঃ কার্য্যক্রম হইতই হইত।^{১০} কারণ Things which are equal to the same thing are equal to one another আমরা এইরূপ অনেক ক্ষেত্রে সুফল কলিতে দেখিয়াছি। তৈল-দান করিয়া বহু—বহু ব্যক্তি, তাহাদের বাত-ব্যাধি-গ্রস্ত চলচ্ছক্তিহীন বেতনকে পুনরায় কার্য্যক্রম, সবল ও ক্রতগমনশীল করিয়াছে।

ভুল-ভাঙ্গা

নবীনচাঁদের সহোদর-যুগল কিন্তু এইরূপভাবে তৈল-দান করিতে ঘৃণা বোধ করিত। তাহারা ঐ অবস্থাতেই সন্তুষ্ট ছিল। কেবল এই বেতন বিষয়ে নহে—সকল বিষয়েই তাহারা অতি অল্পে সন্তুষ্ট হইত। এই কারণেই, পিতৃ-বিয়োগের পর বিষন্ন বিভাগের সময় তাহারা, কনিষ্ঠ নবীনচাঁদের প্রস্তাবানুসারে আপোষে বিষয় বিভাগে সন্তুষ্ট হইয়াছিল। সে সময়ে তাহারা যদি আপোষ-বিভাগে সন্তুষ্ট ও সন্তুষ্ট না হইয়া পরস্পরে মোকদ্দমা করিত তাহা হইলে আজ আর তাহাদের—নিজের বাটিতে অবস্থান করিয়া, অর্থণী ও অপ্রবাসী হইয়া, স্ত্রীপুত্র লইয়া স্থখে দিন যাপন করিতে হইত না। আপোষে নিষ্পত্তি না করিয়া যদি তাহারা মোকদ্দমায় মারিত তাহা হইলে বৎসর খানেকের মধ্যে তাহারা দেখিত যে—মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে বটে কিন্তু মোকদ্দমার খরচা যোগাইয়া তাহারা পথের ভিখারী হইয়াছে এবং সম্পত্তির মধ্যে তিন ভাতার তিনখানি মোকদ্দমার-রায়ের কাগজ আছে—তাও আবার নকল।

নবীনচাঁদের, কি জানি কেন, ব্যবসার দিকে বরাবরই প্রবল ঝোঁক নবীনচাঁদ নগদ তিন সহস্র মুদ্রা লইয়া ব্যবসা করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বড় রাস্তার ধারে একখানি ছোট বাটী ভাড়া লইলেন। ঐ বাড়ীটির নিম্নতলে তিনি একখানি খনিহারির দোকান খুলিলেন এবং উপরতলে জীকে লইয়া বাস করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথমে মুগীশাটা হইতে পাইকারী দরে জিনিষ কিনিয়া আনিয়া, খুচরা দরে এখানে বেচিতে লাগিলেন। ভাগ্যলক্ষীর ও বাণিজ্যলক্ষীর রূপায় তাঁহার বেশ লাভ হইতে লাগিল। তিনি নানারকমে মাথা খেলাইয়া ব্যবসার

ভুল-ভাল্লা

শ্রীবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। যত দিন বাইতে লাগিল তাঁহার আরও তত' বৃদ্ধি পাইতে লাগিল কিন্তু তাঁহার নিজের পারিবারিক খরচা একটি পয়সাও বাড়িল না। তিনি পূর্ব হইতেই কষ্ট করিয়াও জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিতেননা এবং খুব আড়ম্বর করিয়াও দিন যাপন করিতেন না; মধ্যবিত্ত গৃহস্থের মত মাঝারী রকম চালে চলিতেন। এখন তাঁহার আর বাড়িল বলিয়া তিনি খরচা বাড়াইলেন না—পূর্ববৎ চালে চলিতে লাগিলেন। পাঁচ বৎসর পরে তিনি হিসাব করিয়া দেখিলেন যে সমস্ত খরচ-খরচা বাদে প্রায় বিশ সহস্র টাকা লাভ হইয়াছে। এই সময় তিনি পূর্ব ব্যবসা ত্যাগ করিয়া বিলাতী কাপড়ের ব্যবসারে প্রবৃত্ত হইলেন। দেশে তখন বিলাতী কাপড়ের খুব আদর ও কাটুতি। কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনি প্রচুর অর্থ লাভ করিলেন এবং স্বয়ং বিলাতে করমাস দিয়া রাশি, রাশি কাপড় আমদানী করিয়া বিক্রয় করিতে লাগিলেন। প্রায় বার বৎসর এইভাবে ব্যবসা চালাইয়া তিনি নগদে ও ভূসম্পত্তিতে প্রায় পনের লক্ষ টাকার মালিক হইলেন। ব্যবসায় ক্ষুদ্রে অনেক বড়, বড় ইংরাজ ও মাদোয়ারীর সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হইল; তিনি চারিদিকে খুব সম্মান পাইতে লাগিলেন এবং কলিকাতার একজন বড় ব্যবসাদার ও ধনী ব্যক্তি বলিয়া দেশ, বিদেশের ব্যবসাদার মহলে প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন।

নিজের আর্থিক অবস্থার উন্নতির সঙ্গে, সঙ্গে নবীন চাঁদ ভাড়াটিয়া বাটি পরিত্যাগ করিয়া—নিজের বাসের জন্য একখানি প্রাসাদ-ভূলা অট্টালিকা নির্মাণ করাইলেন এবং তাহা সাহেবী ফাসানে সুসজ্জিত করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। এই নূতন বাটিতে আশুদার

ভুল-ভাগ

দুই মাস পূর্বে তাঁহার একটি পুত্র নবীন জন্মগ্রহণ করে। তিনি নূতন বাটিতে আসিবার পরে, যথাসময়ে খুশি ধুমধাম করিয়া পুত্রের শুভ 'অন্ন-প্রাশন' ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া, বড় আদরে পুত্রের নাম রাখিলেন শরৎচন্দ্র।

যত দিন যাঁতে লাগিল নবীনটাদ উন্নতির দিকে ততই অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার বয়ঃ কারবার, বৃদ্ধ কার্যাবলি মত কর্মচারী দ্বারা পরিপূর্ণ। এই সকল কর্মচারীর উপর একজন অধ্যক্ষ আছেন, তাঁহার নাম গোবিন্দবাবু। গোবিন্দবাবু খুব বিশ্বাসী এবং বিজ্ঞ ও কার্যদক্ষ ব্যক্তি। তিনি নবীনটাদের দালীবন্ধু এবং এখনও উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। নবীনটাদ, গোবিন্দবাবুকে খুব 'যথাসময়' ঢেকে দেখেন এবং তাঁহার ব্যবসার ঢাকা কাড়ি সংক্রান্ত সমস্ত দায়িত্বপূর্ণ কার্যের ভার গোবিন্দবাবুর উপর অর্পণ করিয়াছেন। গোবিন্দবাবু খুব বিশ্বাস ও দক্ষতার সহিত সমস্ত কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন। সুদক্ষ অধ্যক্ষ বলিয়া গোবিন্দবাবু চারিদিকেই বেশ সুনাম হইয়াছে এবং তাঁহার কলব্যবসার গুণ, বিশ্বস্ততা ও প্রভুপরায়ণতার কথা নবীন-টাদ যেমন জানিতেন তেমনই পরিচিত, অপরিচিত অনেক লোকই জানিত।

সময় যখন ভাল হয় তখন ধূলা মুঠা ধরিলে সোনা মুঠা হয়! নবীন-টাদ এই সময় হইতে রপ্তানীর ব্যবসা ধরিলেন তিনি কলিকাতা ও মক্কাযল হইতে চাউল, গরিয়া, পাট প্রভৃতি কিনিয়া বিদেশে রপ্তানী করিতে লাগিলেন। এই রপ্তানীর ব্যবসায়েও তিনি প্রভূত অর্থ লাভ করিতে লাগিলেন।

ভুল-ভাঙ্গা

নবীনচাঁদ প্রথম অবস্থায় এক নৌকায় পা দিয়া চলিতেন, কিন্তু পরমা হওয়ার সঙ্গে, সঙ্গে তিনি দুই নৌকায় পা দিয়া চলিতে লাগিলেন। তিনি খিচুড়ী ভাদাপন্ন হইয়া পড়িলেন ; কিন্তু অতি অল্প পরিমাণে। তিনি সভ্য লোকের সহিত মিশিতেন বটে কিন্তু নিজে পুরা সভ্য হইতে চাহিতেন না এবং হনও নাই। তবে তাঁহার পুত্র শরৎচন্দ্রকে পুরা রকম সভ্য করিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষার বড়ই পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার সভ্য বন্ধুগণের সহিত আলোচনায় ও পরামর্শে তাঁহার দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল যে--পাশ্চাত্য শিক্ষার শিক্ষিত হইলে মানুষ স্বার্থ সভ্য, শিক্ষিত ও উন্নতিশীল হয় ; তাহার চরিত্র সুগঠিত হয়, মন স্বাধীন হয়, প্রবৃত্তি স্বাধীন হয় ; সে স্বার্থ মানুষ হয়। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া তিনি, পুত্র শরৎচন্দ্রকে উত্তমরূপে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করিবার মানস করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত তিনি বহুপ্রকার উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। শরৎচন্দ্রকে বেণী দামের স্কুলে ভর্তি করিয়া দিয়াছিলেন এবং অনেক টাকা খরচ করিয়া জটনক বিলাত-কেদরকে, তাহার গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি নিজে স্ব-সমাজ ও স্বধর্মভাগী সুসভ্য লোকদের সহিত অবাধে মেলামেল করিতেন বটে কিন্তু কখনও স্ব-ধর্মে আস্থাশীন হন নাই এবং তাঁহার বাটি যদিও সাহেবী ক্যাসানে সুসজ্জিত তবুও বাটির দরকোচতলে ঠাকুর-ঘর নামধেয় একখানি স্বতন্ত্র গৃহ ছিল ও সেই ঠাকুর ঘরে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল শ্রীযুক্তি স্থাপিত ছিল। তিনি প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যাবেলায় ঐ ঠাকুর ঘরটিতে যাওয়া সদ্ধাঙ্গিক করিতেন।

নবীনচাঁদ অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া বহু প্রকার উপায় অবলম্বন

ভুল-ভাগ্য

করিলেও শরৎচন্দ্র কিন্তু যথার্থ শিক্ষিত হইতে পারিল না, তাহার যথার্থ বিজ্ঞা লাভ হইল না এবং সে বিশেষরূপে কতকগুলি কুফলের অধিকারী হইল। ভুল হইতে এণ্টেন্স পাস করিয়া সে কলেজে প্রবেশ করিল এবং যথা সময়ে এল, এ পাস করিল।

এণ্টেন্স পাস করিয়া কলেজ প্রথম ভর্তি হইবার কিছুদিন পর হইতে শরতের মেজাজটা গরম হইয়া গেল। সে নিজেকে একজন শিক্ষিত লোক বলিয়া ভাবিতে লাগিল। তৎপরে যত দিন বাইরে লাগিল তাহার এত দাবণা ও তত বাড়িতে লাগিল। এল, এ, পাস করিয়া যখন সে বি, এ, পড়িবার নিমিত্ত তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হইল তখন হইতে সে, নিজেকে একজন মহা-জ্ঞানী ও বিশেষ বিদ্বান লোক বলিয়া মনে ক'রিতে লাগিল। সে যখন-তখন, যার-তার কাছে নিজের বিজ্ঞার বড়াই করিত এবং কোনও বিষয়-না বুঝিলেও তাহাতে যত্নব্য প্রকাশ করিত ও তাহার মত অজ্ঞায় বা ভুল হইলেও সে, সেই ভুল মত প্রতিষ্ঠার জন্য কতকগুলি অসার ব্যক্তি প্রয়োগ করিত এবং যখন আর হালে পানি পাইত না তখন দর্শকের মতন ইতর ভাষা প্রয়োগ করিয়া প্রতি-পক্ষকে অপমান করিত। এতদ্ব্যতীত সে, নিজেকে বৈজ্ঞানিক বলিয়াও মনে করিত—ইহার কারণ এই যে, সে এল, এ, পড়িবার সময় বিজ্ঞান পাঠ করিয়াছিল এবং বি, এ',তেও বিজ্ঞান পড়িতেছিল।

পাশ্চাত্য শিক্ষার মহিমায় এবং বাটিতে বিলাত ফেরৎ মাষ্টারের নিকট কতকগুলি—আমাদের ধাত্রে সম্পূর্ণ অরূপযোগী এবং আমাদের পক্ষে অসার—পাশ্চাত্য বাজে নভেল পড়িয়া শরৎচন্দ্র ঘোরতর নাস্তিক

হইয়া পড়িল ; তাহার চরিত্রও বিসদৃশ হইয়া দাঁড়াইল । তাহার ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই, পিতামাতার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা দূরে থাক, মাতা-মমতা অবশিষ্ট নাই । সে, নিজের ইচ্ছামত সমস্ত কার্য্য করে, কোনও বিষয়ে কাহারও কোনওরূপ মানা মানেনা ।

শরৎচন্দ্রের পিতা নবীনচাঁদও—তাহার স্বৈচ্ছামত কার্য্য সম্পাদনে কখনও কোনওরূপ বাধা দিতেন না । নবীনচাঁদ, তাহার সকল আর্ব্জার সহ্য করিতেন ; সে যখনই বাহা চাহিত, তখনই তাহাকে তাহাই দিতেন । বিলাত-ফেরৎ গৃহ-শিক্ষকের হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিয়া নবীনচাঁদ নিশ্চিন্ত ছিলেন । শরতের চাল-চলন সর্ব্বক্ষে কেহ কোনওরূপ অন্বেষণ করিলে নবীনচাঁদ তাহাতে কণপাত করিতেন না । শরৎ প্রতিমাসে তিন,চারিশত মুদ্রা ব্যয়ে খরচ করিলেও তিনি তাহাতে কোনওরূপ বাধা দিতেন না ।

শরৎচন্দ্র সাহেব-বাড়ী হইতে নানা ক্যাসানের সাহেবী-পোষাক প্রস্তুত করায় । খুব বেশী দাম দিয়া এক-এক প্রস্তু পোষাক তৈয়ারী করায় এবং ছুই একবার ব্যবহার করিয়াই তাহা বাতিল করিয়া দিয়া আবার অনেক টাকা খরচ করিয়া নূতন পোষাক লইয়া আসে । গৃহ-শিক্ষককে লইয়া প্রায়ই সাহেবদের হোটেলে যাইয়া খাবা খাইয়া আসে । এই সমস্ত নানারূপ কারণে সে প্রতি মাসে শত, শত মুদ্রা ব্যয় করে । নবীনচাঁদ এই খরচের জন্য তাহাকে একদিনও কোনও প্রকার জিজ্ঞাসা-বাদ করিতেন না, বা সে ‘কি করিতেছে,’ ‘কি না করিতেছে’ এ সর্ব্বক্ষে কোনও সংবাদই লইতেন না । তবে—মধ্যে, মধ্যে কেবল বিলাত-ফেরৎ শিক্ষক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিতেন যে—“শরতের লেখাপড়া কি রকম হচ্ছে ?” শিক্ষক মহাশয় উত্তরে বলিতেন যে—“উত্তমরূপেই

ডুল-ভাঙ্গা

হ'চ্ছে। আমি, শরৎকে বই পড়িয়ে শিক্ষা দিচ্ছি; মিউজিয়াম, জু-গার্ডেন, বোটানিকাল-গার্ডেন প্রভৃতি নানা স্থানে ওকে নিয়ে গিয়ে ব্যবহারিক-জ্ঞান দিচ্ছি। কলেজের পড়া ছাড়া ভাল, ভাল পাশ্চাত্য দেশীয় পত্রিকা উপন্যাস, সাহিত্য প্রভৃতি বাড়ীতে পড়ানি।” এই সকল কথা শুনিয়া নবীনচাঁদ ভাবিতেন যে, তাঁহার শরৎ অতি শীঘ্রই একজন আদর্শ ব্যক্তি বলিয়া জগৎ মাঝারে পরিচিত হইবে।

নবীনচাঁদের বাল্যাবস্থা ও কাযানায়ের অধ্যক্ষ গোবিন্দবাবু কিছ্র মধ্যে, মধ্যে শরতের ‘বে-চাল’ সম্বন্ধে তাঁহার নিকট অনুরোধ করিলে নবীনচাঁদ তাঁহাকে বলিতেন যে—“আমি কি না বুঝে, অথবা শরৎকে স্বেচ্ছামত চ'লতে দি? আমি যদি তাঁর স্বেচ্ছামত কাজ ক'রতে বাধা দিতে থাকি তাহলে ওর মনের স্বাধীন-প্রবৃত্তিগুলি পরিস্ফুট হ'তে পারবেনা; অঙ্কুরেই সেগুলি নষ্ট হ'য়ে যাবে। স্বেচ্ছামত কাজ ক'রতে বাধা পেতে, পেতে ওর মনটা শীঘ্রই দাসভাবাপন্ন হ'য়ে পড়বে। দেখ গোবিন্দ, এই কারণেই আমাদের জাতের এত অবনতি। আমি, আমার শিক্ষিত, সভ্য বন্ধুদের সঙ্গে এ বিষয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক ক'রে দেখেছি যে, তাঁদের কথাই ঠিক। তাঁরা বলেন যে—‘আমরা, আমাদের ছেলেদের বাল্যাবস্থা থেকে তাদের স্বেচ্ছামত কাজ ক'রতে বাধা দিয়ে থাকি ব'লেই তাদের মনটা দাসভাবাপন্ন হয়ে পড়ে, পরিণামে আর ত'রা জীবনে বিশেষ রকম উন্নতি ক'রতে পারেনা।

পুত্রের মন যাহাতে দাসভাবাপন্ন হইয়া না যায় সেজন্য পুত্রের পিতা যেরূপ কায্য করিতেছিলেন, পুত্রের মাতা, তাঁহার সেরূপ কায্যের একেবারেই অনুরোধ করিতেন না। শরৎচন্দ্রের মাতা মোক্ষদাসবরী,

ভুল-ভাঙ্গা

পুত্রের কথাবার্ত্ত ও বিপরীত চাল-চলনে একেবারে বুক-ভাঙ্গা হুইয়া পড়িয়া স্বামীর নিকট প্রায়ই নানারূপ অভিযোগ করিতেন কিন্তু স্বামীর উপেক্ষা ও অমনোযোগ ভিন্ন এ বিষয়ে আর কোনও কল পাইতেন না। অবশেষে নিজেই, শরৎকে সংশোধন করিবার মানসে তিনি প্রায়ই তাকে সাদরে নিকটে বসাইয়া—দেব-দ্বিজ ও পিতামাতার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইবার নিমিত্ত নানারূপ উপদেশ দিতেন। কিন্তু “চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী” শরৎচন্দ্র মাতার উপদেশের এক বর্ণও পালন করিত না। সে প্রথম প্রথম মাতার আশ্বাসে তাঁহার নিকটে গমন করিয়া তাঁহার উপদেশগুলি কান পাতিয়া শুনিত। কিন্তু সে যখন ভাবিয়া দেখিল যে—তাহার মাতা যে সকল উপদেশ দেন তাহা কোনও সভ্য-রচিত পুস্তকে নাই এবং তাহার বিলাত-কেরং গৃহ-শিক্ষকও কখনও এরূপ উপদেশ তাহাকে দেননা; বরঞ্চ ইহার বিপরীত উপদেশই দেন—তখন সে আর মাতার আশ্বাসে, তাঁহার নিকটে বাইত না। ‘এখন পড়িছি,’ ‘এখন বিশেষ কাজ আছে,’ ‘এখনই বাইরে যেতে হবে,’ ‘আর একটু পরে যান’ ইত্যাদি, ইত্যাদি নানারূপ ওজর করিয়া সে, মাতার আশ্বাস উপেক্ষা করিত। তারপর যখন আর কোনও ওজর করিবার হেতু পাউত না তখন অতীব বিরক্তি ভাব প্রদর্শন করিয়া, মাতার নিকট গমন করিত এবং তিনি কিছু দূরবর্তিতে আসিলে দাঁত মুখ গিচাইয়া বলিত যে—“তুমি কা’কে বোঝাতে আস বল দেখি? আমি কি একটা মুর্থ না ‘দে-সে’ লোক যে তুমি আমায় ঐরকম বাজে কথা সব বোঝাতে আস? তোমার ঐ সব অসার মুক্তি নিয়ে তুমি চিরদিন থাক, আমায় খরস্কার ওসব আর বলতে এসনা।” এই রকম ধরনের কথা বলিয়া

ভূত-ভাগ্য

পুত্র সরোষে স্থান-তাগ করিয়া যাউত। স্বামীর নিকট বলিতে গেলে তিনি, নিজের বিজ্ঞতা দেখাইয়া নানাক্রপ প্রবোধ বাক্যে সাহস দিয়া মোক্ষদাসুন্দরীকে নিরস্ত করিতেন, পুত্রকে কখনও শাসন করিতেন না। মোক্ষদাসুন্দরীর প্রাণ কিন্তু এইরূপ প্রবোধ-বাক্যে শান্ত হইত না। পুত্রের ভবিষ্যৎ চিন্তায় মগ্ন। কাতর হইয়া, প্রতীকার কামনায়, তিনি বড় আশা করিয়া স্বামীর শরণাপন্ন হইয়া বার, বার বিফল মনোরথ হইয়া অবশেষে জগৎ-স্বামীর শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহার স্বামী বাহাতে পুত্রের এই বিপরীত ভাবের প্রতীকার করেন এবং পুত্রকে শাসন করেন এই প্রার্থনা তিনি দিবানিশা জগৎ-স্বামীর নিকট করিতে লাগিলেন। 'হে ভগবান আমার স্বামীর চোখ ফুটিয়ে দাও, আমার ছেলের এই বিপরীত মতিগতির কথা তিনি ঘেন বুঝতে পারেন' এই প্রকারের সকাতির প্রার্থনা, শ্রীভগবানের শ্রীচরণে, মোক্ষদাসুন্দরী ভক্তিপূর্ণ চিত্তে করিতে লাগিলেন। স্বামী, পুত্রের মঙ্গল কামনায় শিশু-মতীর এই সকাতির প্রার্থনা শুনিয়া শ্রীভগবান কাতর হইয়া পড়িলেন—তিনি ইহার প্রতীকার করিয়া দিলেন।

মোক্ষদাসুন্দরী যদি এতকাল ধরিয়া লৌকিক সাহায্যের আশায় না থাকিয়া উপরকার সাহায্য কামনা করিতেন তাহা হইলে কোন্‌কালে তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হইয়া যাউত। অজ্ঞানতাবশে, মোহবশে তিনি এতদিন তাহা করেন নাই তাই তাঁহার এতটা মনকষ্ট ভোগ হইল। এক্ষণে করুণাময় শ্রীভগবানের শরণ লওয়াতে তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হইল। একদিনের একটি সামান্য ঘটনা হইতে নবীনচাঁদ, শরতের স্বরূপ-মূর্তি দেখিতে পাইলেন, তাঁহার জ্ঞান-চক্ষু প্রস্ফুটিত হইল, তিনি স্বকৃত কর্ম্মের বিষময় ফল দেখিয়া অন্ধরে শিহরিয়া উঠিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

নবীনচাঁদ একদিন মধ্যাহ্নের কিছু পূর্বে কোনও বিশেষ কাৰ্য্য
হেতু অসময়ে অন্দরে প্রবেশ করিতেছিলেন । প্রবেশ করিবার মুখে
তিনি ভিতর-দিক হইতে আগত একটা গোলমাল শুনিতে পাইলেন ।
প্রথমটায় বিশেষ কিছু বুঝিতে পারিলেন না । ভিতরদিকে আরও
খানিক অগ্রসর হইয়া পুত্রের ক্রোধ-মিশ্রিত উচ্চ কণ্ঠস্বর এবং পত্নীর
ক্রন্দনের শব্দ শুনিতে পাইলেন । তিনি বিস্মিত চিত্তে আরও অগ্রসর
হইয়া একটি কক্ষের সম্মুখে আসিয়া দেখিলেন যে, শরৎচন্দ্র আহার
করিতে বসিয়াছে এবং তাহার মাতা মোক্ষদাসুন্দরী নিকটে অবনত
মস্তকে কান্দিতেছেন । শরৎচন্দ্র খুব তর্জ্জন, গর্জ্জন করিয়া হাত, মুখ
নাড়িতে নাড়িতে মোক্ষদাসুন্দরীর দিকে চাহিয়া তাঁহাকে বলিল—
“তোমায় আমি আজ শেষ ব’লে দিচ্ছি যে, তুমি আমার আর কখনও
অনন ‘যা-তা’ বোঝাতে এস না । যদি আস, তাহলে আজ যা অপমান
হ’লে তার বিশ-গুণ বেশী অপমান হবে । তুমি নিজে বেগন ইল্‌লিটারেট
তার ঠিক উপযুক্ত অপমান আজ হ’গনি ।”

শরৎচন্দ্র ব্যক্তব্য শেষ করিয়াই আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং
বাহিরে যাইবার জন্ত, পশ্চাৎ ফিরিয়া, দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতে উদ্যত
হইয়াই দেখিল যে, তাহার পিতা দ্বারে দণ্ডায়মান ।

নবীনচাঁদ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“কি হয়েছে কি ? এত
গোলমাল কিমের ?”

ভুল-ভাল

মোকদাসুন্দরী হেঁট-মুণ্ডে, ফোঁপাইয়া, ফোঁপাইয়া কাঁদিতেন। স্বামী'র কর্ণস্বর শ্রুতিতে পাঁইয়াই তিনি দুগ্ধ তুলিয়া চাহিলেন এবং স্বামীকে দ্বারের নিকট দণ্ডায়মান দেখিয়া বলিলেন—“ওগো তোমার পায়ে পড়ি—আমায় কোথাও পাঠিয়ে দাও। আমি এখানে আর একদণ্ড থাকতে পারবনা। এখানে থেকে—মা হ'য়ে, ছেলের এ রকম অধঃপতন চক্ষের ওপর দেখতে পারবনা আর তার কাছে এরকম অপমানও হ'তে পারবনা। এই কথা বলিয়া তিনি আরও জোরে ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

এই ঘরটি শরৎচন্দ্র বাদর পাস-কামরা। সে এই ঘরে দুইবেলা আহার করে এবং রাত্রিকালে শয়ন করে। এই ঘরে একখানি, একজন লোক শুইবার উপযোগী ছোট খাচ্ আছে। নবীনটান এই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া পাঠের উপর উঠিয়া বসিলেন এবং পুত্রকে নিকটে বসিতে আদেশ (শ্রীবিষ্ণু—অনুরোধ) করিয়া বলিলেন—“দেখ শরৎ, তুমি এখন চোদ্দ, পনের বছরের ছেলে তখন থেকে আরম্ভ ক'রে আজ পর্যন্ত, তোমার মা, তোমার নামে অনেক অভিযোগ আমার কাছে করেন। তুমি পূর্বে ছেলেমানুষ ছিলে সেইজন্তে তখন; আর তারপরেও তুমি উপযুক্ত শিক্ষা পাচ্ছ ব'লে সে সব কথা আমি কাণে তুলিনি। কিন্তু তোমার মার প্রতি ত্রেনমার যে উক্তি, আজ নিজ কণ্ঠে শ্রুণ্ব তাত্তে তো আমি আশ্চর্য হ'য়ে গেছি। তুমি এখন ছেলেমানুষ নও, তার ওপর তুমি আবার শিক্ষিত হ'চ্ছ; নেহাৎ মূর্থ বা ইতর তুমি তো নও—তোমার মুখ থেকে এদকম কথা বার হওয়া অতীব লজ্জা, অতীব ঘৃণার কথা। তা ছাড়া—তোমাদের মা-ছেলের মধ্যে এ রকম একটা বিরোধী-ভাব থাকাত' ভাল নয়।”

শরৎ বলিল—“বাবা মার প্রতি কি আমার যাকেক্সন (ভালবাসা) নেই ? আছে—তবে আমাদের মতন জানী ও শিক্ষিত লোকদের পক্ষে মতটা সঙ্গত ও সম্ভব ততটা ভালবাসা এবং কর্তব্যজ্ঞান মার প্রতি আমার আছে । কিন্তু তাই ব’লে স্ত্রীলোকের—বিশেষতঃ অশিক্ষিতা স্ত্রীলোকের কপ্পা আমি কি ক’রে পালন করি । যা যে সকল অসম্ভব ও অনুমোদনের অযোগ্য কথা ~~বলে~~, সে সকল কথা আমি কিছুতেই পালন ক’রতে পারিনা ।”

নবীনচাঁদ বিস্মিত ভাবে বলিলেন—“তোমার মা কি এমন অসম্ভব কথা বলে যা তুমি পালন ক’রতে পারনা ?”

শরৎচন্দ্র অবজ্ঞাভরে বলিল—“আমি যত বারণ করি যে আমার কাছে ও সকল যা, তা বোঝাতে এসনা, যা থানি ততই ব’লবে যে, ‘মা কালীকে ভক্তি কর’ ; ‘বাবা তারকনাথকে ডাক’ ; বাবা সত্যনাথের কাছে মাথা ঠোক’ । দেখুন আমি এক ঈশ্বরকেই মানিনা বা স্বীকার করিনা তা আমি আবার অত’ দেবতাকে মানতে যাবো । আমার কি আর অন্য কোনও কাজ নেই ।”

নবীনচাঁদ মহা বিস্মিত হইয়া বলিলেন—“সে কি হে, তুমি ঈশ্বরকে মাননা বা তাঁর অস্তিত্ব স্বীকার করনা কি ? ! কি ব’লছ তুমি, ফ্যা !”

শরৎচন্দ্র বিজ্ঞের মত গম্ভীর ভাবে বলিল—“ঈশ্বর ব’লে কেউ কি আছে যে তাকে মানতে যাব বা তাঁর অস্তিত্ব স্বীকার করব ? আপনার এত ব্যেস হ’য়ে গেল—‘ঈশ্বর নামে যে কিছুই নেই’ এই কথাটা আপনি এখনও জানতে পারেন নি বাকী ? ফ্যা !

নবীনচাঁদ বলিলেন—“সে কি ~~বলি~~ ঈশ্বর নেই কি ? তিনি অবশ্যই

ভুল-ভাঙ্গা

আছেন। এই দেখ, এই যে আমি অতি দরিদ্র অবস্থা থেকে এত বড়-লোক হয়েছি সেটা একমাত্র ঈশ্বরের দয়ায়, বিধাতার অনুগ্রহে।”

শরৎচন্দ্র উপেক্ষার হাসি, হাসিয়া বলিল—“আপনার যে এই অবস্থার উন্নতি হয়েছে তার বিধাতা আপনি নিজে। ঈশ্বর এসে আপনাকে বড় লোক ক’রে দিবে বায়নি—আপনি নিজের চেষ্টায় ও পরিশ্রমে বড়লোক হয়েছেন।”

নবীনচাঁদ বলিলেন—“না, না, তা কখনও নয়। আমার মতন, এমন কি আমার চেয়ে ঢের বেশী পরিশ্রম ও চেষ্টা, লক্ষ লক্ষ লোকে ক’রছে, কিন্তু সকলেই কি বড়লোক হ’তে পারছে? তুমি লেখাপড়া বাহোক কিছু শিখেছ আর তুমি এই সামান্য কথাটা বুঝতে পারলে না যে, ঈশ্বর যদি নেই তাহলে এই বিশাল পৃথিবী আর প্রাণী সৃষ্টি ক’রলে কে? আমাদের নিত্য-প্রয়োজন যোগাচ্ছে কে? শক্ত মাটিতে সোনা ফলাচ্ছে কে?”

শরৎচন্দ্র বলিল—“নেচার,—আপনাকে আর বেশী কি বলব—আপনি এই সামান্য কথাটা বুঝতে পারলেন না যে, নেচারের শক্তিতে (স্বভাবের শক্তিতে) এই পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে, শস্য উৎপাদন হচ্ছে। নেচারের বলেই সব হচ্ছে—নেচারের বলে আমরা জন্মাচ্ছি, জন্ম দিচ্ছি, জীবন-ধারণ করছি আবার মরে যাচ্ছি। ঈশ্বরের এতে কোনও হাত নেই। কাপুরুষ, দুর্বল-চেতা লোকেরাই ঈশ্বরের দোহাই দেয়। সত্য-জগৎ এই সমস্ত নিয়ে তোলপাড় হ’য়ে গেছে। মহা, মহা জানী মহাপুরুষরা এই সত্য আবিষ্কার ক’রে চির-স্বরণীয়, জগৎধরোপ্য হ’য়ে গেছেন। সত্যতা বুদ্ধির সঙ্গে, সত্য বিজ্ঞানের বল বাড়ছে—বিজ্ঞান-

ডুল-ভাঙ্গা

বলে কত শত, অসম্ভব কাজ আজ সম্ভব হ'য়েছে।' আপনি যে কথা ব'ললেন সে কথা অসম্ভব, অশিক্ষিত লোক বিশ্বাস ক'রবে। আমি শিক্ষিত, জ্ঞানী; তার ওপর বিজ্ঞানের সঙ্গে আমার পরিচয় হ'য়েছে, আমি আপনার কথা কিছুতেই বিশ্বাস ক'রব না—ক'রতে পারিনা জানবেন।"

নবীনচাঁদ ধীরভাবে বলিলেন—“শরৎ তুমি প্রবীণ লোক নও ছেলেমানুষ, তুমি জগতের এ সব রহস্যের কি বোঝা? যে, এই সব কথা তুলে আমার সঙ্গে তর্ক ক'রতে আস? আর, বিজ্ঞানেরই বা তুমি কি জান? তুমি তো এই সব খাউ ইয়ারে প'ড়তে আরম্ভ করেছ—”

শরৎচন্দ্র গর্জভরে বলিল—“আমি যে বিশ্ব-বিদ্যায় জ্ঞান লাভ ক'রেছি তা কি কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের নিদিষ্ট বিদ্যা অভ্যাস ক'রে? তা নয়, বাবা তা নয়—আমি অনেক রকম-ফের ক'রে তবে একটা বিশেষ জ্ঞানী লোক হয়েছি। আমি কলোজে পড়েছি তার ওপর আবার হোম-টিচার (গৃহ-শিক্ষক) আমাকে পাশ্চাত্য দেশের নানা রকম কষ্ট, পত্রিকা প্রভৃতি পড়ান—‘শুধু পড়ান’ নয়; সে সবের নানা রকমের টিকা, টিপস ক'রে নিগূঢ় অর্থ বুঝিয়ে দেন। আমি ধাঁক দিয়ে জ্ঞানী হইনি বাবা। আমি যে জ্ঞানী ব'লে প্রসিদ্ধি লাভ ক'রেছি সেটা বিশেষ পরিশ্রমের ও মস্তিষ্ক-চালনার বিনিময়ে।”

নবীনচাঁদ পূর্বাপেক্ষা ধীরভাবে বলিলেন—“জ্ঞান—সমুদ্র, মহা সমুদ্র বিশেষ। এই এত' অল্প বয়সে তুমি বা তোমার হোম-টিচার মহাশয় কি ক'রে জ্ঞানী হ'লে! তোমার মাষ্টার মশাই তো কেবল বিনোদ-ফেরতা। কিন্তু সেই বিলাতের মহাগনিষী, ‘পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির আবিষ্কারকারী’ মহাজ্ঞানী সার আইজ্যাক নিউটন জ্ঞান-সমুদ্রে কি

ভুল-ভাঙ্গা

বলেছেন মনে আছে কি ? তিনি তত বড় পণ্ডিত, অত বড় জ্ঞানী-লোক হ'য়ে বলেছেন যে, 'জ্ঞান-মহাসমুদ্র আগার সম্মুখে—আমি তার তীরে দাঁড়িয়ে উপলব্ধি তুলেছি মাত্র, জল স্পর্শও ক'রতে পারিনি—জ্ঞান-সমুদ্র অক্ষুন্ন ভাবে অবস্থান করছে'। শরৎ, মহাত্মা নিউটনের মতন লোক যদি এই কথা ব'লতে পারেন তাহলে আমাদের মতন লোকের কি জ্ঞানের গর্ভ করা উচিত ?

শরৎচন্দ্র বলিল—“নিউটন এ কথা মখন বলেছেন তখন তিনি জ্ঞানী ছিলেন না—তাই বলেছেন। আমি তা'বলে ৬ রকম কথা ব'লতে পারি না। আমি শিক্ষিত, আমি জ্ঞানলাভ করেছি, আমি নিজেকে অবশ্যই জ্ঞানী ব'লে প্রচার করব। দেখুন বাবা, আমার মতন শিক্ষিত জ্ঞানী লোককে আপনি—ঈশ্বর আছে, দেবতাকে ভক্তি কর—এই সব বাজে কথা বোঝাতে আসবেন না। আমার সম্বলোষে দেখছি আপনার শুশ্রূষা খারাপ হ'য়ে গেছে। It is a pity—really a pity.

নবীনচাঁদ বলিলেন—শরৎ, মাথা খারাপ আমাদের নয়—তোমারই খারাপ হয়েছে দেখছি। তুমি কিম্বা এমন জ্ঞানী হ'লে, কি এমন প্রমাণ পেলে যে, কটু ক'রে একেবারে বলে ব'সলে 'ঈশ্বর নেই।' তুমি তো তেমন কিছু শিক্ষিত হ'ওনি, তেমন কিছু তো পড়েনি—আর যদিই বা তোমার খুব পড়া থাকতো, তুমি অনেকগুলো পাস্ ক'রে থাকতে তাহলেই কি তুমি যথার্থ জ্ঞানী হতে পারতে ? অধিক বয়েস না হ'লে, বয়েস বৃদ্ধির সঙ্গে, সঙ্গে নাগা রকম দেখে শুনে অভিজ্ঞতা না বাড়লে মানুষ কিছুতেই যথার্থ জ্ঞানী হ'তে পারে না। মানুষের, উপযুক্ত জ্ঞান-লাভ মাত্রবতঃ অধ্যয়নেই হয়। আর, মানবতঃ অধ্যয়ন করবার উপযুক্ত

ও প্রকৃত পাত্র হ'চ্ছে মানুষ। তুমি আগে লৌকিক ধ'রে এবং ভাল ক'রে মানব-সমাজে মিশতে থাক', দর্শন ও মহাবাসের ফলে মানব-চরিত্র বিশেষ ক'রে অধ্যয়ন ক'রে একটা বিশেষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কর' তারপর নিজেকে কতকটা জানী ব'লে মনে ক'র। তার পরে কোনও একটা সিদ্ধান্তকে মনে স্থান দিও। এর পূর্বে—যে সব লোক জানী ছিলেন, তাঁরা বহু, বহু যুগ পূর্বে থেকে যে সব সিদ্ধান্ত ক'রে গেছেন সেগুলোকে মেনে নেও। মানব তত্ত্ব অধ্যয়ন না ক'রে, সংসার-রহস্য অবগত না হ'য়ে তুমি কি ক'রে নিজেকে জানী ব'লে মনে ক'রতে পার? তুমি শু্যত' আমার কথা কিংবা আমাদের দেশীয় কোনও মহাজনের বচন মানবেনা; কিন্তু পাশ্চাত্য-পণ্ডিতের বচন মানবেত? তোমরা প্রতি কথায় নিজেকে দেশের লোকের চেয়ে পাশ্চাত্য লোকেদের বচনের ও মতের দোহাই দাও এবং সেই সকল বচন ও মতের প্রতি অপেক্ষাকৃত অধিক অঙ্কাও দেখাও সেইজন্যে আমি তোমাদু পাশ্চাত্য-মহাজনের বচন উদ্ধৃত ক'রে এ কথাটা বুঝিয়ে দিচ্ছি। জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক মহাত্মা স্যার ক্রিষ্টিয়ান ইয়োহান্নেস দর্শন-শাস্ত্রের প্রথম প্রবর্তক। তিনিও এই গভীর সত্য শিক্ষা দিয়েছেন, তিনিও বলেছেন যে, 'The proper study of mankind is man' সত্যি—বহির্জগতে যেমন সেমন একটা সুশৃঙ্খলাবদ্ধ কার্য-প্রণালী দেখা যায়, অন্তর্জগতেও তেমনি সুশৃঙ্খলাবদ্ধ কার্য প্রণালী দেখতে পাওয়া যায়। মানুষ, অসীম অনন্ত বিশ্বের সংক্ষিপ্তসার; কাজে-কাজেই, বহির্জগতের নিয়মাবলীর অনুশীলন করা আর মানুষের আধ্যাত্মিক ও দৈহিক কার্য প্রণালীর আলোচনা করার ফল সমতুল্য। মানব-তত্ত্ব অধ্যয়ন করলে, কতটাই

ভুল-ভাঙ্গা

সব জানতে পারবে—এই জগতের রহস্য, জগতের অনিত্যতা, জড়ের নশ্বর শক্তি, ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রভৃতি সমস্তই জানতে পারবে।”

শরৎ অবজ্ঞাভরে বলিল—“আচ্ছ। বেশ, আগে মানব-তত্ত্ব অধ্যয়ন ক’রে দাঁড়ি তারপর যদি বুঝতে পারা যায় যে, ‘ঈশ্বর আছে’ তখন না হয় বলা যাবে ‘ঈশ্বর আছে’। কিন্তু এটা স্মির যে, সে ‘তখন’ কখনও আসবেন না।

নবীনচাঁদ বলিলেন—“দেখছি, শেষে সমস্তই তুমি একটা নাস্তিক হ’রে দাড়ালে। দেখ শরৎ তুমি যে শিক্ষা পেয়ে এই রকম নাস্তিক হয়েছ, যে জড়বিজ্ঞার পরিচয় পেয়ে তুমি আত্মবিশ্বস্ত হয়েছ সেটা কিছু নয়, সেটা অতি ক্ষীণ, স্থায়ী-পরিণামহীন পদার্থ। তুমি শিক্ষিত বলে নিজেকে পরিচিত ক’রচ অথচ সামান্য একটা পদার্থের সামান্য শক্তি দেখে—একটা যুগ-যুগান্তর ধ’রে প্রপ্রতিষ্ঠিত, সনাতন সত্যকে একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছ। এটা দেখছি তোমার শিক্ষার দোষ। তোমার এই ভ্রমপূর্ণ ধারণা মন থেকে ছুঁতে দাও। আমার কথাগুলি মন দিয়ে শোন তাহলে নিশ্চয়ই তোমার এই ভ্রমাত্মক ধারণা দূর হয়ে যাবে। দেখ—তুমি একটা পরাধীন জাতির একজন এবং ব্যাপকভাবে এখনও কিছু তোমার জাতের মধ্যে জড়বিজ্ঞার আলোচনা বা উন্নতি আরম্ভ হয়নি, তুমি নিজেও কিছু আবিষ্কার ক’রে ওঠনি তবে—অন্য, অন্য স্বাধীন ও ভিন্নধর্মীর বিজ্ঞা ও নানারকম বস্তুর আলোচনা ক’রে তোমার এই দশা উপস্থিত। দেখ স্থান, কাল, পাত্র ভেদে সমস্তই বিভিন্ন। এক স্থানের বা এক পাত্রের পক্ষে যেটা অতীব উপযোগী অন্য স্থান বা অন্য পাত্রের পক্ষে সেটা অতীব অল্পপযোগী। একের স্থান অন্যের পক্ষে

ভুল-ভাষা

বিষ, এক ভাষার প্রশংসা অন্য ভাষায় গালিগালাজ। এক গাছের ছাল অন্য গাছে লাগেনা। এক ঔষধে সকল রোগ সারে না। তারপর আরও একটা বিশেষ বিবেচনা করে দেখ—ব্যষ্টিভাবে না বলে সমষ্টিভাবে আমি তোমাকে, মানব-চরিত্রের একটা অতি গূঢ় ও প্রকৃত রহস্যের কথা বলছি। দেখ—মানুষের এক-একটা সময় এমন আসে যখন তারা আত্মবিস্মৃত হ'য়ে পড়ে। মানুষদের মধ্যে কোনও, কোনও জাতি শ্রীভগবানের রূপায় পূর্ব-স্মৃতির ফলে এক, এক সময়—বিজ্ঞায়, বিজ্ঞানে, অর্থে, দামর্থ্যে, যুদ্ধ-বিজ্ঞায় ইত্যাদি অনেক রকমে উন্নতি লাভ ক'রে সর্বদীন-উন্নতির চরম সীমায় ওঠে। সেই রকম সময় কতকটা জড়-বিজ্ঞা লাভ ক'রে এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ক'রে কেবলমাত্র জড়ের উপাসনা ক'রতে ক'রতে জড়ভাবাপন্ন হ'য়ে, তাদের ভেতর কতকগুলি লোক একেবারে নাস্তিক হ'য়ে গিয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করে আর কতকগুলি লোক ঈশ্বরকে একেবারে ভুলে যায়। বিজ্ঞা ও জ্ঞান অনন্ত, মানুষের মস্তিষ্ক ক্ষুদ্র—কাজেই, জ্ঞানের ও বিজ্ঞার ষথার্থ মর্ম্য বুঝতে নী পেরে আর নম্বর ঈশ্বা-মদে মত্ত হ'য়ে তারা মনে ক'রে যে ঈশ্বর ব'লে বা ঈশ্বরিক-শক্তি ব'লে কোনও পদার্থ নেই—তারা তাদের নিজের শক্তিতেই পৃথিবী পরিচালিত ক'রচে। কিন্তু যেই তারা বিপদে পড়ে, যেই তাদের শক্তি ও সমৃদ্ধিপূর্ণ দেশে কোনও বিপদ বা অশান্তি এসে উপস্থিত হয়, অমনি তাদের নেই আত্ম-বিস্মৃত ভাব কেটে যায়। উপমা স্বরূপ ধর—আর একটা প্রবল ও শক্তিশালী জাতি তাদের দেশ আক্রমণ ক'রে মহাযুদ্ধ উপস্থিত ক'রলে। তখন প্রথমটায় তারা, তাদের বড় গর্বের জড়শক্তির আশ্রয় নিয়ে তাদের আক্রমণকারী বিপক্ষদের সঙ্গে

কুল-ভাঙ্গা

শুদ্ধ ক'রলে। কিন্তু কিছুকাল যুদ্ধের পর যেই তারা দ্যাখে যে, তাদের জড়শক্তি কিছুতেই বিপক্ষকে পরাজিত ক'রতে পারছে না এবং সেই সঙ্গে তাদের নিজের দান, জন, শক্তি, যশ সমস্তই ধ্বংস হ'য়ে যেতে ব'সেছে তখনই অমনই তারা আকুল কণ্ঠে ব্যাকুল প্রাণে ঈশ্বরকে ডাকে—দলে, দলে উপাসনা-আগারে গিয়ে নতজানু ও নত-মস্তক হ'য়ে ঐশ্বরিক শক্তি ও করুণা ভিক্ষা করে। আবার আরও মজা এই যে, ঐ সব লোকই পূর্বে যে সব জাতকে—আধ্যাত্মিক-অসভ্য, কাপুরুষ, দৈববাদী প্রভৃতি বাক্য ব'লে সভ্যতা ও পুরুষকার শেখাতে গেছেন—সেই সব জাতকে তখন তারা বলে যে—“ওগো আমরা ত' এই রকম বিপদে পড়েছি দেখছ এখন তোমরা ও আমাদের মঙ্গলের জার বিপদে-জ্বারের জাত্রে ঈশ্বরকে ডাক, ঐশ্বরিক শক্তি প্রার্থনা কর।”

শরৎচন্দ্র, পিতার বাক্যে কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। কোনও কথা না বলিয়া কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিল, তৎপরে বলিল—“আপনি যাই বলুন জাবা, জড়ের শক্তি দেখে, আর পাঁচ রকম বিবেচনা ক'রে আপনার ঈশ্বরকে মানতে প্রবৃত্তি হয়না।”

নবীনচাঁদ বলিলেন—“বাপু হে সমীম জড়ের শক্তি দেখে তুমি এত চমৎকৃত হয়ে গেছ কিন্তু যে অসীম শক্তির ক্ষুদ্র এক কণা আশ্রয় ক'রে জড়ের শক্তি : সেই অসীম, অনন্ত চৈতন্য-শক্তির পরিচয় নিতে চেষ্টা কর দেখি—তাহলে আরও কতদূর চমৎকৃত হবে সেটা ভাবায় কি ব'লব ? আমাদের হিন্দু-শাস্ত্রে ব'লেছে যে—জড়ের ওপরে চৈতন্য। তুমি হিন্দু হয়েও হিন্দুশাস্ত্র কিছু পড়োনি, নিজের জাতীয়-বিচার সঙ্গে তোমার কোনও রকম পরিচয় হয়নি তাই তুমি অপরা-বিচার আপাত—রমণীয় অস্তিত্ব

তুল-ভাঙ্গা

সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে গেছ। তুমি আর ওসব জিনিস মাথায় রেখনা। আমাদের হিন্দু-শাস্ত্র অধ্যয়ন কর'। প্রাচীন আখ্যায়িকা যে সমস্ত কথা বলে গেছেন সেগুলি মেনে চলতে চেষ্টা কর। যথেষ্ট হয়েছে—আর অধঃপতনের পথে তোমায় নাগতে দিচ্চিনা।”

শরৎচন্দ্র অবজ্ঞাভরে বলিল—“মাপ ক'রবেন বাবা, আর আপনার ঐ আখ্যায়িকা আমাদের কথা তুলবেন না। তাঁরা ঋষিলোক, বনে থাকুন; এখানে আর তাঁদের আনবেন না—সহরে এলে তাঁরা আর দুদিনও দাঁচবেন না। আচ্ছা বাবা, আপনি পাচটা সভ্য লোকের সঙ্গে বাহ্যিক মিশেছেন, আপনি কি ব'লে আমায়, হিন্দু ধর্মের বই পড়তে বললেন বা আপনার বড় মামের, পুরাতন বন্ধু ঐ সব আখ্যায়িকা ঋষিদের কথা শিপাতে ও মেনে চলতে ব'ললেন? হিন্দু ধর্মের বইতে আছে কি বা আপনার ঐ সব অসভ্য পুরাতন বন্ধু আখ্যায়িকা জানে কি? তারা গভীর বনে থাকতো, ফলমূল খেতো, বন্য জন্তুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন ক'রত—হাঃ, হাঃ, হাঃ। (পিতার দিকে কটাক্ষপাত করিয়া ঈষৎ হাস্য করিল।) বললেন বাবা, এদেশে কিংবা আগাদের জাতীয়-শিক্ষার মধ্যে শিক্ষা করবার বা গ্রহণ যোগ্য কোনও জিনিস নেই। আপনার আখ্যায়িকা ঋষিদের বচন এবং হিন্দু-ধর্মের গ্রন্থ, সমস্তই কুসংস্কার, অতিরঞ্জন ও অসংযত্ন-পরিপূর্ণ। আপনাদের ঐ “চৈতন্যই” আপনাদের অচৈতন্য ক'রেছে তাই আপনারা—যাকে দেখতে পাচ্ছেন সেই “জড়কে” নীচে নামিয়ে দিবে, যাকে দেখতে পাচ্ছেন না অর্থাৎ যেটা নেই, সেই স্বকপোলকল্পিত বা গাঁজার-খেয়ালে-অনুভবিত “চৈতন্যকে” ওপরে স্থান দিচ্ছেন।”

নবীনচন্দ্র বলিলেন—“তুমি কি ব'লছ হে! আমাদের কথা ভেঙে

ডুল-ভাঙ্গা

দাও, পাশ্চাত্য জ্ঞানী, পণ্ডিতরা পর্যন্ত এখন আমাদের শাস্ত্রের-মতের সমর্থন ক'রছেন। প্রাচীন আৰ্য্য ঋষিগণের বিরচিত হিন্দু-শাস্ত্রের উক্তি-গুলি অতি সত্য, অলঙ্ঘন্য সত্য। জড়ের ও অপরাবিজ্ঞার অস্থায়ীত্ব ও অসারত্ব উপলব্ধি ক'রে পাশ্চাত্য-পণ্ডিতরা অবধি এখন, আমাদের হিন্দু-শাস্ত্রের প্রাচীন ও সনাতন উপদেশগুলি সত্য ব'লে মেনে নিচ্ছেন। আর ভোমাদের মতন স্বজাতিদ্রোহীরা সেই সব অমূল্য জিনিষকে উপেক্ষা ও অনালোচনা ক'রে নিজের মুখে নিজেই কালী মাগছ। তুমি আজ দূরে থেকে জড়-শক্তির পরিচয় পেয়ে এত মুগ্ধ হ'য়ে গেছ যে, নিজের ধর্মশাস্ত্রের উক্তিকে পর্যন্ত না মেনে “চৈতন্যের” ওপর “জড়ের” স্থান নির্দেশ ক'রছ বা চৈতন্যকে একেবারেই অস্বীকার ক'রছ—কিন্তু ঐ জড়-শক্তির আলোচনাকারী, জড়-শক্তির বহু-পরিচয়-আবিষ্কারকারী যারা, সেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতরাও এখন জড়ের ওপর চৈতন্যকে স্থান দিয়েছেন। আমাদের ধর্মশাস্ত্রে বলে যে—“ব্রহ্ম বা চৈতন্যের” অতি-রিক্ত পদার্থ এ পৃথিবীতে নেই; চতুর্দিকে যে সব “জড়-প্রকৃতি” দেখতে পাওয়া যায় সে সব অসীম “চৈতন্যের” সসীম আভাষ মাত্র”—পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিত ডেকার্টে ও বার্কলে এই মত সমর্থন করেন। এঁরা দার্শনিক ব'লে যদি এঁদের কথা ততদূর মনঃপুত না হয় তাহলে জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সার অলিভার লজ্জ ও সার উইলিয়ম ক্রক্সের কথার আলোচনা কর। এঁরা দুইজনে বৈজ্ঞানিক, জড়শক্তির আলোচনা ক'রে এবং তাতে সাফল্য লাভ ক'রে এঁদের দুইজনের জীবনের দীর্ঘকাল অতিবাহিত হ'য়েছে; এঁরাও ঈশ্বর ও হিন্দু-শাস্ত্রোত্তমোদিত পরলোকের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন, জড়ের ওপর চৈতন্যকে স্থান

দিচ্ছেন এবং তাঁদের এই যত প্রমাণিত করেছেন। হিন্দু-শাস্ত্রাঙ্ক
মোদিত পরলোক সম্বন্ধে মহাত্মা কনান্ডয়েন যে সমস্ত তথ্য বহু সাধনার
ও আলোচনার পর প্রকাশ ক'রেছেন সে সমস্ত পাঠ ক'রে মনে হয় যে,
কি বিরাট, কি প্রাচীন, কি সনাতন এই হিন্দুধর্ম; কত সত্য, কত
অশ্রান্ত, কত সুপ্রতিষ্ঠিত এই সব প্রাচীন হিন্দু ঋষিদের জ্ঞান ও যত
—‘ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা’ বহু সাধনার পর, শিক্ষারাজ্যে বহুদূর অগ্রসর
হবার পর, ‘যার কতকাংশ’ মাত্র জ্ঞানতে সক্ষম হয় এবং হিন্দু-ধর্ম অব-
গমন করবার পর, হিন্দুর আচার-ব্যবহারে জীবন যাপন করবার পর,
হিন্দুর শিক্ষা গ্রহণ করবার পর, তবে ‘যার সম্পূর্ণ-অংশ’জ্ঞানবার অধিকারী
হয় এবং জ্ঞানতেও সক্ষম হয়। বাপু হে কোনও জিনিষ পরীক্ষা ক'রে
না দেখে তার সম্বন্ধে এমন বিপরীত ধারণা ক'রে ব'স কেন? যারা
ব্রহ্মকে মানেনা বা তাঁর অস্তিত্ব স্বীকার করেনা তারা এ পর্যন্ত
কোনও প্রমাণ উপস্থিত ক'রে দেখিয়ে দিতে পেরেছে কি যে, ‘ঈশ্বর
নেই’! পাশ্চাত্য-শিক্ষায় শিক্ষিত অনেক এদেশীয় মহাত্মারই এইটে
হচ্ছে মহৎ দোষ যে, ‘জিনিষটা কি?’ সেটা পরীক্ষা ক'রে না দেখে, তার
সঙ্গে কোনও পরিচয় না ক'রে সেটার সম্বন্ধে স্বকপোলকল্পিত একটা
বিপরীত ধারণা ক'রে ব'সবে আর গাঁ গাঁ ক'রে চিৎকার করবে। এ
রকম করাতে কি অসত্যতার পরিচয় দেওয়া হয় না? এ ছাড়া—ওই
শ্রেণীর লোকেরা নিজেদের ধর্মের আর ধর্মগ্রন্থের এত গানি করে যে,
ভিন্ন-ধর্মাবলম্বী লোকে ততটা ক'রতে সাহস করে না।”

শরৎচন্দ্র বলিল—“পিতামহাশয়, যে সকল লোক আপনার বড়
সাধের হিন্দু-ধর্মের এবং ধর্মপুস্তকের গানি করেন তাঁরা ঠিক কাজই

ভুল-ভাঙ্গা

করেন, তাঁরা আমার ধন্যবাদের পাত্র । ‘যেমন হাঁড়ী তেমনি সরা’ যেমন আপনার হিন্দুধর্ম, তার ধর্মপুস্তকও তো তেমনি ।”

নবীনচাঁদ বলিলেন—“নিজেকে সভ্য ব’লে পরিচিত করবার চেষ্টা কর আর নিজের জাতীয়-জিনিসের অপমান কি ক’রে কর’ ? তোমরা এ রকম অসভ্যতার কাজ কর কিন্তু কই তোমাদের নবগুরু পাশ্চাত্য-পণ্ডিতরা (শুধু পণ্ডিতরা কেন, সাধারণ লোকেও তো) এ রকম করেন না । তাঁরা, তাঁদের জাতীয়-জিনিসের অপমান বা ঘানি কখনও তো করেন না-ই ; বরঞ্চ তাঁরা—ভিন্ন-জাতি আমরা, আমাদের প্রাচীন গ্রন্থ আলোচনা ক’রে সেই সকল গ্রন্থের সত্যতা, প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা আবিষ্কার ক’রে দেন । আর পূর্বোক্ত শ্রেণীর এদেশীয়রা স্ব-জাতীয় গ্রন্থের সত্যতা প্রমাণ করে দেওয়া দূরে থাক, সে সকলকে গাঁজাখুরী ব’লে উড়িয়ে দিয়ে—নিজেকে সভ্য ব’লে পরিচিত করবার বৃথা চেষ্টা ক’রে আর—আরও অসভ্য ব’লে জগতের কাছে পরিচিত হয় । আমাদের অগ্রাণু গ্রন্থ সম্বন্ধের কথা ছেড়ে দিয়ে কেবলমাত্র আমাদের ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মহা-পণ্ডিতের কি মত তার একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দি শোন । পৃথিবীর সর্ব গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ আমাদের ধর্মগ্রন্থ, মহাগ্রন্থ সাহিত্য-কাব্য-অলঙ্কার-দর্শন-বিজ্ঞান-রাজনীতি প্রভৃতির চরম বিকাশ-স্থল শ্রীগীতা পাঠ ক’রে জগৎবিখ্যাত জার্মান পণ্ডিত ডব্লিউ, হম্বোল্ডট (W. Humboldt) সাহেব বলেছেন যে—‘এই গীতা গ্রন্থে যে মহৎ ও উচ্চ ভাব আছে জগতের কোথাও তা নাই । এর চেয়ে মহৎ ও উচ্চভাব এ পৃথিবীতে এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি । ভারতবর্ষের এই পুস্তকখানি আমি প্রথমে যখন পাঠ করি তখন নিজেকে ধন্য মনে করে-

ভুল-ভাঙ্গা

ছিলুম এবং মনে, মনে ভেবেছিলুম যে, আমার অদৃষ্টে কি সুপ্রসন্ন যে এই পুস্তকখানি পাঠ করবার জন্য আমি আজও বেঁচে আছি।’ হায়, হায়, আমি ভুল—মহাভুল বুঝেছিলুম তাই এই সকল গ্রন্থ তোমায় না পড়িয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষা দিতে গেছিলুম। পূর্বে, সকলে যখন তোমার চাল-চলন সম্বন্ধে আমায় সাবধান ক’রতে গেছেন তখন আমি তাদের কারোর কথায় কণপাত করিনি। তারপর গত কয়েক মাস হতে তোমার বেঁচালো দৃষ্টি আকর্ষিত হওয়াতে আমি তোমার চাল-চলন লক্ষ্য করে যাচ্ছিলুম কিন্তু তুমি যে এতটা অধঃপাতে গেছ সেটা বুঝতে পারিনি। আজ তোমার স্বরূপ মূর্তি দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি। তুমি এ হয়েছ কি? তোমার দারা, ভবিষ্যতে আমাদের কতই না জাতীয় অনিষ্ট হবে।”

শরৎচন্দ্র বলিল—“বাবা, আপনি যে নেচে ওটবার মতন হ’য়েছেন। আমি হয়েছি—কি? আমাতে কি দেখতে পেলেন যাতে আপনার প্রাণে সহসা এই নর্তন-স্পৃহা জেগে উঠলো?”

নবীনচাঁদ মহা আক্ষেপসূচক স্বরে বলিলেন—“দোষ আমার, দোষ আমার—আমি সঙ্গদোষে আগে বুঝতে পারিনি তাই তোমার জীবন ভিন্ন প্রকারে গঠন ক’রতে চেষ্টা করেছিলুম—বাই হোক, দোষ আমার। কিন্তু আর নয়। এ শিক্ষা তোমায় আজ থেকেই পশ্চিভাগ্য ক’রতে হবে। আমাদের ভেতর এ শিক্ষাটা ব্যাপক-ভাবে বর্তমান সময় কিছুতেই থাপ খাবেনা। এটা আমাদের ভেতর কেবলই ভেঙ্গেছে এবং একমাত্র দাস ভিন্ন আর কিছুই গড়তে পারেনি। কার্যো, বাক্যে, মনে দাস ক’রে দিচ্ছে। যে দিক দিয়েই দেখ—এ শিক্ষায় অল্প-শিক্ষিত থেকে

ভুল-ভাঙ্গা।

আরম্ভ ক'রে আর অধিক-শিক্ষিত অবধি অধিকাংশকেই পরিণামে পরের হুকুম তামিল ক'রতে ক'রতে জীবন কাটাতে হয় যে দাস, পরের হুকুম তামিল ক'রতে, ক'রতে যার জীবন অতিবাহিত হয় সে নিজেরই কোনও উন্নতি বিধান করতে পারেনা। তা' স্বজাতীয়ের বা জগতের কি উন্নতি বিধান ক'রবে বল ? আর একটা জিনিস বিশেষ লক্ষ্য ক'রে দেখবার বিষয়—এই পাশ্চাত্য-শিক্ষায় শিক্ষিত হ'য়েই আমাদের দেশের সব জাতের লোক একবৃত্তি-অবলম্বী হয়েছে অর্থাৎ—দাসত্বকেই সার ক'রেছে—যে যার জাত-ব্যবসা পরিত্যাগ ক'রেছে। আর এই কারণেই আমাদের জাতটা অবনতির নিম্নতম স্তরে নেমে গেছে। এই মহা-অবনতির পথ রোধ করবার জন্তই আমাদের দূরদর্শী পূর্বপুরুষদের বিধানানুসারে আমাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি নামে বিভাগ হয়েছে। চারটে দল, জাতীয় উন্নতির চারটে দিক আশ্রয় ক'রে জাতীয়-উন্নতি বিধান ক'রত। এ নিয়ম এখন উঠে গেছে তাই এই দুর্দশাও উপস্থিত হয়েছে। এ নিয়মটা যদি থাকতো তাহলে কখনই এ রকম ভাবে সর্বশ্রেণীর লোকে, একমাত্র দাসত্ব আশ্রয় ক'রতনা। কি ভয়ানক অবস্থা একবার ভেবে দেখ দেখি—একটা বিরাট জাতের অধিকাংশ লোকই কলম পিষতে লেগে গেছে; আর জীবন-ধারণের জন্য বাকী সমস্ত প্রয়োজন সরবরাহ করবার জন্য দেশে আর লোক নেই—সকলেই জাত-ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে, আদা-জল খেয়ে কোমর বেঁধে, কলম নিয়ে—অন্য জাতের লাভের খাতার হিসাব রাখছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি শ্রেণী-বিভাগের নিয়ম যেদিন এদেশে ফিরে আসবে সেদিন থেকে এদেশের উন্নতিও আরম্ভ হবে। পরস্পরকে

ভুল-ভাঙ্গা

ঘণা ও নির্যাতন করবার জন্য এটার সৃষ্টি হয়নি—জাতীয়-উন্নতি সম্বন্ধীয় ব্যবসায়ী কার্য আপনা-আপনি বিভাগ করে নেবার জন্য, যোগ্য-লোকে সম্মানিত হবার জন্য এবং সর্ব রকমে জাতীয় উন্নতি হবেই-হবে বলে এর সৃষ্টি। তুমি দেখে নিও এই শ্রেণী-বিভাগের নিয়মটা আবার আমাদের দেশে ফিরে আসবে কিন্তু *Via Europe* এই পাশ্চাত্য-জাতিরাই এই নিয়মটা একটু রকম-ফের ক'রে সাদরে গ্রহণ ক'রে তাদের দেশে প্রচলিত ক'রবেই ক'রবে—কারণ, তাদের মতন উন্নতিশীল ও স্বদেশ-হিতৈষী জাতি এ রকম ভাল জিনিসকে কখনই উপেক্ষা ক'রবে না। তারপর, তাদের অনুকরণকারী-আমরা, আমাদের নিজস্ব জিনিসকে—‘সাহেবদের দেওয়া, ওহো সাহেব-দের দেওয়া বলে আনন্দ ক'রে গ্রহণ ক'রব। শরৎ, তোমাকে কাল থেকে আর কলেজে যেতে হবে না ; তুমি আমার ব্যবসা-বাণিজ্য দেখা শোনা কর। যে শিক্ষা পেয়ে লোকে পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনকে অমান্য করে ; যে শিক্ষা পেয়ে লোকে মাথার ঠিক রাখতে পারেনা—জাতীয়-বিশিষ্টতার অধিকাংশ জিনিস পরিত্যাগ করে ; যে শিক্ষা আমাদের ভেতর কেবল ভাঙতেই পারে ; যে শিক্ষা তোমার মতন জীব সৃষ্টি করে ; যে শিক্ষায় আমাদের সমাজ-শৃঙ্খলা রক্ষার পক্ষে বিপরীত সহায়তা পাওয়া যায় ; যে শিক্ষায় আমাদের ধর্মের কোনও অনুশাসন নেই ; যে শিক্ষায় আমাদের ধর্মমুখোদিত নীতি-শিক্ষা এবং আসল-শিক্ষা পরমার্থ বিষয়ে কোনও শিক্ষা নেই সেই *Godless* শিক্ষা পেয়ে কোনও লাভ নেই।”

শরৎচন্দ্র বিষয়ভরে চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিল—“সে কি বাবা,

ভুল-ভাঙ্গা

আপনি—এই মহা উন্নত ; বাণিজ্যে, বিজ্ঞানে গর্বিত পাশ্চাত্য-জাতির শিক্ষা আমাদের গ্রহণ করা উচিত নয় ব'লছেন ! যাঁা !! এ শিক্ষার কি কোনও মূল্য নেই ?”

নবীনচাঁদ বলিলেন—“আছে—যথেষ্ট মূল্য আছে । কিন্তু আমাদের পক্ষে বর্তমানে এর কোনও মূল্য নেই । আমাদের পক্ষে এ শিক্ষাটা বর্তমানে মহা অনিষ্টকারী । এদেশে এ শিক্ষা প্রবর্তনের পর যে ভাবে এটাকে দেশের ওপর প্রয়োগ করা হয়েছে তার ঠিক বিপরীত ভাবে প্রয়োগ ক'রে অধিকারী ভেদে বিতরণ ক'রলে পরে এ শিক্ষার সার্থকতা হোত', এ শিক্ষার মূল্যও নিকৃষিত হোত' । সকলকেই আগে ঘরের বিদ্যায় রীতিমত শিক্ষিত করে তারপর বাইরের বিদ্যে যদি দেওয়া হোত' এবং 'Second Language' কোনটা হওয়া উচিত'—এ বিবেচনাটা করা হোত' তাহলে আর আজকে তোমার মতন লোক সৃষ্টি হোতনা এবং এ শিক্ষার বাজার-দরও এত প'ড়ে যেতনা । এই মহা উন্নত পাশ্চাত্য-জাতির শিক্ষা আমাদের গ্রহণ করা উচিত কিন্তু আগে প্রাচ্য-বিদ্যায় অর্থাৎ নিজের দেশের, নিজের জাতের বিদ্যায় উত্তমরূপে শিক্ষা লাভ কু'রে, এবং শ্রেণী-বিভাগ অনুসারে নিজ, নিজ, জাতীয়-বৃত্তি অবলম্বন ক'রে সেই শিক্ষাটা সার্থক ক'রে, তারপরে । নচেৎ যে উপায়ই অবলম্বন করা যাকনা কেন কিছুতেই আসল-জাতীয়-উন্নতি হবে না । এই একাকার-ভাব ত্যাগ করাতেই হবে । তুমি দেখ নিও শরৎ—যে জাতি-ভেদ ভারতের পরাধীনতার কারণ ব'লে নির্দেশিত হয়েছে সেই জাতি-ভেদ থেকেই ভারতের মুক্তি হবে । আজ তো জাতি-ভেদ নেই রয়েছেই হয়, আজতো সকল জাতিই এক বৃত্তি অবলম্বন করেছে কিন্তু দেশ

তাহতে উন্নতির শিখরে উঠেছে না। অবনতির নিম্নতম স্তরে নেমে গেছে ? কিন্তু যদি কখনও সে শুভদিন উপস্থিত হয়, যদি প্রত্যেক ব্যক্তি—স্ব, স্ব জাতীয়-বিশিষ্টতা রক্ষা করে অর্থাৎ নিজ, নিজ জাতীয়-বৃত্তি অবলম্বন করে তাহলেই দেশের উন্নতি হবে—নচেৎ কোনও মতেই নয়।”

শরৎচন্দ্র বলিল—“বাবা এই জাতিভেদ, এই পরস্পরের, পরস্পরের প্রতি ঘৃণা ও নির্যাতন, এই থেকেই আমাদের দেশের অবনতি। এ থেকে কি ক’রে দেশের উন্নতি বা মুক্তি—”

নবীনচাঁদ বলিলেন—“পরস্পরের, পরস্পরের প্রতি ঘৃণা ও নির্যাতন করবার স্পৃহাটা নীতি-শিক্ষার ও স্বজাতি-পীতির অভাবে হ’য়েছে। যদি সমস্ত একাকার হ’য়ে যায় আর সেই সঙ্গে নীতি-শিক্ষার ও স্বজাতি-পীতির অভাব থাকে তাহলে কি কোনও মহা শক্তিমান পুরুষ কখনও কোনও কালে—এই পরস্পরের পরস্পরের প্রতি ঘৃণা ও নির্যাতনের স্পৃহাটা দূর ক’রে দিতে পারেন ? জাতি-ভেদ জিনিষটা সৃষ্টি হয়েছে দেশের সর্ব রকম উন্নতি সাধিত হবে ব’লে—এক জাতি, ভিন্ন জাতিকে ঘৃণা ও নির্যাতন ক’রবে বলে নয়। কে কোন জাতি, সেটা টের পাওয়া যায় তার জাতীয়-বৃত্তি দেখে। তাঁত ধোনে ব’লে তাঁতি—তাঁতি হ’য়েছে। কাপড় কাচে ব’লে ধোপা—ধোপা হ’য়েছে। গৃহ-নিৰ্ম্মানের ও নিত্য-প্রয়োজনীয় অনেকবস্তু প্রস্তুত ক’রে ব’লে ছুতোর—ছুতোর হ’য়েছে। লাঠি খেলে ব’লে, প্রহরীর কাজ করে ব’লে বাগদী—বাগদী হ’য়েছে। দেশ রক্ষা ক’রে বলে, যুদ্ধ ক’রে বলে ক্ষত্রিয়—ক্ষত্রিয় হ’য়েছে। হিসাব নিকাশ রাখে ব’লে কারক—কারক হ’য়েছে।

ভুল-ভাগ্য

দেশের বাণিজ্য রক্ষা করে ব'লে বৈশ্ব—বৈশ্ব হ'য়েছে। লেখাপড়া শেখে, ধর্মচর্চা করে ; শিক্ষার্থীকে লেখাপড়া শেখায়, অশক্ত ও স্বৈচ্ছায়-অশক্তকে ধর্মচর্চা করায় ব'লে ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ হ'য়েছে। এই যে পরম্পর 'হওয়া-হোয়ি' এটার আলাদা কিছু হাত, পা কখনও ছিল না, এখনও নেই। তারপর সুবিধাবাদী ও স্বার্থবাদী মানুষ, বরাবর প্রত্যেক জিনিসেরই যেমন বিকৃত অর্থ ক'রে নিয়ে সেটার অপ-প্রয়োগ করে—এটার বেলাও তাই ক'রেছে। এটাতো একটা সমাজিক বিধান ; কত বড় বড় ধর্মের পর্যন্ত ঐভাবে বিকৃত অর্থ ও অপ-প্রয়োগ হ'য়ে আসছে। আমাদের এখন উচিত এই জিনিসটাকে বিকৃততার কবল থেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে, সংস্কৃত ভাবে দেশের ওপর প্রয়োগ করা। আর দেশবাসী সকলকে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত, যে—এই ব্রাহ্মণ, কৃত্রিয়, বৈশ্ব, তত্ত্ববায়, সূত্রধর প্রভৃতির মধ্যে কেউ বড় নেই, কেউ ছোট নেই—এরা সবাই সমান। জাতীয়-উন্নতির জন্তে এদের প্রত্যেকেরই প্রয়োজন। তবে প্রতিভার সম্মান আছেই—যে, যার নিজ নিজ বিভাগে উন্নতি লাভ ক'রবে সে সেই বিভাগের অন্ততম শ্রেষ্ঠ লোক ব'লে সম্মান পাবে।”

শরৎচন্দ্র বলিল—“কেন এখন বাইরের শিক্ষা আমাদের ত্যাগ করা উচিত তাতো বললেন এবং সেটা ত্যাগ ক'রে ঐ শ্রেণী-বিভাগ ক'রলে দেশের উন্নতি হবে তাতো বললেন। এখন আমার জিজ্ঞাস্ত এই যে, এতই যদি বুঝেছেন তাহলে আমাকে এ শিক্ষা গ্রহণ করিয়েছিলেন কেন?”

নবীনচাঁদ বলিলেন—“সংস্কারের বশে আর সঙ্গদোষে। দেখ প্রথম

ভুল-ভাঙ্গা

যখন এ শিক্ষাটা এদেশে আসে তখন নিজেদের অসভ্য জ্ঞান ক'রে সভ্য হবার জন্তে এবং এটা অর্থকরী-বিজ্ঞা ব'লে অনেকে সাদরে এটা গ্রহণ করে। প্রথমে এ শিক্ষাটা এর বাহ্যিক চাকচিক্যে আমাদের অনেক দেশবাসীর মনে এমন চমক লাগিয়ে দিলে যে—তারা, বাঙ্গালীর ছেলের স্বদেশ-জাত বস্ত্র পরার ও স্বদেশীয় ক্রীড়া করার প্রথার ওপর পর্যন্ত দোষ ও অসভ্যতা দেখলেন। অনেক দেশবাসী দেশী ভাষা চর্চার প্রথাতে অসভ্যতা দেখে তার চর্চায় এমন ভাবে বিরত হলেন যে—বিদেশী লোক তাই দেখে দয়ার্জ চিন্তা হ'য়ে নোটিশ বার ক'রে আমাদের এ বিষয়ে সাবধান করিয়ে দিয়ে, আমাদের দেশী-ভাষার চর্চার উপদেশ আমাদেরই দিলে। তখনও আমাদের জ্ঞান হয়নি। তারপরেও লোকে, এ শিক্ষাটা নিজে গ্রহণ ক'রত ও আত্মীয় স্বজনকে গ্রহণ করাতো কারণ এটা অর্থকরী বিজ্ঞা ছিল এবং এটা গ্রহণ করা বিষম সংস্কারের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছল'। আমিও ঐ সংস্কারের বশে এবং আমার কয়েকটি বন্ধুর সহ-দোষে তোমায় ঘরের বিজ্ঞায় শিক্ষিত না ক'রে বাইরের বিজ্ঞায় শিক্ষিত ক'রতে গেছলুম। আমরা, অনেক প্রাচীন লোকে এ কার্যে নিরন্ত হবার জন্তে অত্বরোধ করেছিলেন, আমি কিন্তু তাঁদের কথায় কর্ণপাত করিনি। আমি তখন মনে ভাবলুম যে—'এইতো আমি নিজে পাশ্চাত্য শিক্ষা কিছু, কিছু পেয়েছি কিন্তু কই আমারতো মাথা বিগড়ে যায়নি।' আমি এই ভেবে তোমায় এ কার্যে প্রবৃত্ত ক'রিয়েছিলুম। কিন্তু তখন আমার ভাবা উচিত ছিল যে, আমি পাশ্চাত্য শিক্ষা পেয়েছি বটে কিন্তু সর্বোপরি আমার প্রাচ্য-বিজ্ঞা লাভ হয়েছিল। আমি পরিণত বয়সে অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত

ভুল-ভাঙ্গা

মহাজনের গ্রন্থ পড়েছি বটে কিন্তু তার আগে প্রাচ্য-শিক্ষায় উত্তমরূপে শিক্ষিত হ'য়ে স্বধর্ম ও স্বজাতীয় আচার-ব্যবহারে আমার একটা সংস্কার দাঁড়িয়ে গেছিল তাই আমার বেশী অনিষ্ট হয়নি। আমার প্রথম পরীক্ষা স্তম্ভুর মাতৃ-ভাবায় উচ্চারিত হয়েছিল ; পরকালের পথে উন্নতি লাভ ক'রব ব'লে, পর-ধর্মকে ভয়াবহ জ্ঞান ক'রে স্বধর্ম আস্থাবান হব ব'লে প্রথমে স্ব-ধর্মের নীতি আমার কণ্ঠস্থ হয়েছিল তার পরে আমি ভিন্ন-ধর্মের আচার, ব্যবহার রীতি নীতি কিরূপ, সেটা পাঠ ক'রেছিলুম। তাই আমার ঈষ্ট ভিন্ন অনিষ্ট হয় নি। এই শিক্ষা আমরা গ্রহণ করব, সাদরে গ্রহণ ক'রব কিন্তু তার আগে আমাদের উচিত—সমগ্রজাতকে বর্তমান যুগোপযোগী ক'রে কয়েকটা শ্রেণীতে বিভাগ ক'রে দেওয়া আর সর্বোপযোগী প্রাচ্য-বিদ্যায় শিক্ষিত করা। স্ব, স্ব বৃত্তি অনুযায়ী শ্রেণী বিভাগ ক'রে দিলে এক শ্রেণী ধর্ম ও বিদ্যা শিক্ষা দেবে ও তাইতে 'নিজেরা' শিক্ষিত হবে এক শ্রেণী মল্ল বিদ্যা শিক্ষা ক'রবে, সমগ্র জাতির স্বাস্থ্য ও সবলতা বিধানের দিকে দৃষ্টি রাখবে (তাহলেই বাদ্গাল দেশে, বাদ্গালীর ধন, প্রাণ, ইচ্ছা রক্ষার জন্য পশ্চিমে-দরোয়ান রাখতে হবেনা ; গুণ্ড ও পাঠানের লাঠি খেয়ে বিনা প্রতিশোধে ঘরের কোণে গিয়ে আঘাত-প্রাপ্ত স্থানে তেল মালিস ক'রতে হবেনা, দুর্ভিক্ষ লোকে রমণীদের আক্রমণ ক'রলে—'দাঁড়া ও ব্যাটা লাঠি আনচি'—ব'লে পালাতে হবেনা এবং এত চটপট পিলে ও ফাটবেনা) ; এক শ্রেণী লুপ্ত শিল্প রক্ষা ও শিল্পোন্নতির ভার নেবে ও অধিকারী ভেদে শিক্ষা দেবে ; এক শ্রেণী বাণিজ্য—জাতির উন্নতির প্রধান উপায় বাণিজ্য ব্যাপারে নিযুক্ত হবে ; এক শ্রেণী হিসাব, কিতাব, নকল-করা প্রভৃতির বৃত্তি গ্রহণ ক'রবে ;

ভুল-ভাষা

এক শ্রেণী শ্রম-জীবির বৃত্তিতে নিযুক্ত হবে ; এক শ্রেণী কৃষি-কার্যের বৃত্তি অবলম্বন ক'রবে ইত্যাদি, ইত্যাদি । এবং সকল শ্রেণীর লোকই পল্লী-সংস্কার, কৃষি ও বাণিজ্য ব্যাপারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সংযুক্ত থেকে এগুলির উন্নতির জন্য প্রাণপণ সহায়তা ও চেষ্টা ক'রবে । আমাদের সকলেরই পল্লীগ্রামে একটা আশ্রয় এবং কৃষিকার্যের জন্য কতকটা জমি রাখতেই হবে । তাহলেই কৃষি-কার্যের উন্নতি, নিজে তার ফলভোগ এবং অপরকে বাড়তি ফলভোগ করান হবে । অর্থাৎ সমগ্র জাতিটারই তাহলে কতকাংশে বাণিজ্য ব্যাপারে নিযুক্ত হওয়া হবে এবং সমগ্র জাতিটা অভিজ্ঞানহীন খাটী আহাৰ্য পেয়ে দৈহিক, মানসিক, নকল রকমেই উন্নতি লাভ করবে ; অকাল-মৃত্যু ও চির-রুগ্ন হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাবে । যদি কখনও এই শুভদিন উপস্থিত হয়, যদি এই বিশাল জাতিটা এই রকমভাবে কয়েকটা শ্রেণীতে বিভক্ত হ'য়ে জাতীয় উন্নতির প্রধান কটা দিক অবলম্বন ক'রে স্ব, স্ব বৃত্তি অনুসারে কাজ ক'রে তাহলে অতীতের সেই মহা-উন্নত ও গৌরবান্বিত জাতি ব'লে ভগতের সম্মুখে সগৰ্ব্ব দাঁড়াতে এদের এক চতুর্থাংশ-শতাব্দী সময় লাগেনা । এই রকম ভাবে বিভক্ত হ'য়ে, স্বদেশের শিক্ষা লাভ ক'রে, স্বদেশের শিল্প-বাণিজ্য-কৃষি সম্বন্ধে শিক্ষা উত্তমরূপে লাভ ক'রে আরও জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য, আরও উন্নতি লাভ করবার জন্য যদি প্রয়োজন হয়ত' সাগরপারে গিয়ে বিদেশের শিক্ষা গ্রহণ ক'রবে । এই বিশাল পৃথিবীতে নানা উন্নত জাতি রয়েছে, সব জাতিই সব কার্যে পারদর্শী ও উন্নত নয় । আমাদের দেশবাসীরা আগে নিজের দেশের বিজ্ঞায় শিক্ষিত হ'য়ে, নিজের ঘরের জিনিস ব'লে

ভুল-ভাঙ্গা

নিম্নে হ্রস্বত' দেখলে যে, 'ইংলণ্ড বাণিজ্য ব্যাপারে খুব উন্নত', তখন যাদের উপর বাণিজ্যের বৃত্তির ভার আছে তারা ঐ বিজ্ঞা শিক্ষার জন্ত কতকগুলি যোগ্য লোককে ইংলণ্ডে পাঠাবে। যদি দেখলে যে 'শিল্প প্রস্তুত বিষয়ে জার্মানী খুব উন্নত'; 'মল্ল ও কৃষি বিজ্ঞায় আমেরিকা খুব উন্নত', তখন আমাদের দেশের ঐ সকল বৃত্তি-অবলম্বীরা তাদের ভিতর যোগ্য লোকদের ঐ সকল দেশে, ঐ সকল উন্নত-প্রণালী আয়ত্ত করবার জন্ত পাঠিয়ে দেবে। (তাব'লে, বিলাসিতা ও মত্তপানে প্যারিস-বাসী খুব উন্নত ও পারদর্শী ব'লে অবশ্য সে বিজ্ঞাটা আয়ত্ত করবার জন্ত কোনও শিক্ষার্থী পাঠাতে হবেনা) এই রকম ক'রে নানাজাতির বিজ্ঞা আয়ত্ত হবে এবং নানাজাতির পরস্পরের মধ্যে ভাবে আদান প্রদানও হবে। কিন্তু এখন যে ভাবে হচ্ছে—অর্থাৎ নিজের দেশের শিল্প, বাণিজ্য, বৃত্তি ও সর্ব বিজ্ঞাকে ধ্বংসের পথে চালিয়ে দিয়ে পরের বিজ্ঞাকে লোকে আয়ত্ত ক'রতে যাচ্ছে, তাতে অবশ্য ভিন্ন জাতির সঙ্গে ভাবের আদান প্রদান হচ্ছে বটে কিন্তু নিজের জাতটা ধ্বংসের পথে নেমে যাচ্ছে এবং এই আদান প্রদানের ভাবটাও উভয় পক্ষে সমান হচ্ছেনা—একপক্ষে ভিত্তিমূলক ভাব অন্যপক্ষে দানে-পরাজুখ গর্বিত ধনীর ভাব দাঁড়াচ্ছে। এই যে, যাদের শিক্ষা তোমরা গ্রহণ ক'রছ তারা কি তাদের দেশের ও জাতির মুক্তির জন্ত তাদের স্বদেশীয় বিজ্ঞা চর্চা বন্ধ ক'রে দিয়ে বিদেশের বিজ্ঞা শিক্ষা ক'রছে? তাদের শিক্ষা তোমরা কি রকম ভাবে গ্রহণ ক'রছ? তারা যা ক'রছে তোমরা তা ক'রছ কোথায়? এই রকম বিকৃতভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ ক'রেছে বলেই আজ সে শিক্ষাটা এই রকম বিকৃত ফল দিয়েছে। যদি ষথার্থই তাদের শিক্ষা গ্রহণ ক'রতে

তাহলে সেই দণ্ডেই সে শিক্ষা গ্রহণ করা একেবারে ত্যাগ ক'রতে। এখনও এ অজ্ঞানতা, এ মোহ কেন—অনেক দিন তো হয়ে গেল। অর্থকরী? এটা শিখলে চট ক'রে অর্থ হয়? কই? এর সে অর্থকরী প্রভাবই বা কোথায়? আত্ম-বাকীর রোশনাই বেশীক্ষণ থাকেনা, শিশিরের জল অতি ক্ষণস্থায়ী। মাষ্টার-অফ-আর্ট পঞ্চাশ টাকা মাইনের জন্তে ছুটোছুটি ক'রে অর্ধেক জীবন-শক্তি নষ্ট ক'রে ফেলছে। যে ভুলে, আমরা চলচি সে ভুল ভাঙে, ভাঙে, এখনই ভাঙে—নইলে গেল, গেল সব গেল।

নবীনচাঁদ এতক্ষণ বকিয়া গেলেন বটে কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইলনা। তাহা শরতের এক কান দিয়া ঢুকিয়া অন্য কান দিয়া বাহির হইয়া গেল। শরৎচন্দ্র, পিতার কথাগুলি শুনিতেছিল আর মনে মনে ভাবিতেছিল যে—আজ আচ্ছা এক মুকিলে পড়লুম দেখছি। এ বুড়োর বকুনি যে আর থামেনা দেখছি। আচ্ছা, তুমি বোকে মরগে; আমার কলাটা। আমি তোমার কথাও শুনছিনা আর সেই মত কাজও ক'রছিনা। আমি এত পরিশ্রম ক'রে, এত কাল ধরে যা সভ্যতা-সম্বন্ধ আচার, ব্যবহার শিখলুম সেটা কি তোমার মতন অসভ্য ও নির্বোধের কথায় ত্যাগ ক'রব মনে করেছে? কখনই নয়, কখনই নয়। বরং তোমার মত বুদ্ধ-নির্বোধ যা উপদেশ দেয় ঠিক তার উলটো করা উচিত। শরৎচন্দ্র এই প্রকার চিন্তা করিতে লাগিল; তাহার পিতার বক্তব্যের শেষের দিকটা সে একেবারেই শুনিল না। নবীনচাঁদ যখন বক্তব্য শেষ করিয়া নীরব হইলেন তখন শরৎচন্দ্রও নীরব হইয়া বসিয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সে ভাবিল যে—আমি যদি এ সময় কিছু না ব'লে চুপ

ভুল-ভাড়া

ক'রে থাকি তাহলে বাবা নিশ্চয়ই ভাববে যে, আমি তার কথাগুলো শুনি নি—নাঃ এখন বুড়োকে চটান' হবেনা। এইরূপ চিন্তা করিয়া সে যে, পূজনীয় পিতার কথা শ্রবোধ বালকের গায় মন দিয়া শুনিতেছিল, তাহার প্রমাণ দিবার জন্য তাড়াতাড়ি বলিল—“আচ্ছা বাবা, আপনি যে ব'ললেন—‘পাশ্চাত্য-শিক্ষায়-শিক্ষিতরা তাদের বাপ,মার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধাহীন হ'য়ে পড়ে ; বাপ,মার কোনও কথা শোনে না’—আপনার এটা ভুল ধারণা, মহা ভুল ধারণা। এই দেখুন না কেন—আমি না হয় অশিক্ষিতা আর অগঠিত-চরিত্রা ব'লে মার কথা শুনি না ; আমি কিন্তু আপনার কথাতো সবই শুনি।”

নবীনচাঁদ বলিলেন—“বাপুহে, তুমি আমার দু'একটা কথা যা শোন সেটা কি আমায় ভক্তি-শ্রদ্ধা কর ব'লে—না—আমার সম্পত্তির লোভে ? আমি যদি ধনী না হতুম, আমি যদি তোমার গরীব-বাপ হ'তুম তাহলে তুমি, আমায় ভক্তি-শ্রদ্ধা করা দূরে থাক—লোকের কাছে আমায় বাপ ক'লে পরিচয় দিতেনা—হয়ত বাপ বলে স্বীকারই ক'রতেনা। এ নেহাৎ এত বড় একটা সম্পত্তির লোভ রয়েছে তাই নিক্রপায় হ'য়ে, অগত্যা বাপ ব'লে স্বীকার কর বা পরিচয় দাও। তোমরাত বাপকে ভক্তি কর না বা ভালবাস না ; বাপের সম্পত্তিকেই ভালবাস আর ভক্তি কর। বাপ বেঁচে থাকতে থাকতেই, সে মরে গেলে, তার সম্পত্তি উড়িয়ে কি রকম ক্ষুণ্ণ ক'রবে তার ফর্দ কর। ব্যবসা-কার্যে-অনভিজ্ঞ ধনী ব্যবসায়ী তার অভিজ্ঞ ও রোজগারী কর্মচারীকে যেমন ভালবাসে,তোমরা বাপকে ঠিক তেমনি ভালবাস। আমরা সেকেলে অসভ্য লোকেরা কিন্তু নিজের প্রাণকে যেমন ভালবাসি আমাদের বাপকে ঠিক তেমনি ভালবাসতুম—

ইষ্টদেবতাকে যেমন ভক্তি করি বাপকে ঠিক তেমনি ভক্তি ক'রতুম—

আর, এক বিন্দুও অতিরিক্ত নয়, বাপকে যথার্থই মনে করতুম যে :—

পিতাঃ স্বর্গ, পিতাঃ ধর্ম, পিতাহি পরমহুতপঃ ।

পিতরিঃ প্রীতিমাগ্নে প্রীয়ন্তে সৰ্ব্ব দেবতাঃ ॥

—

অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

নবীনচাঁদ সাধাসিধা ও সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। যৌবনে অর্থোপার্জনের জন্য অনেক বিলাতী সাহেব-স্বা ও এদেশী আধা-সাহেবের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন কিন্তু কখনও জীবন-যাপন-প্রণালী পরিবর্তন করেন নাই এবং স্বদেশেও আস্থা-হীন চন নাই। তাঁহার এই অসম্ভব রকম উন্নতির মূল যে ঈশ্বরের দয়া, এ কথা তিনি মনে, মনে একান্তভাবে বিশ্বাস করিতেন এবং সদা, সর্বদা সর্বজন সমক্ষে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া পরম দয়াবান শ্রীহরির মহিমা কীর্তন করিতেন।

পুত্র শিক্ষিত হইবে, তিন চারিটি পাস করিবে, তাহার খুব সুনাম হইবে এই সরল বিশ্বাসে তিনি পুত্রকে শিক্ষিত করিতেছিলেন। তিনি স্বয়ং কখনও কলেজে পড়েন নাই বা কালেজীয় বিদ্যাদান-পদ্ধতির সহিত তাঁহার পরিচয়ও ছিলনা; এইজন্য এবং পুত্রের শিক্ষা-কার্য যাহাতে নির্দোষরূপে ও ত্রুটিশূন্য হইয়া সম্পন্ন হয় সেজন্য তিনি বহু অর্থব্যয় করিতেন। উক্ত কার্য সূচাকরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য একজন বিলাত-ফেরৎ শিক্ষকও রাখিয়া দিয়াছিলেন, এ কথা আপনারা অবগত আছেন।

নবীনচাঁদ, পুত্রকে একজন আদর্শ ব্যক্তি করিবার মানস করিয়াছিলেন; একণে কিন্তু তাহার ভাব, ভঙ্গী দেখিয়া তাঁহার স্ব-স্বপ্ন ছুটিয়া গেল। তিনি পুত্রের তবিশ্রু চিন্তা করিয়া মহা ভীত

হইয়া পড়িলেন। যাহার বাহ্যিক চাকচিক্য দেখিয়া তাঁহার মন-প্রাণ আকুল হইয়াছিল, তাহার ভিতরের ভয়াবহ অবস্থা দেখিয়া তিনি চক্ষে সরিষা-ফুল দেখিতে লাগিলেন ; তাঁহার স্থির, মোহিত মন এক্ষণে লোভিত সাগরের মত চঞ্চল ও তরঙ্গসঙ্কুল হইয়া উঠিল। নানা চিন্তার তরঙ্গের আঘাতে অস্থির হইয়া তিনি, প্রিয়বন্ধু ও ম্যানেজার গোবিন্দ বাবুর সাহিত অনেক পরামর্শ করিয়া অবশেষে স্থির করিলেন যে—“আজ হইতেই শরৎকে কলেজ ছাড়াইয়া দিবেন এবং তাহার বিলাত ফেরৎ গৃহ-শিক্ষক ও বিদায় প্রাপ্ত হইবে। গোবিন্দবাবু স্বয়ং প্রতিদিন শরৎকে সঙ্গে করিয়া নবীনটানের ব্যাসার কার্যালয়ে লইয়া গিয়া, ব্যবসাসংক্রান্ত কার্যাবলী শিক্ষা দিবেন।” নবীনটান স্বয়ং, এবার হইতে পুত্রকে নানারূপ বাঙ্গালা ও সংস্কৃত-বহির বাঙ্গালা-অনুবাদ পুস্তক পড়াইবেন। আর—অতি শীঘ্র একটি স্নানঘর ও সঙ্কলিত পাত্রী ঠিক করিয়া শরৎচন্দ্রের বিবাহ দেওয়া হইবে। তাহা হইলে শরতের সংসারের প্রতি টান হইবে এবং সেই নববধূ—তাঁহাদের শিক্ষামত—শরতের কান ধরিয়া ওঠ-বোস করাইবে ও তাহার ব্যাধি আরাম করিয়া দিবে—অর্থাৎ পিতা প্রভৃতি গুরুজনের দ্বারা যে কার্য হইল না, ঐ নবাগত ভাবী-বধূ স্বয়ং রূপ ঘোবনের প্রভাবে (on behalf of গুরুজন) সেই কার্যসিদ্ধি করিয়া দিবে, শরৎকে টিটু বানাইয়া দিবে।

স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার ভার নিজহস্তে গ্রহণ করিয়া নবীনটান এই সব নতলব ঠিক করিলেন। কিন্তু ইহা কতদূর কার্যে পরিণত

ভুল-ভাঙ্গা

হইবে তাহা তখন বুঝিতে পারিলেন না। তিনি মনে, মনে, ভাবিলেন যে—“না বুঝিতে পেরে যে ভুল ক’রেছি তার সংশোধন আমি নিজেই ক’রব। সক্ষম হবনা? নিশ্চয়ই হব। চারদিক দেখে যে রকম বুঝছি তাতে বেশ বুঝিতে পারছি যে, আমাদের জাতের মধ্যে অনেক লোক ঠিক যেন ছানার তাল। এদের যখন যে ছাঁচে দেবে এরা তখন ঠিক সেই ছাঁচের আকার ধারণ ক’রবে। শরৎকে বিদেশী সভ্যতার ছাঁচে দিতেই সে সেই আকার ধরেছে। তাকে আবার যদি কোনও রকমে আমাদের দেশীয় সভ্যতার ছাঁচে দিতে পারি তাহলে সে নিশ্চয়ই তার আকার ধরবে। আমাকে একটু কড়া হ’তে হবে—নতলে যে সব যায়।” এই রকম চিন্তার পর তিনি শরৎকে কলেজ ছাড়াইয়া দিলেন এবং শরতের গৃহ-শিক্ষক যখন সেদিন অপরাহ্নে পড়াইতে আসিল তখন তাঁহাকে নিজের ঘরে ডাকিয়া বলিলেন যে—“আমি ভুল বুঝে যে আশা ক’রে শরৎকে আপনার হাতে দিইয়াছিলাম তার ঠিক উলটো ফল পেয়েছি। আজ থেকে আপনি বিদায় নিন। এয়ার আমি নিজেই শরৎকে আমাদের ধাত-সত্তা-বিক্ষেপ শিক্ষা দোব।” এই কথা বলিয়া তিনি, গৃহ-শিক্ষক মহাশয়ের প্রাপ্য এক মাসের বেতন এবং হঠাৎ বিদায় দিলেন বলিয়া আরও এক মাসের বেতন মোট পাঁচ শত টাকা প্রদান করিলেন।

বিলাত ফেরৎ গৃহ-শিক্ষক মহাশয় একেবারে বিদায় প্রাপ্ত হইয়া শরতের বৈটকখানায় আসিয়া শরতের নিকট হইতে বিদায় লইয়া, বলিলেন—“শরৎ তোমার বাবার অবিচারে আমার বিদেয় নিতে হচ্ছে। তোমায়

ছেড়ে যেতে আমার বড় কষ্ট হচ্ছে। এখন কিছুদিন আর তোমার দেখতে পাবনা। তবে তোমার বাবার ভাল-মন্দ কিছু হ'লে আমায় খবর দিও—আমি সে সময় তাহলে এখানে আসতে পারব। তখন আর কোনও বাধা থাকবেনা। Dont think it otherwise আমার এ কথা বলবার মানে এই যে, তোমার বাবার মৃত্যুর পর আমাকে খবর দিলে, আমি আমার কর্তব্য কার্য সম্পাদন ক'রতে পারব—তঁার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ ও অন্তিম প্রার্থনা ক'রতে পারব।

শরৎকুমার বলিল—“হ্যাঁ নিশ্চয়ই খবর দোব। আপনি খুব উদার লোক দেখছি। বাবা আপনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার ক'রলেন তবুও আপনি তাঁর ওপর শত্রুতা ভাব পোষণ না করে, তাঁর অন্তিম সময়ের অন্তে এরই মধ্যে থেকে শোকান্তি হচ্ছেন।”

গৃহ শিক্ষক মহাশয় বলিলেন—“যাই হোক শরৎ তোমার সংবাদ আমার মধ্যে, মধ্যে নিশ্চয়ই জানিও। তোমার আমি বড়ই ভালবাসি। তোমার কুশল সংবাদ যদি মধ্যে, মধ্যে না পাই তাহলে আমার মনে বড়ই কষ্ট হবে। হয়ত আমি একটা কদিন পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে প'ড়ব; এমন কি হয়ত ম'রাই যাব।” এই কথা বলিয়া চক্ষে ক্রমাল দিয়া শিক্ষক মহাশয় বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু ঘরের দরজা অর্ধাধি গিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—“দেখো শরৎ যদি তোমার কোনও কুশল সংবাদ না পাই তাহলে মনের কষ্টে আমি নিশ্চয়ই মাথা যাব। দেখো শরৎ তোমার কুশল সংবাদ দিতে ভুলে গিয়ে আমার মেয়ে

ভুল-ভাল

ফেলনা—আমার মেমসাহেবকে আর মিসি-বাবাদের অনাথ ক’রনা।”

এই কথা বলিয়া শিক্ষক মহাশয় চলিয়া যাইতেছিলেন, তাঁহাকে ডাকিয়া শরৎ বলিল—“আজ মনটা বড় খারাপ রয়েছে ; মনে করছিলুম যে একবার মাঠের দিকে ঘুরে আসা যাক আর কোনও কাফেতে গিয়ে কিছু খেয়ে আসা যাক। তা আপনি তো একদিন খাওয়াবেন বলে অনেক দিন থেকে Promise ক’রে রেখেছিলেন। আজ তো আপনার কাছে অনেক টাকাও র’য়েছে। আপনার পূর্ব প্রতিজ্ঞামত আজ একটা দিনার খাইয়ে দিন না।”

শিক্ষক মহাশয় বলিলেন—“তার জন্তে আর কি, এতটা ঘরের কথা যদিদিন হোক খাওয়ালেই হ’ল। তা এবারটা থাক, এই আসছে মাস কাবারে মাইনে পেয়েই তোমার ডিনার খাইয়ে আনব। Now ta ta, ta ta” এই কথা বলিয়া আর এক সেকেণ্ডও প্রতীক্ষা না করিয়া শিক্ষক মহাশয় সবেগে প্রস্থান করিলেন।

“এবারটা থাক, এই আসছে মাস কাবারে মাইনে পেয়েই তোমার ডিনার খাইয়ে আনব—” এই কথাটির একটি মজার ইতিহাস আছে। শরৎচন্দ্রকে ব্যবহারিক-শিক্ষা দিবার নাম করিয়া শিক্ষক মহাশয় প্রায়ই মধ্যাহ্নে বাহির হইতেন এবং মধ্যে মধ্যে জু-গার্ডেন, মিউজিয়ম, ইম-পিরিয়ল লাইব্রেরী প্রভৃতিতে লইয়া গিয়া খানিকটা এদিক-ওদিক বেড়াইয়া আসিতেন। বেশীর ভাগ কিন্তু ঐ সকল স্থানে না গিয়া

শিক্ষক ও ছাত্র চৌরঙ্গীর হোটেলে, চুকিয়া পড়িতেন এবং মনের সাথে কোনওদিন টকিন। কোনও দিন বা লঞ্চ খাইতেন। শরৎচন্দ্র কিন্তু ডিনার খাইবার জন্ত বড় আগ্রহ প্রকাশ করিত। কারণ ব্যবহারিক শিক্ষা কিছু রাতে দেওয়া হইবে না, এইজন্ত সন্ধ্যার মধ্যেই ইহাদের বাড়ী ফিরিতে হইত সুতরাং ডিনার খাইবার অবসর পাইত না, তাই ডিনার খাওয়ার প্রতি শরতের একটা প্রবল বোঁক ছিল।

ইহারা প্রথম যখন হোটেলে খাইতে আরম্ভ করে তাহার দুই, তিনবার-খাওয়ার পর, চতুর্থবার যখন একদিন ইহারা হোটেলে লঞ্চ খাইতে বসিয়াছে; সেই সময় শিক্ষক মহাশয় মনের সাথে মাংস চর্ষণ করিতে, করিতে বলিলেন যে—“শরৎ তুমি আমায় প্রায়ই হোটেলে খাওয়াচ্চ, আমায়ত’ একদিন তার return দেওয়া উচিত। তা এই আসচে মাস কাবারে মাইনে পেরেই তোমায় একদিন ডিনার খাইয়ে আনব।” শরতের স্বন্ধে ভর করিয়া শিক্ষক মহাশয় প্রায়ই হোটেলে খাইতেন অথচ নিজে খরচ করিয়া শরৎকে একদিনও খাওয়াইতেন না—এটা সভ্য-সমাজের মধ্যে বড়ই অসভ্যতার কথা। তাই এই ‘লজ্জা-বারণ কারণ’ প্রত্যেকবার খাইবার সময় ইনি এইরূপ বলিতেন আমি মাস-কাবারে মাইনা পাইলেই একথা ভুলিয়া যাইতেন। যদি বা কোনও মাসে শরৎ এই কথা মনে করাইয়া দিত তাহা ততলে তিনি দ্বিবি সপ্রতিভ ভাবে বলিতেন যে—“এবারটা থাক—এই আসচে মাসকাবারে তোমায় নিশ্চয়ই খাইয়ে আনব।”

ভুল-ভাগ্য

একবার মাস কাবারের সময় পুনরায় এই কথা বলাতে শরৎ বলিল যে —“আপনার আর হোটেল খাইয়ে কাজ নেই। আপনি বরং একদিন আপনার বাড়ীতে আমার নিরে গিয়ে খাইয়ে দিন।”

বাড়ীতে যাইবার নাম শুনিয়া শিক্ষক মহাশয় বিশেষ ভয় পাইয়া ছিলেন। কারণ তিন দিবসাত্ত তাঁহার যে মেমসাহেবের রূপের বড়াই করিতেন এবং অপূর্ণ পতিভক্তির ব্যাখ্যা করিতেন সে মেমসাহেবের এত কালো যে, অন্তের কথা দূরে থাক—তাঁহার একান্ত প্রেমভরত ও ভক্ত স্বামী এই শিক্ষক মহাশয়ের চক্ষুও তাহা “অত্যন্ত কালো” বলিয়া শেষ হইত। আর তাঁহার পতিভক্তির কথা বোধ হয় এই অবদ বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ইনি রাত্রে মধ্যে যখন উগ্রচণ্ডা মৃত্তী ধারণ করিয়া, চেয়ার লইয়া স্বামীর নারকে ভাড়া করিতেন তখন ভাগ্যবান স্বামী এই শিক্ষক মহাশয় এমন চৌ চৌ নোড় মারিতেন যে, তাঁহার পুনরায় বাড়ী ফিরিয়া আসিতে তিন, চার দিন সময় লাগিত। এই কালো মেমসাহেবটিকে তিনি সৌভাগ্য পরগণা হইতে বিবাহ করিয়া আনিয়াছেন।

শরৎকে বাড়ী লইয়া গেলে সেত’ তাঁহার মেমসাহেবের যথার্থ রূপ দেখিতে পাইবে এবং তাহারই সামনে যদি হঠাৎ মেমসাহেব গ্রীকপ পতিভক্তি দেখাইয়া ফেলেন—এই জন্ত, বাড়ী লইয়া যাইবার নামে বিশেষ ভয় পাইয়া শিক্ষক মহাশয় বলিলেন—“তোমার বাড়ী নিরে গিয়ে খাওয়াব এতো খুব ভাগ্যের কথা শরৎ। কিন্তু এতে একটা বিশেষ বাধা

ভুল-ভাঙ্গা

আছে। বাধাটা হচ্ছে এই যে, তোমার মত লোককে নেমস্তন করে নিয়ে গেলে, পাঁচ রকম ভাল ভাল খানা বানিয়ে খাওয়াতে হবে অথচ আমার মেমসাহেব খালি ডাল ভাত ভিন্ন—আহা-হাঃ কি বলছি ছাই—আমার মেমসাহেব খালি পোলাও কারী ভিন্ন অন্য কিছু রাখতে পারেন না। আমার বাবুচী ব্যাটা আজ ৩ তিন বৎসর হ'ল ছুটি নিয়ে দেশে চলে গেছে—এখনও ফেরেনি। সেই বাবুচি ব্যাচারি অতি বিশ্বাসী আর পুরান লোক সেই জন্য তার স্থানে অন্য লোক রাখতে পারছি না; তাই আমার প্রিয় মেমসাহেবকে সেখান থেকে প্রোত্ন রাখতে হচ্ছে। অথচ তিনি, সেই ডারলিং-কুল-শিরোমণি পোলাও কারী ভিন্ন অন্য কিছু রাখতে জানেন না তাই আমাদের বড়ই মু'কলে প'ড়তে হয়েছে। দিবসের সমস্ত রকম খানার সময়ে ঐ পোলাও কারী খেতে হচ্ছে। আরে Man আজ দু'তিন বৎসর ধ'রে সর্বসময়ে ক্রমাগত পোলাও কারী খেয়ে, খেয়ে প্রাণটা বাবার দাখিল হ'য়েছে। আমাদের বেকফাস্টেও পোলাও কারী, টিফিনেও পোলাও কারী, ডিনারেও পোলাও কারী, সাপারেও পোলাও কারী খেতে হচ্ছে আর সেইজন্মে আমার বড়ই ভাবনা হচ্ছে। ভাবনা অবশ্য আমার জন্মে নয়—আমার মেমসাহেবের জন্মে এই ভাবনা হচ্ছে যে, এইভাবে সব সময়ে পোলাও কারী খেতে, খেতে শেষে তিনি না কোন্‌দিন ঐ পোলাও কারী প্রসব ক'রে বসেন। আমার সেই সুইটহার্ট-সমাজ-সমুজ্জলকারিণী, ডারলিং-কুল-শিরোমণি, ওয়াটকু বংশ-গৌরবিনী, আমার হৃদয়-অমিদারীর নামেব সেই মেমসাহেব তোমাকে

ভুল-ভাগ্য

নিমন্ত্রণ করার সংবাদ জানতে অনুমোদন ক'রবেন কিন্তু ঐ এক বিষয় মুশ্কিল। সেইজন্মেই বলছি যে, ও-ছাই' বাড়ীতে থাক—হোটলেই তোমার ডিনার খাইয়ে আনবো ; তবে এবারটা থাক—আসচে মাস কাবারে।”

এইভাবে আজ কয় বৎসর কাটিয়াছে। মধ্যে শরৎ একেবারে নীরব ছিল ; আজ শিক্ষক মহাশয় চিরবিদায় গ্রহণ করিতেছেন দেখিয়া শরৎ তাঁহাকে, তাঁহার অঙ্গীকার মত, খাওয়াইতে বলিয়াছিল। কিন্তু আজও, অন্তিম মাহিনা গ্রহণের দিনও তিনি দিবা সপ্রতিভ ভাবে বললেন যে—
“এব'রটা থাক—এই আসচে মাস কাবারে মাইনে পেয়েই তোমার 'ডিনার খাইয়ে আনবো।”

নবম পরিচ্ছেদ ।

হরিচরণ ও মাধব নামে দুইটি যুবক শরতের সহিত আজকাল বড়ই মিশিরাছে। ইহারা দুইজনে শরতের বাড়ির নিকটে বাস করে। পূর্বে যখন ইহারা কিশোর বয়স্ক ছিল তখন প্রতিদিন অপরাহ্নে শরতের বাড়িতে আগিয়া খেলাধলা করিত। তারপর কিছুদিন যাবৎ ইহাদের আসা-যাওয়া বন্ধ ছিল। কালে ভদ্রে এক আধবার আসিত এবং দুই এক ঘণ্টা কাটাইয়া চলিয়া যাইত। আজ প্রায় ছয় মাস হইল ইহারা পুনরায় শরতের নিকট নিয়মিতভাবে আনাগোন! আরম্ভ করিয়াছে।

হরিচরণ ও মাধব দুইজনে সহোদর ভ্রাতা। ইহারা দুই ভাই একই বিদ্যালয়ের একই শ্রেণীতে পড়িত। বাবুয়ানার দিকে দুই ভায়েরই বিশেষ ঝোঁক কিন্তু পয়সার অভাবে তাহা হইয়া উঠিত না। ইহাদের পিতা দরিদ্র, সামান্ত কেরানীর কার্য্য করেন। যা বেতন পান তাহাতে সংসার চালাইয়া ও পুত্রদের পাঠের খরচা চালাইয়া এক পয়সাও বাঁচাইতে পারেন না। বরঞ্চ—যদি কখনও সংসারের কাহারও ব্যয়-গ্রাম হয় তাহা হইলে সে মাসে তাহাকে ঋণ করিতে হয়। একরূপ পিতার নিকট হইতে বাবুয়ানার মাধ মিটিবে না দেখিয়া ইহারা—একরূপ পিতার

ভুল-ভাঙ্গা

পুল বলিয়া প্রায়ই প্রকাশ্যে দুঃখ প্রকাশ করিত। শান্তিপুরের কালা পাড় কাপড়, খুব পাতলা আঁকির পাঞ্জাবী ও বাণিশ করা ভাল পম্পু, ইহাদের সদাসর্বদা পরিবার সাধ এ এ সম্বন্ধে পিতার নিকট বহু অনুরোধ করিয়াও কেবলমাত্র মোটা কা ও মোটা কাপড়ের কোট এবং ঘোড়তলা জুতা পরিতে পাইত বলিয়া ইহারা দুই ভ্রাতাভেই, তাহাদের মাতার উপর একত্র খুব তর্কা করিয়া ও যখন একে সকল জিনিসের পরিবর্তে কেবল মাত্র মাছের চক্ষের জল পাঠিত তখন দুই ভ্রাতাভেই সম্বরে বলিত যে—“এঃ ও বাবাও যেমনি, মাও যেমনি—দুই ব্যাটা-বেটিই সমান পাঞ্জা।”

এই জামা-কাপড়ের জন্ত ইহারা মধ্যে, মধ্যে ইস্কুল ছাড়িয়া দিবার ভাব দেখাইয়া মাতাভে বলিত যে—“তুমি হো খালি ভাল ক’রে, মন দিয়ে পড়তে বস’ কিন্তু হোমার এত মালের পড়া যে বন্ধ হয়ে যাবে। আমরা এ রকম ছোট লোকের-বেশে আর ইস্কুলে যাব না। ইস্কুলের বেশীর ভাগ ছেলেই ভাল কাপড়-চোপড় প’রে যাব। বিশেষতঃ বোসেদের ছেলেরা এমন সুন্দর সেজে যাব যে, মাটারদা অবধি তাদের খাতির করে। আর আমরা এই রকম ছোটলোকের মতন সেজে যেতে পারব না। আমাদের এই রকম বেশের জন্তে বোসেদের ছেলেরা কত ঠাট্টা করে। আমরা ভাল কাপড়-চোপড় না পেলো আর ইস্কুলে যাব না।”

ইহাদের পিতা অন্তরাগ হইতে এই সব কথাগুলি শুনিতে পাইয়া—

ভুল-ভাঙ্গা

ছিলেন। তিনি পুত্রদের সম্মুখে, আশ্রয় সন্ধান বলিলেন যে—“যা যাটোরা সেই বোসেদের-ছেলেদের-বাপকে বাপ বলগে যা। আমার দাণ্ডা এর বেশী আর হবে না।”

এইভাবে কিছুদিন যাওয়া পর ইহাদের পিতৃবিয়োগ হইল। পিতার মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গেই দুই ভ্রাতার বিজ্ঞানময় পরিভাগ করিল। ইহাদের পিতা কিছুই জমাঠতে পারেন নাই সুতরাং ইহাদের এক পরসারও সঞ্চতি ছিল না। তার উপর আবার পিতার মৃত্যুকালীন রোগে চিকিৎসার জন্য কিছু টাকা খরচ হইয়াছিল। এক্ষণে সংসার চলা বড়ই দারুণ হইয়া উঠিল। এইরকম সংসারের মধ্যে গিনি অপার্জনশীল ছিলেন তিনি মারা যাওয়াতে সংসারের আর বন্ধ হইয়া গেল; তার উপর আবার ঋণের জন্য হৃদয়শূন্য হইয়াছেন ভাগদা—এটা কিছু যেন মড়ার উপর খাঁড়ার যা, কাটা ঘাস মূলের ছিটে। যে ভুলভে গী সেই এর জ্ঞান জানে, অজ্ঞে জানে না এবং জ্ঞানীর চেষ্টাও করে না। যদি কারিত ভীষা হইলে আমাদের সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রলোকরা ইতি। শ্রেণীর লোক হইবার জন্য লালারিত হইয়া বড় দুঃখে বাঁচেন না যে—“হায় কেন ইত্যরের বরে জন্মাইনি তাহলে লোকের দারে, দ্বারে গিয়ে ভিক্ষে ক’রতে পারতুম—একটা যা-তা ছোট কাজ ক’রতে পারতুম। আমরা এমন সমাজের ভদ্রঘরে জন্মেছি যে, আমাদের দুঃখে সমাজ সাহায্য ক’রবে না অথচ আমরা ক্ষুধার প্রাণ ফেটে গেলেও লোকের কাছে হাত পেতে ব’লতে পারব না যে, “ওগো ক্ষুধার প্রাণ ফেটে গেল—

ভুল-ভাঙ্গা

বড় যন্ত্রণা—দাও, দুটি ভাত, তিক্কা দাও।” যদি একথা ব’লতে যাই তাহলে সমাজ আমাদের অপমান ক’রবে, ছোটলোক ব’লবে, কত উপহাস ক’রবে।

হায় কবে এ দুর্দশার মোচন হইবে। আমাদের সমাজ বাদের ইতর শ্রেণী বলে তারা কি কার্যাতঃ যথার্থ ইতর? তারা ঘোরের সহিত রোজগার করে, মনের সুখে খায়, আরাম করে আবার ‘সঞ্চয়’ও করে। প্রায় সকলেই কিছু না কিছু জমিজমা ও বাস্তুভিটা আছে। তাদের মধ্যে পরিবারের ভিতর একটি মাত্র লোক মারা গেলে সমগ্র পরিবারকে হঠাৎ পথের ভিখারী হইতে হয় না। তারা একরাশি-বিচ্ছা শিথিয়া সন্ত্য হইতে যায় নাই তাই তারা ইতর শ্রেণীর লোক হটয়াও ভক্ত-মধ্যম-শ্রেণীর লোকের অপেক্ষা সুখে থাকে এবং যদিও—তারা লেখাপড়া জানে না, অশিক্ষিত, ইতর প্রভৃতি বালিয়া—তাদের, ভক্ত-শ্রেণীর নীচে রাখিয়া দিবার চেষ্টা করা হয় তবুও কিন্তু তারা—এদের ঐ অশিক্ষিত-দোষের-গুণেই ভক্ত-শ্রেণীর অপেক্ষা ভাল অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং ঐ ভক্ত-শ্রেণীকে টাকা ধার দিয়া—তাহাদের নীচে না থাকিয়া উপরে উঠিয়া পড়ে।

পিতার মৃত্যুতে হরিচরণদের সংসারের শোচনীয় অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। ইহাদের মাতার সনির্বন্ধ অনুরোধে কোনও দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়—প্রত্যেকের পঁচিশ টাকা বেতনের দুইটি চাকরী ঠিক করিয়া ইহাদের দুই ভাতাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। ইহারা কিন্তু সে চাকরীতে সন্তুষ্ট না হইয়া তথায় গেল না। ইহাদের এইরূপ ব্যবহারে মাতা বলিলেন

যে—“তোরা যে চাকরী ক’রতে গেলিনি তা সংসার চলবে কিসে ?”

দুই ভ্রাতার বলিল—“ও রকম পঁচিশ টাকার মাইনেতে আমাদের কি হবে ? ওতে আমাদের সিগারেটের খরচা অবধি হবে না । ও রকম ছোট চাকরী কি ভজলোক করে ? অন্ততঃ দু’ তিনশো টাকা মাইনে না পেলে আমরা চাকরী করব না ।”

মাতা বলিলেন—“তোদের বাবা কখনও এক সঙ্গে দু’ তিনশো টাকা দেখেছে যে, তোরা দু’ তিনশো টাকা মাস-মাইনে চাস ।”

দুই ভ্রাতার মধ্যে হরিচরণ অপেক্ষা মাধব একটু বেশী ওস্তাদ । মাধব বলিল—“মা আমরা কি তোমার যে-সে ছেলে যে, দু’ তিনশো টাকা মাইনে পাওয়া আমাদের পক্ষে শক্ত হবে । কিছুদিন অপেক্ষা কর, আগে বাজারে একবার আমাদের দুই ভায়ের বিত্তের পরিচয়টা বোরিয়ে থাক তখন দেখবে যে, সব বড়, বড় আফিসের বড়-সাহেবেরা, আমাদের দুই ভাইকে তাদের আপিসে নেবার জন্তে উঠে পড়ে লেগে গেছে আর আপনা-আপনির ভেতর মারামারি লাগিয়ে দিয়েছে—অমন চ-চারটে বড়-সাহেব হাত-পা ভেঙ্গে বসেছে । কারণ ক’লকাতা সহরে অনেক আপিস আর তার অনেক বড়-সাহেব অথচ আমরা মোটে দুজন । কাজেই নিজের-নিজের আপিসে আমাদের দুজনকে নেবার জন্তে ঐ সব বড়-সাহেবেরা আপনা-আপনির ভেতর মারামারি লাগিয়ে দেবে আর হাত-পা ভেঙ্গে ব’সবে । কিছুদিন অপেক্ষা কর মা কিছুদিন অপেক্ষা

ভুল-ভাঙ্গা

কর, তারপর সব দেখতে পাবে। আর আমাদের মতন ছেলে গর্তে ধারণ ক'রে ব'লে শীগ'গিরই রত্নগর্ভ। ব'লে সমস্ত পৃথিবীময় তোমার নাম বেরিয়ে যাবে। তখন কিন্তু একদিন আমাদের ভাল ক'রে খাইয়ে দিতে হবে।”

মা অপেক্ষা করুন আর নাই করুন, দিন কিন্তু অপেক্ষা করিল না। সে যেমনটাই চলিতেছিল তেমনই চলিতে লাগিল এবং প্রতিদিন দুই বেলা আহারের সময়—“ম. ভাত দাও”—বলিয়া পুত্রযুগল আসিয়া দাঁড়াইতে লাগিল। অথচ ‘ভাত কোথা হইতে আসিবে’ সে ভাবনা তাহারা একবারও ভাবিল না। মা—হিন্দুর ঘরের মা আর কি করেন, তিনি তখন নিজেই চাকরীর যোগাড় দেখিতে লাগিলেন। পাড়ার একটি পরোপকার-ব্রতধারিণী বর্ষযুগো বিধবা মহিলার সাহায্যে, ভিন্ন পাড়ার এক ধনীর বাড়ীতে একটি চাকুরী পাইলেন। সেই ধনীর কন্যাকে রন্ধন ও গৃহস্থালী কার্য শিক্ষা দিবার জন্য তিনি মাসিক ত্রিশ টাকা বেতন পাইবেন এবং প্রতিদিন বেলা তিনটার সময় সেই ধনীর বাড়ী গিয়া সন্ধ্যা অবধি থাকিতে হইবে।

বিধবা মাতা প্রতিদিন আধ ক্রোশের উপর পথ আনাগোনা করিয়া চাকুরী করিয়া উপার্জন করিতে লাগিলেন এবং পুত্র দুইটী পায়ে উপর পা দিয়া বসিয়া আর অডা দিয়া খাইতে লাগিলেন।

পিতার নিকট হইতে বাবুগিরির সাব মিটল না দেখিয়া—পিতার মৃত্যুর প্রায় দুই মাস পূর্ব হইতে হরিচরণ ও মাধব দুই ভ্রাতার শরতের

ভুল-ভাল

সহিত খুব মিশিয়াছিল। শরতের সহিত ইহাদের পূর্বে আলাপ ছিল এবং পূর্বে শরতের বাড়ীতে ইহারা খেলিতে যাইত এক্ষণে দুই ভ্রাতার পরামর্শ করিয়া পুনর্বার শরতের বাড়ী প্রতিদিন অপরাহ্নে যাইতে লাগিল এবং রাত্রি দশটা, এগারটা অবধি আড্ডা দিতে লাগিল। তারপর অত রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া মায়ের নিকট ভাত চাহিত। মা সমস্ত দিন 'নজের-সংসারে খাটিয়া তারপর পরের বাড়ী চাকরী করিয়া ও আধ-ক্রোশের উপর পথ আনাগোনা করিয়া পুনরায় ছেলের জন্ত রান্নাভিত্তিক এবং তাহাদের আগমন প্রতীক্ষায় এত রাত্রি অবধি হাঁড়ী কোলে করিয়া বসিয়া, বসিয়া দু'লিতেন। হরিচরণ ও মাধব খাইতে বসিয়া নানারূপ লাক পঞ্চাশী মারিড এবং তাহাদের কৃত্তকের পরিচয় স্বরূপ নানারূপ আঙ্গুষ্ঠা গল্প করিত। সারাদিনের পরিশ্রমে কাতর মাতা, যদি তাহাদের এই গল্প শুনিতে শুনিতে একটু দু'লিতেন তাহা হইলে ইহারা ভয়ানক কাপ্লা হইয়া উঠিত এবং এক ভাই অগ্ৰকে দৃষ্টিবোধন করিয়া বলিত যে—“আমরা মিছে ব'কে মরছি আর নবাবের বেটি দিয়া আরামে—চণ্ডু-খারের মতন ব'সে ব'সে খুশুচ্ছ। বলি ওমা-আঃ আজ কি চণ্ডু টণ্ডু টেনেছ নাকি?”

কিছুদিন এইভাবে শরতের নিকট আনাগোনা কারবার পর ইহাদের মনকামনা পূর্ণ হইল। হরিচরণ ও মাধবের ভাগ্যবলে শরৎ এই সময়টার পিতার তাড়ায় কলেজ ছাড়িয়া দিল। কলেজ ছাড়িয়া দিবার পর শরৎ—হরিচরণ ও মাধবকে দিবসের অধিকাংশ সময় নিকটে রাখিত। তিনজনে মিলিয়া সারাদিন তাস, দাবা প্রভৃতি খেলিত এবং অপরাহ্নে গাড়ী কাররা

ভুল-ভাঙ্গা

বেড়াইতে বাহির হইত। শরতের ব্যবহৃত ভাল জামা, কাপড়, কামাল, এসেঙ্গ প্রভৃতি বিলাসদ্রব্য ইহারা পাইত এবং ভাল, ভাল সিগারেট খাইতে পাইত।

গোবিন্দবাবু, শরৎকে ব্যবসার কার্য লিখাইতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু শরৎ বলিল যে—“দিন কতক থাক, তারপর হবে।” এই বলিয়া সে এখন হরিচরণ ও মাধবকে লইয়া সর্বদা খেলা ও গল্প করিতে লাগিল এবং আপনার অঙ্গরাগ ও সাজসজ্জায় মত্ত হইয়া খুব বাবুমানায় দিন কাটাইতে লাগিল। আত্মমুখে মগ্ন হইয়া কৃত্রিম আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে লাগিল।”



দশম পরিচ্ছেদ ।

শরৎকে কলেজ ছাড়াইবার সঙ্গে, সঙ্গে তাহার বিবাহ দিবার নিমিত্ত নবীনচাঁদ বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নানাস্থানে পাত্রীর অনু-সন্ধান চলিতে লাগিল; নানা শ্রেণীর ঘটক, সদা-সর্বদা তাঁহার বাটিতে গমনাগমন করিতে লাগিল। নবীনচাঁদ মনে, মনে দৃঢ়-সঙ্কল্প করিয়াছেন যে—অচিরে পুত্রের বিবাহ দিবেন এবং তাহার পর তাহাকে রামায়ণ, মহাভারত ইহুত আরম্ভ করিয়া যতটা পারেন অন্যান্য হিন্দু-শাস্ত্র-অন্তর্গত সংগ্রহ সকল স্বয়ং পাঠ করাইবেন। সমুদয় বিগত ঘটনাবলীর আলো-চনার তাঁহার ~~মনে~~ দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে—পুরাকালের ভারতীয় আধ্যাত্মিকের মহান চরিত্র ও জীবন-কথা শরৎকে পড়াইতে পারিলেই সে অতি অবশ্যই শুধরাইয়া যাইবে; হিন্দু-সম্প্রদায়ের সর্বতোভাষ্য কি সামাজিক, কি ধর্ম-জীবনে—যেমন হওয়া উচিত, সে ঠিক ভেমনটি তাহার মনে পড়িলেই তাহার পক্ষে তাহা হইতে বঞ্চিত হওয়া অসম্ভব হইবে। নবীনচাঁদ সত্যের প্রতীক্য করিতে লাগিলেন; কিন্তু হায়, তাঁহার অন্তরে সে শুভ সময় আর আসিল না।

শরৎকে কলেজ ছাড়াইয়াই তিনি উপরোক্ত গ্রন্থ পড়াইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু সফল-কাম হন নাই—শরৎচন্দ্র তাঁহার নিকট বিশেষ জিদ ধরিল যে—“দিন কতক থাক তারপর আপনার কাছে বসে ঐ সব বই পড়ব। এখন আমার মনটা ভরানক চঞ্চল আর খারাপ হ’য়ে

ভুল-ভাঙ্গা

আছে, সামান্য কিছুদিন না গেলে আমি ও সকল বইতে মন বসাতে পারব না।” নবীনচাঁদ পুত্রের এইরূপ ভাব দেখিয়া গোবিন্দবাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া ঠিক করিলেন যে—“অগ্রে অবিলম্বে পুত্রের শুভ-বিবাহ কার্যটি নিষ্পন্ন করিয়া ফেলিবেন তারপরে প্রাতঃকালে ও স্বায়ংকালে তিনি স্বয়ং, তাহাকে ঐ সকল গ্রন্থরাজি পর্যায়ক্রমে পাঠ করাইবেন এবং গোবিন্দবাবু, তাহাকে মধ্যাহ্নে ব্যবসার কার্যাবলী শিখাইবেন; তবে উপস্থিত তাহাকে, কতকগুলি বাদ্গানী গ্রন্থকারের সামাজিক গ্রন্থ পাঠ করাইতে হইবে।” এইরূপ পরামর্শ করিয়া নবীনচাঁদ, নিকটে সাদরে আহ্বান করিয়া, শরৎকে উক্ত পরামর্শ মত বলিলেন যে—“দেখ শরৎ, এখন তুমি দু-চার দিন আমার কাছে না পড়তে চাও তো পোড়না।” দেখ আমি মনে করছি যে, ভাড়াভাড়ি বেশ ভাল একটি পাত্রী দেখে তোমার বিবাহটি দিয়ে ফেলে আমি, আমার একটা গুরুতর কষ্টের সেরে ফেলি। সেই জন্যে অতি শৌগ্গিরই আমি, তোমার বিয়ে দোব’। তা দেখ, এই বিয়েটা হয়ে গেলেই আমার কাছে বেশ নিয়ম নত তোমায় পড়তে হবে। এই কটা দিন তুমি বিশ্রাম কর—তার পর বাপু, নূতন ভাবে শিক্ষা পেরে, তোমায় নূতন ভাবে জীবন কাটাতে হবে। আর দেখ, এই কটা দিন নেহাৎ অলস ভাবে না কাটিয়ে—তোমার অবসর মতন, হয়ত’ বা খাওয়া-দাওয়ার পর ছপুৰ বেলাটার কিংবা রাত্ৰিতে শোবার আগে—তোমায় আমাদের বাদ্গানী গ্রন্থকারদের রচিত ছই, চারিখানি সামাজিক বই পোড়তে হবে। এ সব বই পড়তে তোমার কোনও কষ্ট হবে না অথচ বেশ আনন্দ পাবে, শিক্ষাও হবে। হাসির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা—এতে তোমার মনও প্রফুল্ল হবে আর ভবিষ্যৎ জীবনেরও অনেক

ভুল-ভাঙ্গা

উপকার হবে। আমি গোবিন্দবাবুকে ব'লে দিয়েছি ; তিনি, তোমায় আজই গিরিশ ঘোষের “বেল্লিক-বাজার” অমৃত বোসের “তরুবালা”, “বারু”, “একাকার”, ডি, এল, রায়ের “বহুং আচ্ছা,” অমর দত্তর “মজা” নামের বইগুলি আনিয়ে দেবেন—তুমি আগে এইগুলি প'ড়বে। তুমি এখন যে মহাদোবের অধিকারী হয়েছ—এই বই গুলি প'ড়লে—সেই সকল মহাদোবের অবশ্যজ্ঞাবী বিষয়গুলি আগে থাকতে জানতে পেরে ভবিষ্যতের জন্তে সাবধান হ'তে পারবে। এগুলি প'ড়তে, তোমার দুই তিন দিন মাত্র লাগবে। তার পর, আরও কতকগুলি বাঙ্গলা পৌরাণিক নাটক ও তোমার পক্ষে বর্তমানে মহা উপযোগী কতকগুলি সামাজিক নাটক ও নভেল আনতে বলে দিয়েছি—সে গুলিও এই সময়ের মধ্যে প'ড়ে বেশ আনন্দের সঙ্গে তোমার অবসর যাপন কর এবং ভবিষ্যৎ-নতুন-জীবন গঠিত করার জন্ত মনের ওপর তার বীজ বপন কর। তারপর তোমার বিবাহের হাদ্যমাটা মিটে গেলে আমি নিজে—আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের সঙ্গে তোমায় পরিচিত করাব—তোমার মানুষ ক'রে দোব এগুলি করা চাই-ই চাই—নচেৎ বড়ই দুঃখের ও অপ্রীতিকর ব্যবস্থা আমার কাছ থেকে পাবে।”

শরৎচন্দ্র বলিল—“আপনি যা, যা, বলেন সবই ক'রব কিন্তু ঐ বিয়ের কথাটি আমার ব'লবেন না। আমি আপনাদের হিন্দু সমাজের অনুমোদিত অসভ্য ধর্মের বিয়েটি ক'রতে পারব না ; কিছুতেই পারব না—আমার সমস্ত জীবনটাকে নষ্ট করতে পারব না। আপনি আমার বিয়ের জন্তে চেষ্টা করবেন না—আমার মাথার ওপর বোঝা জাপাবেননা বাবা—এ কথা কিন্তু আমি আগে থাকতে ব'লে দিচ্ছি।”

ভুল-ভাঙ্গা

নবীনচাঁদ সহাস্তে বলিলেন—“আরে বাপু, তোর মাথায় বোঝা চাপান কিসে হ'ল? তুই তো আর গরীবের ছেলে নোস'যে স্ত্রী-পুত্র তোর ঘাড়ে বোঝার সামিল হবে? সে ভাবনা তোর নেই—তো'র যদি এক শতটা ছেলেও হয়—তাদের ব্যবস্থা আমি করে দিয়ে যাবো—তো'র কোনও ভাবনা নেইরে পাগলা কোনও ভাবনা নেই।”

শরতের বানে, নবীনচাঁদের সব কথাগুলি গেলনা। সে নিজ বক্তব্য বলিয়াই—পিতার প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই—গোঁ ভরে “গ্যাট্-গ্যাট্” করিতে করিতে চলিয়া গেল।

নবীনচাঁদ, শরতের বিবাহের জন্ত “উঠিয়া-গাড়িয়া” লাগিয়া গিয়াছেন। তিনি, গোবিন্দবাবু ও অন্তান্ত দুই, চারিটি প্রবীন বন্ধুকে লইয়া নানাস্থানে গমন করিয়া পাত্রী দর্শন করিয়া বেড়াইতেছেন। অবশেষে একটা পাত্রীকে তাঁহার ও অন্তান্ত সকলের খুব পছন্দ হইল। এই পাত্রীটি খুব সুন্দরী ও সুলক্ষণা এবং তাঁহার পুত্রের সহিত ইহার পর্যায়ও মিলিয়াছে। এই সকল কারণে তিনি কন্টার পিতার সহিত কথাবার্তা করিয়া বিবাহের একরূপ ঠিক করিয়া ফেলিলেন এবং সেই দিনই সন্ধ্যাকালে—তাঁহার পুত্রের ঘনিষ্ঠ বান্ধবের এক একজন মিলিয়া বিবাহের পাত্রীকে কহিবার নিমিত্ত—পাত্রীর পিতাকে অনুরোধ করিয়া আসিলেন।

সেইদিন সন্ধ্যাকালে নবীনচাঁদ—দুই, চারিটি প্রতিবাসী ও গোবিন্দবাবু প্রভৃতি কতকগুলি বিশিষ্ট কর্মচারী এবং কতিপয় প্রোঢ় বন্ধু-বান্ধবকে লইয়া—তাঁহার সুসজ্জিত বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন এমনসময়, পূর্ব-কথিত পাত্রীর পিতা তিন জন আত্মীয়কে সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইয়া নবীনচাঁদ, একটি

ভুল-ভাঙ্গা

পরিচারককে—শরৎকে তথায় ডাকিয়া দিলার নিমিত্ত—আদেশ করিলেন ।

সকলে সম্মোচিত আলাপ পরিচয় করিতেছেন এমন সময় শরৎচন্দ্র তথায় উপস্থিত হইল এবং ঘাড় বাঁকাইয়া, চোখ-মুখ সিঁটকাইয়া বলিল—
“বাবা এ রকম সময় হঠাৎ আমার ডাকলেন কেন ?”

নবীনচাঁদ সহাস্যে বলিলেন—“তোমার ঘাড়ে বোঝা চাপিয়ে দিয়ে তোমার ঘাড় ভাঙ্গবার ব্যবস্থা করবার জন্তে তোমায় ডেকেছি ।”

শরৎচন্দ্র একবার চারিদিকে চকিত-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল এবং তৎপরে পিতার দিকে চাহিয়া মহা গম্ভীর ভাবে বলিল—“ও রকম Serious ব্যাপার নিয়ে আমোদ করা ভাল নয় বাবা । কেন ডেকেছেন বলুন—
ছুটি ভদ্রলোক আমার জন্তে অপেক্ষা করছেন ।”

নবীনচাঁদ বলিলেন—“তোমার পক্ষে আমোদ করবার দিন এসেছে, তাই আমিও আমোদ করছি । শরৎ, বাবা, আমি অনেক অসুস্থকানু করবার পর একটি সুন্দরী মেয়ের সন্ধান আজ পেয়েছি । আমি -”

শরৎ বিরক্তিভরে বলিল—“সন্ধান পেয়েছেন তো কি হবে কি ?”

নবীনচাঁদ বলিলেন—“এই মাসেই তার সঙ্গে তোমার বিয়ে দোব ।”

শরৎচন্দ্র বলিল—“আমি বিয়ে ক’রব না ।”

নবীনচাঁদ বলিলেন—“সে কি, বিয়ে ক’রবে না কি রকম !”

শরৎচন্দ্র বলিল—“এই—এই রকম ।”

নবীনচাঁদ অগ্রসরভাবে বলিলেন—“ও সব পাগলামী কথা ছেড়ে দাও শরৎ । বিয়ে তোমায় করতেই হবে । আমি, যে পাণ্ডীটিকে তোমার জন্ত মনোনীত করেছি, তার অভিভাবকদের পাকা কথা দিই—

ভুল-ভাঙ্গা

তারা তোমায় দেখতে এসেছেন। ভদ্রলোক হ'য়ে ভদ্রলোককে কথা দিয়েছি, সে কথার খেলাপ করা চলে না।”

শরৎচন্দ্র বলিল—“আপনি যদি কথার খেলাপ না ক'রতে চান তা হ'লে আপনি নিজে বিয়ে করুন গে। আমার দ্বারা হবে না। বাবা উপযুক্ত ছেলের স্বাধীনতায় অযথা হস্তক্ষেপ ক'রবেন না।”

নবীনচাঁদ অতি কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া, ঈষৎ উচ্চৈশ্বরে বলিলেন—
“ও কি কথা শরৎ ! ও রকম কথা ব'লে এই বুড়ো বাপের মনে কষ্ট দিওনা শরৎ—দিলে, তোমায় অনেক কষ্ট পেতে হবে। তোমায় বিয়ে ক'রতেই হবে। আচ্ছা বেশ তুমি নিজে গিয়ে না হয় সে মেয়েটিকে দেখে এসো—তারপর, যদি তাকে তোমার পছন্দ না হয় তাহলে আমি অঙ্গীকার ক'রছি যে এ সম্বন্ধ ভেঙ্গে দোব ; আর অন্য একস্থানে আর একটি ভাল পাত্রীর সন্ধান ক'রে, তোমায় আগে তাকে দেখিয়ে তবে বিয়ের ঠিক ক'রব। কেমন এতে তো আর তোমার আপত্তির কোনও কারণ নেই ? র'্যা ?”

শরৎচন্দ্র ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল—“আছে।”

নবীনচাঁদ বলিলেন—“এতে আবার আপত্তির কারণ কি আছে ?”

শরৎচন্দ্র বলিল—“বিশেষ কারণ আছে। শুনুন—আমি কোন কিছু গোপন ক'রতে চাই না। অপ্রিয় হলেও—Frank কথা বলা খুব ভাল এবং আমি Frank কথা ব'লতে অভ্যস্ত ও শিক্ত। আপনি বর্তমানে আমার পেছনে যে রকম ভাবে লেগেছেন তাতে আমি সোজা ভাবে সব কথা আগে ব'লছি এবং সে সকল কথা শুনে যদি আপনি প্রতিনিবৃত্ত না হন তাহ'লে—আমার আত্মহত্যা ক'রতে হবে না হয় বিলেত টিলেত কোথাও পাল্লাতে হবে।”

ভুল-ভাঙ্গা

নবীনচাঁদ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া বলিলেন—“তুমি কি বলছ আমি কিছুই বুঝতে পারছি না—আমি আজকাল তোমর পিছুনে লেগেছি কি ? তুমি কি আমার শত্রু ?”

শরৎ নিজের বাম হাতের উপর সজোরে একটি ঘুসী মারিয়া বলিল—
“আপনি আমার সঙ্গে আজকাল শত্রুতা করছেন কিনা বুঝতে পারছেন না ? wonderfull ! আপনি এতদিন আমার একভাবে চালিত করে এলেন ; আমার প্রতি পশুর মতন ব্যবহার না করে, আমার শৃঙ্খলে বেঁধে না মেয়ে স্বাধীন ভাবে চালিয়ে এলেন ; হঠাৎ আপনি গত একমাস থেকে কি রকম হয়ে গেলেন । আমার কলেজ ছাড়িয়ে দিলেন ; একজন উন্নত-চিন্তাশীল শিক্ষিত, বিলাত-ফেরৎ মার্টার আমার পড়াচ্ছিলেন তাকে ছাড়িয়ে দিলেন, তারপর কতকগুলো বাঙালি বই কিনা আমার পড়তে হুকুম করলেন, এবং শুনতে পাচ্ছি যে আমার আপনি নাকি আবার শাস্ত্র পড়াবেন । এ সকল কি ? এ সকল ব্যবহার কি ভদ্রতা ও সভ্যতা-সঙ্গত ? আমি উচ্চশিক্ষা পেয়ে, সভ্য ও উন্নত হয়ে আবার সেই প্রাচীন বস্ত্র-জীবনে ফিরে যাবো ? উঃ Horrible ! আপনি শেষে আমায় কিনা বিবাহ করতে বলছেন ; আমি তাতে সম্পূর্ণ অসম্মত হলেও আপনি জোর করে আমার তাতে প্রবৃত্ত করাতে চান । আমি কি বাঙালীর ঘরের—পশুর মতন-শিষ্টভাবে-পিতৃ-আজ্ঞাপালনকারী সুবোধ বালক-সাধারণ ? না, সেই ভাবে আমি শিক্ষিত হয়েছি, সেই রকম জীবন যাপন করবার জন্যই কি আমি অত পরিশ্রম করে উচ্চ শিক্ষিত হলাম, উচ্চ প্রণালীতে, বিজ্ঞান-সঙ্গত উপায়ে চিন্তা করবার অধিকারী হলাম ? আমি স্বাধীনতার আশ্বাদ পেয়েছি, আমার মনটা জীবিতদাস-

ভুল-ভাঙ্গা

ভাবাপন্ন নয়—আমার ওপর যা তা চালাকী চলবে না। আমি আপনাকে Frank কথা ব'লে দিচ্ছি আমি বিয়ে ক'রব না এবং বিয়ে করবার জন্য আমি স্বাধীন জীবনের আশ্বাদ পাইনি।”

নবীনচাঁদ ক্রোধে ও দুঃখে কম্পিত স্বরে বলিলেন—“ও সব স্বাধীনতার আশ্বাদ, ক্রীতদাস-ভাবাপন্ন-টর রেখে দাও। ও সব ঘোচাবার ব্যবস্থা আমি ক'রেছি আর শীঘ্রই ফুটিয়ে দিচ্ছি। তোমার বিয়ে ক'রতেই হবে।”

শরৎচন্দ্র বিজ্রপের স্বরে বলিল—“এ তো বেশ আবদার দেখতে পাই। বিয়ে করতেই হবে? কেন বলুন দেখি - what do you mean by that বিয়ে ক'রতেই হবে। Dear father Please do not forget that I have attained majority আমি আপনার নাবালক সন্তান নই যে আপনি আমার উপর হেচছাচার ক'রবেন। আমি বুঝতে পেরেছি, আপনি বৃদ্ধ হয়েছেন আপনার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে তাই আপনি ওই সব জিনিসকে ঘোচাতে চাইছেন। take a little advice from your able and wise son—আপনার উপযুক্ত, জ্ঞানী পুত্রের উপদেশ গ্রহণ করুন আপনি Retire করুন, এ সংসার থেকে অবসর নিন। আপনার মতন লোকে সংসারে থাকলে আমাদের বর্তমান সমাজের উন্নতির আশা কখনও হবে না। আমি চললুম—আমায় আর এ রকম ক'রে trouble দেবেন না। দয়া ক'রে মনে রাখবেন যে আপনাদের সেই—“সেবক শ্রী, কার্যনঞ্চাগের”—দিন আর নেই। আমি আপনার কথায় আমার এতদিনের শিক্ষা, দীক্ষা জ্ঞানকে বিসর্জন দিতে পারব না। আমি বিয়ে ক'রব না।”

নবীনচাঁদ বিষয়ে সন্তোষিত, স্বকৃত কর্মের পরিণাম, স্ব-রোপিত কর্ম-

রুমের বিষময় ফল দর্শনে ভীত, দুঃখে ও কষ্টে উন্মত্তপ্রায় হঠাৎ বলিলেন—
“কেন তুমি বিয়ে ক’রবে না সেটা বল; দোহাই তোমার, জোড়
হাত ক’রে বলছি—কি কারণে তুমি বিয়ে ক’রতে চাওনা আমার তা
খুলে বল। তুমি কি কাউকে, বিয়ে করবার জন্য নিজে থেকে মনোনীত
করেছ, তাই আমার এই প্রস্তাবে সম্মত হ’চ্চ না? খুলে বল। যদি
তাই হয়; তুমি যদি কাউকে ভালবেসে থাক, আমি প্রতিজ্ঞা করছি—তারা
যদি ভিন্ন-জাতীয়; বা ভিন্ন-ধর্মী না হয়—সেখানে তোমার বিবাহ দোব।”

শরৎচন্দ্র গাঙ্গীর ভাবে বলিল—“বাবা ভালবাসাটা বড় সস্তা নয় যে
আমি অমনই নাকে তাকে কটু ক’রে ভালবেসে ফেলব’। আমি বিয়ে—
বিয়ে বাঁলে যে জিনিসটি আছে, সেইটি ক’রব না। এ জগতে আমরা
উপভোগের জন্য এসেছি এবং আমাদের জীবনের মেয়াদটাও অতি
অল্প সুতরাং প্রত্যেক মানুষেরই কর্তব্য হচ্ছে আয়োদ্য, প্রমোদ ক’রে
স্বাধীন ভাবে জীবনটাকে উপভোগ ক’রে নেওয়া। বিয়েটি হ’লে—এই
গুলির মহা প্রতিবন্ধক আর তা ছাড়া আমার দা চোহারা সেটা পাঁচজনকে
দেবার জন্য সৃষ্ট হয়েছে। আমার এই সুন্দর, স্ত্রী রূপকে আমি কখন
একজনকে (Lease) পত্তনী দিতে পারব না। পাঁচজনের উপভোগের
জন্তে যদি এই সুন্দর রূপ বিতরণ না ক’রলুম তাহলে আমার এই রূপের
সার্থকতা কি?—আমি “Public property”—সাধারণের সম্পত্তি।
পাঁচজনের উপভোগের জন্তে আমি জন্মেছি। আপনি যদি জোর-
জবরদস্তী ক’রে আমার বিয়ে দেন তাহলে—“Public property”—
সাধারণের সম্পত্তি অপহরণ, এবং সেটা—wrongfully—অন্যায় পূর্বক
অপরকে Lease পত্তনি দেওয়ার অপরাধে আপনি কৌজদারী মোপদ

ভুল-ভাগ্য

হবেন। অতএব আপনি বুঝে-সুঝে কাজ করবেন। আপনি বাবা, আপনার-লোক, সেইজন্যে আমি 'কর্তব্যের অনুরোধে আপনাকে warning দিচ্ছি, আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি যে, বাবা Take care for your terrible future—আপনার ভীষণ ভবিষ্যতের জন্য আপনি সাবধান হোন।’

নবীনচাঁদ বিস্ময়ে, ক্ষোভে, লজ্জায়, দুঃখে চিত্র-প্রায় নির্বাক; নিশ্চল, নিম্পন্দ। সমাগত সকলেই নিস্তব্ধ। তাঁহারা কিয়ৎক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিবার পর একে, একে বিদায় গ্রহণ করিলেন। নবীনচাঁদ ও গোবিন্দবাবু নীরবে বসিয়া রহিলেন।

শরৎচন্দ্র উপরোক্ত কথাগুলি বলিয়া আর এক মিনিটও তথায় থাকে নাই। সেইক্ষণেই সে চটাচট করিয়া চটি-জুতার শব্দ করিতে, করিতে নিজের বৈটকখানায় গমন করিল এবং প্রিয়-সহচর হরিচরণ ও মাধবকে লইয়া তাস খেলিতে আরম্ভ করিল; নির্বিকার মনে, নিশ্চিন্ত ভাবে তাস খেলিতে, খেলিতে সে, সহচরদের নিকট গর্ব করিয়া বলিল যে—“আজ, আজকাল বাবা ভারী বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছিলেন; আজ আমি এমন দু’চারটে কড়া কথা বাবাকে বলেছি আর এমন ভয় দেখিয়ে দিয়েছি যে বাবা আর কোনও দিন আমার সঙ্গে চালাকী করবার সাহস পাবে না।”

পুত্র এদিকে নিশ্চিন্ত মনে সহচরদের লইয়া তাস খেলিতেছে ও খোস-গল্প করিতেছে। পিতা ওদিকে দারুণ মনকষ্টে ছটফট করিতেছেন। তিনি প্রাচীন বন্ধুগণের সহস্র নিবারণ না শুনিয়া, স্বেচ্ছায়—পুত্রকে কি অমূল্য রত্ন তৈয়ারী করিয়াছেন এবং ভবিষ্যত ফল কিরূপ বিষময় ও মান, সম্মান, ক্ষাতি, ধর্ম প্রভৃতি কি দশা প্রাপ্ত হইবে—এই চিন্তায় মহাভীত ও

একান্ত বিচলিত হইলেন। যাহা হউক তাঁহাকে অধিক দিন আর এ মর্শবেদনা ভোগ করিতে হইল না।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে নবীনচাঁদ সহসা একদিন প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। বড়, বড় ভাল, ভাল ডাক্তার আসিল, ঔষধ দিল কিন্তু জ্বরাক্রমণের তৃতীয় দিনে তিনি একেবারে অচেতন হইয়া পড়িলেন। বড়, বড় ডাক্তার আসিল, দামী, দামী ঔষধের ব্যবস্থা করিল কিন্তু তাঁহার স্বাভাবিক জ্ঞান আর ফিরিয়া আসিল না। তিনি যে কি রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন তাহা ডাক্তাররা ধরিতে পারিল না। তাঁহারা সকলে পরামর্শ করিয়া রোগীর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া, পরিবর্তন মত, ঔষধ দিতে লাগিলেন। নবীনচাঁদের জ্ঞান আর ফিরিয়া আসিল না। রোগাক্রমণের পঞ্চম দিনে, তিনি একবার সহসা চক্ষু মেলিয়া চারিদিকে চাহিলেন ; তারপরে মস্তকের দিকে বিলম্বিত শ্রীরাধাকৃষ্ণের পটের দিকে মাথা তুলিয়া প্রণাম করিয়া, অক্ষুট-স্বরে কি বলিয়া পুনরায় চক্ষু মুদিলেন — সে চক্ষু আর উন্মিলিত হইল না। পত্নী মোক্ষদাসুন্দরী ও আশ্রিত-গণকে কঁাদাইয়া নবীনচাঁদ মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

— — —

একাদশ পরিচ্ছেদ ।

নবীনটাদের মৃত্যুকালে, শরৎচন্দ্র তাঁহার নিকটে ছিল না। সে তখন নিজের বৈটকখানায় বসিয়া, হরিচরণ ও মাধবের সহিত গুপ্ত পরামর্শে নিযুক্ত ছিল। কিছুক্ষণ পূর্বে সে, পিতার অবস্থা সঙ্কটজনক হইয়াছে এই কথা শুনিয়াছিল। সহচরদ্বয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া শরৎচন্দ্র, নিজের কক্ষ হইতে বাহির হইয়া বরাবর পিতার কক্ষে প্রবেশ করিল।

নবীনচাঁদ অচেতন অবস্থায় খাটের উপর শুইয়া আছেন। মোক্ষদাসুন্দরী বর্ণনাভীত ব্যথিত অন্তকরণে তাঁহার শিয়রে বসিয়া, তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছিলেন এবং পুরাতন ভূত দীলু ও অন্ত দুইটিপরিচারিকা আজ্ঞা-প্রতীক্ষার কক্ষতলে বসিয়াছিল।

শরৎচন্দ্র সেই কক্ষে প্রবেশ করাতে পরিচারিকাদ্বয় ও দীলু উঠিয়া, সরিয়া দাঁড়াইল। মোক্ষদাসুন্দরী, স্বামীর শিয়র হইতে উঠিয়া তাঁহার পদতলে গিয়া বসিয়া পদসেবা করিতে লাগিলেন। শরৎচন্দ্রের আগমনে সকলেই মনে করিয়াছিল সে, পিতার নিকটে কিছুক্ষণের জন্য বসিবার ও তাঁহার সেবা করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছে। শরৎচন্দ্র তথায় বসিলও না এবং কাহারও সহিত কোনও কথা না কহিয়া বরাবর পিতার শিয়রের নিকট গমন করিল ও তাঁহার মস্তকের উপাধান একটু তুলিয়া, তাঁহার নিম্ন হইতে লোহার সিন্দুক প্রভৃতির এক গোছা চাবি বাহির করিয়া ~~হইয়া~~ নীরবে বাহিরে চলিয়া গেল।

মোক্ষদাসুন্দরী খানিকটা, হতভম্ব হইয়া তথায় বসিয়া রহিলেন এবং ক্ষণপরে ধীরে, ধীরে স্বামীর শিয়রে ঘাইয়া পুনরায় উপবেশন করিলেন। পরিচারিকাছয়, পরস্পরে দৃষ্টি বিনিময় করিল—দীর্ঘ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কক্ষতলে চাহিয়া রহিল।

পিতার শয়নকক্ষ হইতে বাহির হইয়া শরৎচন্দ্র নিজের বৈটকখানায় প্রবেশ করিয়া একটি আলমারী খুলিয়া, তাহার হস্তস্থিত চাবির কতকগুলি রাখিয়া দিল এবং কতকগুলি চাবি বাছিয়া লইয়া নিজের পকেটে রাখিয়া দিল। তৎপরে পরিচারককে ডাকিয়া বলিল যে—“এই ঘরে আমার খাবার চুট করে নিয়ে আয়। আর; অন্য দুজন বাবুর খাবার ক’রতে বামুনকে বলে দিয়েছিলুম—সেই দুইজনের খাবার এনে হরিচরণবাবু আর মানববাবুকে দে। যা, শীগ্গির ক’রে নিয়ে আয়—অনেক কাজ আছে।”

পরিচারক প্রস্থান করিলে শরৎচন্দ্র—তথায় উপবিষ্ট হরিচরণ ও মানবকে বলিল—“আপ, আজ বাবার অবস্থা বড় খারাপ,—রাত কাটবে না বোধ হয়—বৈকালবেলা ডাক্তাররা এই কথা ব’লে গেছে। আজ আর তোমরা বাড়ী যেওনা—তোমাদের নিয়ে আজ আমার অনেক কাজ আছে। আপনি একায়েগো, তোমাদের খাবার তৈয়ারি ক’রতে, সেইজন্য বলে দিয়েছি।”

এই সময় পাচক-ঠাকুর ওরফে বামুন-ঠাকুর তিনজনের খাবার লইয়া প্রবেশ করিল এবং তথায় খাবার রাখিয়া দিয়া প্রস্থান করিল। পাচক-ঠাকুর বাহির হইয়া বাইবার সঙ্গে, সঙ্গেই দীর্ঘ গহা ব্যস্তভাবে প্রবেশ করিয়া বলিল—“বাবু, বাবু—কর্তাবাবু কি রকম ক’রছেন—তার শেষ সময় উপস্থিত—আপনি শীগ্গির আসুন।”

ভুল-ভাঙ্গা

শরৎচন্দ্র অবিচলিত ভাবে বলিল—“আমি একটু পরে যাচ্ছি—তুই যা। দেখচিস না সামনে খাবার রয়েছে—আমি খেয়েই যাচ্ছি।”

দীর্ঘ অবাক হইয়া শরতের মুখের দিকে একবার চাহিয়া দেখিল তৎপরে—“যদি জন্মের শোধ কর্তাবাবুকে দেখতে চান তো এখনই আসুন; আর এক মিনিটও দেরী ক’রবেন না”—অতি ব্যস্তভাবে এই কথা বলিয়া দীর্ঘ অতি দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

শরৎচন্দ্র ভ্রক্ষেপও করিল না। নানারূপ পরামর্শ করিতে করিতে ইয়ারদ্বয়ের সহিত আহার করিতে লাগিল। মধ্য, মধ্য দুই একটি হাসির শব্দও শোনা যাইতে লাগিল। আহার শেষ করিয়া শরৎচন্দ্র, সহচরদ্বয়কে বলিল—“তোমরা একটু বোস’। আমি একবার বাবাকে দেখে, তারপর বাবার আফিস-ঘরে গিয়ে—টাকা-কড়ি সিন্দুকে কত মজুদ আছে, ব্যাঙ্ক বইগুলো কোথায় আছে—এই সব ঠিক করে দেখে চুবি দিয়ে আসিগে। কাউকে তো আজকাল বিশ্বাস করবার যো নেই। ও গোবিন্দবাবুই বল আর রামবাবুই বল, টাকার বেলায় সবাই সমান।”

এই কথা বলিয়া শরৎ, আপন কক্ষ হইতে বাহির হইয়া বরাবর পিতার শয়নকক্ষে উপস্থিত হইল। যাইবার পথে—মাতার কণ্ঠ-নিঃসৃত উচ্চ ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া বুঝিল যে, পিতা দেহত্যাগ করিয়াছেন। সে পিতার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে, তাহার পিতার দেহ খাট হইতে ভূমীতে নামাইয়া রাখা হইয়াছে এবং তাহার শবদেহের পদতলে, ভূমীর উপর লুটাইয়া পড়িয়া তাহার মাতা হৃদয়-ভেদী উচ্চ-শব্দে কাঁদিতেছেন। পরিচারিকাদ্বয়, মাতার দুই

ডুল-ভান্সা

পাশে বসিয়া আছে এবং ফোঁপাইয়া, ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছে। দীলু, তাহার মাঠাকুরাণীকে অর্থাৎ মোক্ষদাসুন্দরীকে মধ্য মধ্য, সাধনা বাক্যে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং নিজেও অল্পচ-
স্বরে কাঁদিতেছে।

ক্রন্দনের স্বর কাণে প্রথম পৌছাইতেই শরৎচন্দ্র মনে মনে বিরক্ত হইয়াছিল; এক্ষণে এই কক্ষে প্রবেশ করিয়া সকলের এইরূপ ক্রন্দন দেখিয়া সে আরও বিরক্ত হইয়া উঠিল। বিরক্তির আতিশয্যে মুখটিকে পাঁচার মুখের মত বিকৃত করিয়া শরৎচন্দ্র মাতাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—“মা, ওমা, আর কেঁদনা; যে গেছে সে আর ফিরবেনা—হাজার কান্নাকাটি ক’রে কেউ কখন ফেরাতে পারেনি। মিছে আর কেঁদনা।”

শরতের কণ্ঠস্বরে মোক্ষদাসুন্দরী একবার উর্ধ্বে মুখ তুলিলেন এবং শরৎকে দেখিয়া আরও অধিক উচ্চৈশ্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে ভূমীতে পুনরায়, মুখ গুঁজড়াইয়া পড়িলেন। তাহার সঙ্কল্প ক্রন্দনে বুঝিবা পাষণ্ড ফাটিয়া যায়। শরৎচন্দ্র মাতার নিকট একটু অগ্রসর হইয়া বলিল—“তবুও কের কাঁদতে লাগলে। বুড়ো মাগী হ’লে, এত জানলে, তত জানলে—আর এইটা জানলে না যে, যে মরে যায় সে আর কিছুতেই ফেরে না। এই সামান্য কথাটুকু মনকে বোঝাতে পারলে না—এমন একটু মানসিক বল নেই ছাট যে এই সামান্য কথাটুকু মনকে বোঝাতে পার? নাও ওঠ, ঢের হরেছে, আর কেঁদে কাজ নেই। পতিশোকরূপ কুসংস্কারের বশবর্তী হ’য়ে তুমি আত্মবিস্মৃতা হোওনা; আত্ম-সম্মান হারিওনা। তুমি

ভুল-ভাঙ্গা

কার পত্নী ছিলে এবং কার মা তুমি সেটা ভুলে যেওনা। গরীব, দুঃখী আর চাষা-ভূষার মতন অমন ক'রে কেঁদনা। মা ক'রছ কি! তবুও ঐ অসভ্যতাময় কুসংস্কারপূর্ণ-কাণ্ড কঁাদছ! চারিদিকে যে শত্রু হাসছে। ঐ শোন, মানস-কর্ণে ভাল ক'রে শোন—তোমার এই অশিক্ষিতা ও বর্বরার মতন ব্যবহারে, তোমার এই সামান্য পতিশোক জনিত গুরুতর চিৎকারে চারিদিকে শত্রুরা সব হাসছে আর বলছে যে—‘এত বড়লোকের স্ত্রীর আর মহাসভ্য ও শিক্ষিত এত বড়লোকের মার মানসিক বল নেই আর কুসংস্কারে তার হৃদয়টা পূর্ণ।’ মা, ওঠ, ওঠ, আর শত্রু হাসিও না; আর হৃদয়ের দুর্দলতা দেখিও না। এই সভ্যতা ও জ্ঞানালোক বিস্তারের কালে সেকালের সেই সকল কুসংস্কারাচ্ছন্ন-হৃদয় অবলা নারীদের মতন—পতিশোকে কাতরা হোওনা। অসভ্য, ভীল, কোল, সাঁওতাল, এল আফ্রিকার আদিম অধিবাসীদের মতন কুসংস্কার দেখিওনা। তবুও কঁাদছ—আমার কথা শুনলে না! আমি যে এতটা বোকে মলুম এর কোনই ফল হ'ল না? তোমার কাছে যে যুক্তিপূর্ণ কথাগুলো বললুম, এইগুলো যদি কলেজ ধোয়ার কি বিতর্ক ... একটা টুলের ওপর দাঁড়িয়ে বলতুম তাহলে ধন্য, ধন্য রব ... আর কতলোক যে শিক্ষা পেয়ে উদ্ধার হয়ে যেত তার আর ঠিক-ঠিকানা হোতনা। তুমি নেহাৎ গাড়ল তাই এগুলো বুঝলে না। তোমার এই গাঁ, গাঁ চিৎকারে আমার মাথা কাটা যাচ্ছে। এর পরে আমি লোকের কাছে মুখ দেখাব কি ক'রে? ছিঃ ছিঃ এখনও কঁাদছ! এখনও কথা শুনলেনা? বর্বরো, ঘোর-বত্তা, অনাচার-কত্তা

তুমি আমার বা হবার উপযুক্ত নও।” এই কথা বলিয়া প্রবল বায়ুতে বেতস গত্রের বত—ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে সভা, ভবা, নবা শরৎচন্দ্র, সেই কক্ষ হইতে সবেগে প্রস্থানোক্ত হইল।

পতিশোকাতুরা হিন্দু-মহিলা মোক্ষদাসুন্দরী শোকে আচ্ছন্ন ছিলেন তাই পূত্রবরের উপরোক্ত কথাগুলি তাহার কাণে প্রবেশ করে নাই, এই যা মঙ্গল—নচেৎ, স্বীয় গর্ভজাত পুত্রের মুখে এরূপ সময়ে এইরূপ কথা শুনিয়া নিশ্চয়ই তিনি হতাশে মারা যাইতেন।

শরৎচন্দ্র যখন উপরোক্ত কথাগুলি বলিয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করে সেই সময়ে তাহার কথার শেষ অংশটি সে খুব চিৎকার করিয়া বলে। তাহার চিৎকারে একবার ক্ষণিকের জন্য মোক্ষদাসুন্দরীর আচ্ছন্ন-ভাবটা কাটিয়া যায়। তিনি মুখ তুলিয়া চাহিয়া শরৎকে দেখিতে পাইয়া, আবেগভরে কাঁদিয়া বলিলেন—“ওরে বাবা শরৎরে, আমাদের কি সর্বনাশ হ’লরে। ওরে অভাগা, তোর আর আমার কি সর্বনাশ হ’লরে বাবা।”

শরৎ প্রস্থান করিতেছিল; মাতার এই কথা শুনিয়া সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সরোষে বলিল—“কে তোমাকে ব’লে যে আমাদের সর্বনাশ হইছে। ওগো ‘বুদ্ধির-ভুড়ভুড়ী, বিজ্ঞের-ঝুড়ি’ তোমার বা আমার কোনও সর্বনাশ হয়নি। বাবা যদি কিছু টাকা কড়ি না রেখে মারা যেত তাহলে নাইবা তুমি কি সর্বনাশ হ’লরে; ওরে বাবারে আমাদের কি সর্বনাশ হ’লরে ব’লে—চিৎকার ক’রতে আর আমিও হয়ত বা তাতে সাহা দিতুম। বাবা যখন লক্ষ, লক্ষ টাকা রেখে মারা গেছেন তখন এতো সুখের মৃত্যু; এতে আবার সর্বনাশটা কোনখানে; এতে আবার দুঃখই বা কোথায়? তুমি অশিক্ষিতা, তাই এই সুখের বিপরীত দুঃখের

ভুল-ভাষা

দুঃখপ্ৰ দেখছ। এই কন্ডেই মেয়েদের বিশেষ রকমে শিক্ষিতা করা দরকার। শিক্ষা পেলে তবে হিতাহিত জ্ঞান হয়, কোনটা নিজের পক্ষে ভাল, কোনটা মন্দ—সেটা বুঝতে পারে। তুমি যদি Economics (অর্থশাস্ত্র) পড়তে তাহলে বুঝতে পারতে যে, বাবার মৃত্যুতে তোমার কতটা সুবিধে হয়েছে। তুমি অশিক্ষিতা, অসভ্যা তাই এ কথাটা বুঝতে না পেরে ‘হাউ-হাউ’ করে কাঁদছ। তুমি শিক্ষিতা আর আলোক-প্রাপ্তা হোলে নিজের এই লাভের-ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আনন্দ করতে; অন্ততঃপক্ষে—লোক দেখানর জন্য নানা রকম সু-কায়দাপূর্ণ, সভ্য-রকমের, ভদ্র-রকমের শোক ক’রতে।”

এই কথা বলিয়া শরৎচন্দ্র, সেখানে আর ক্ষণমাত্রও অবস্থান না করিয়া সভাতা-গর্বে ক্ষীত হইয়া সদর্পে বাহির হইয়া, তাহার পিতার অফিস-কক্ষে চলিয়া গেল। অফিস-কক্ষে প্রবেশ করিয়া সুইচ টিপিয়া টেবিলের উপরিস্থিত ক্ষুদ্র টেবিল-লাইটটি জ্বালাইয়া—পিতার ডেস্ক, হাত-বাক্স, টেবিল, দেয়াজ প্রভৃতির অভ্যন্তরস্থিত কাগজ-পত্র পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিল।

ষাদশ পরিচ্ছেদ ।

সকলের সনিবন্ধ-অনুরোধ, অনুনয়, বিনয়, সকাভর-প্রার্থনা প্রভৃতি উপেক্ষা করিয়া শরৎচন্দ্র দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া বলিল—“আজ রাত্রে কোনও মতেই বাবার মৃতদেহ পোড়াতে দোব না। তা সে যেই কেন অনুরোধ করুক না, আজ কিছুতেই বাবার মৃতদেহ বাড়ী থেকে বের ক’রে নিয়ে যেতে দোব না।”

এই ভীষণ সংবাদে সকলে স্তম্ভিত ও মর্ম্মাহত হইয়া গেল। গোবিন্দ বাবু, শব লইয়া যাইবার নিমিত্ত পল্লীস্থ দুই চারিটি ভদ্রলোককে ডাকিতে গিয়াছিলেন; তিনি তাঁহাদের সঙ্গে লইয়া বাটিতে প্রত্যাগমন করিয়া উক্ত ভীষণ সংবাদ শুনিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িলেন। মাথার হাত দিয়া খানিকটা কি ভাবিয়া তিনি—শরৎ কোথায় আছে—এই কথা পরিচারকদের জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে—শরৎ তাহার পিতার অফিস-কক্ষে অবস্থান করিতেছে। এই সংবাদ অবগত হইয়া তিনি, সমাগত ভদ্রলোকদিগকে—কণেক অপেক্ষা করিতে বলিয়া, ‘সেস্থান হইতে প্রস্থান করিয়া একেবারে দ্বিতলে উঠিয়া নবীনটাদের অফিস-কক্ষে উপস্থিত হইলেন।

সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, শরৎ তাহার পিতার হাত-বাক্স খুলিয়া তন্মধ্যস্থিত কাগজ-পত্র মনযোগ সহকারে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছে। শরৎচন্দ্র একটি ডেকের সম্মুখে একখানি চেয়ারে বসিয়াছিল।

ভুল-ভাগ্য

গোবিন্দবাবু তাহার নিকটে গিয়া বলিলেন—“ই্যা বাবা. শরৎ এ কি অসম্ভব আদেশ দিয়েছে ? উপায় থাকতে তৌমার বাবার মৃতদেহের সংস্কার ক’রতে বাধা দিও না। তিনি রাত্রে প্রথম প্রহরেই মারা গেছেন ; তাঁর মৃতদেহ আজ রাত্রেই পুড়িয়ে ফেলা চাই। নইলে বাঁসী-মড়া ক’রে তাঁর দেহকে রেখে দিলে মহাদোষ হবে।”

শরৎচন্দ্র বলিল—“দোষ হয় হবে। বাবার মৃতদেহ আজ রাত্রে পুড়িয়ে ফেললে কাল যখন তাঁর সাহেব-সুবো বন্ধু বা তাঁর সভ্য এদেশীয় বন্ধুরা তাঁর মৃতদেহের প্রতি শেষ সম্মান দেখাতে আসবে তখন আমি কি ক’রে বাবার মৃতদেহ হাজির ক’রব। শাস্ত্র-সমাজের নিয়মানুসারে উচিত হচ্ছে যে, কোনও লোক মরে গেলে তার মৃতদেহ বেশ ক’রে সাজিয়ে গুজিয়ে, গন্ধদ্রব্য মাখিয়ে অন্ততঃপক্ষে দুই তিন দিন রেখে দেওয়া—কারণ এই কয়দিনের মধ্যে মৃত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবরা তাকে শেষ-দেখা দেখে যাবে। এই সকলের পর তবে মৃত ব্যক্তির অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া হবে এবং সে উৎসবে সকলেই যোগ দিতে অবসর পাবে। আমি, আপনাদের কথা শুনে আজ রাত্রেই বাবার মৃতদেহ যদি পুড়িয়ে ফেলি—তাহলে কাল কি পরশুদিন যখন বাবার সুসভ্য বন্ধুগণ সভ্যতা প্রকাশের জন্য আর এটিকেট বজায় রাখবার জন্য বাবার মৃতদেহকে শেষ-দেখা দেখতে এসে শুনবেন যে, সে মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে তখন তাঁরা কি মনে ক’রবেন। তাঁদের ঘৃণা-মাখান-বিস্মিত চক্ষু যখন নীরবে, আমার এই বর্বর ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা ক’রবে তখন আমি কি উত্তর দোব। বাবার মৃত্যু সংবাদ শুনে আমার ভূতপূর্ব গৃহশিখাক-নিশ্চয়ই আসবেন। তিনি এসে যখন—‘আমার এতদিনের

ভুল-ভাঙ্গা

শিক্ষাদানের কি এই অসত্য ফল হ'ল'—এই কথা ব'লে আমার সুসভ্য ভৎসনা ক'রবেন তখন আমি তার কি কৈফিয়ৎ দোব ? না গোবিন্দবাবু এ কাজ আমি করতে পারব না। আমার মাপ করবেন—এ রকম ভয়ানক, বিভৎস-কাজ আমার দ্বারা হবে না।”

গোবিন্দবাবু অবাক হইয়া সব কথাগুলি শুনিতেছিলেন। শরৎচন্দ্রের কথা শেষ হইলে, তিনি সকাতির বলিলেন—“শরৎ তুমি নিজেকে শিক্ষিত ব'লে, জ্ঞানী ব'লে পরিচিত কর অথচ এ কি নির্বোধের মতন কথা ব'লছ। তুমি ওসব যা বললে তা অন্য সমাজে হতে পারে। হিন্দুর ঘরে কি ওসব চাল চলে ? হিন্দুর ঘরে কখনও কি তিন দিন মড়া ফেলে রাখে ? দোহাই তোমার এই রকম ভীষণ অন্তার কাজ ক'রনা।”

শরৎচন্দ্র বলিল—“এতে আমার কিছু অন্তায় নেই। যদি কিছু অন্তায় থাকেতো তা আপনার হিন্দুধর্মের অন্তায়। আপনার অতি-প্রিয় ঐ হিন্দুধর্ম ব্যবস্থা দিচ্ছে যে, বাসী মড়া ক'রনা অথচ আবার বলছে যে মড়া পুড়িয়ে ফেলবে। এ ব্যবস্থাটা গাধার মতন ব্যবস্থা হয়েছে। এই গাধার মতন ব্যবস্থার জন্মেই আমি, আপনার সাদা চুলের অপমান ক'রতে বাধ্য হ'লুম। আপনার হিন্দুধর্ম যদি মৃতদেহ না পুড়িয়ে মাটিতে পুঁতে ফেলবার ব্যবস্থা দিত তা হলে আমি না হয় আপনার কথার সম্মত হ'য়ে বাবার মৃতদেহকে বাসী মড়া না ক'রে আজ রাত্রেই পুঁতে ফেলে তাঁর অন্তেষ্টিক্রিয়া সমাধা ক'রে আপনাদের হিন্দুধর্ম রক্ষা ক'রতুম। তারপর কাল কি পরশু যখন বাবার সভ্য বন্ধু বাকবরা আসত' তখন মাটি খুঁড়ে গোর থেকে বাবার মৃত দেহটা বের ক'রে ঘরে এনে সাজিয়ে রেখে সবাইকে দেখাতুম—তারপর আবার মাটিতে পুঁতে ফেলতুম। এতে

তুল-ভাঙ্গা

সব দিকই রক্ষা হোত। ই্যা, বড় জোর—দুই, চারবার খোঁড়াখুঁড়ি আর পোতাগুঁতির জন্তে মৃতদেহটার ওপর খোঁস্তা আর কোদালের আঘাত লেগে খানিকটা কেটে যেত। তা বোধ হয় আপনার জানা আছে যে, মরা মানুষের গায়ে আঘাত লাগলে তার কোনও কষ্টই হয় না। আপনি যান, যান—আপনার হিন্দুধর্মের বিধানদাতাদের এই মুখমীর কথা ভেবে এখনও এই হীন ধর্ম আশ্রয় ক’রে আছেন ব’লে অনুতাপ করুনগে। ওঃ কি অস্তায় কথা বল দেখি—‘গোর দেওয়া হবে না, পুড়িয়ে ফেলতে হবে অথচ লোকে শেষ-দেখবার জন্তে অবসর পাবে না, —তখনই পুড়িয়ে ফেলতে হবে ; দুই একদিন ঘরে রাখলে বাসী মড়া হবে—মহা অস্তায়, মহা দোষের কথা। আরে বাবু যদি পোড়াবারই ব্যবস্থা দিলি তাহলে—লোকে যাতে দু’চারদিন ঘরে মড়া রাখতে পারে তার ব্যবস্থা দেওয়া উচিত ছিল। ও বাসী মড়ার ফ্যাচাঙ ভোলা উচিত ছিল না। আর যদি বাসী মড়ার ফ্যাচাঙই তুললি তা হলে গোর দেবার ব্যবস্থা দেওয়া উচিত ছিল। ওঃ কি ভয়ানক এই ব্যবস্থা ওঃ কি ঘোর মুর্থতা।” শরৎচন্দ্রের কথা শুনিতে, শুনিতে গোবিন্দবাবু মহা উত্তেজিত হইয়া যাইতেছিলেন। তিনি উত্তেজিত ভাবে বলিলেন—“তবে কি কোনও উপায় নেই? তোমার অনুদাতা পিতাকে, আমার প্রিয়তম বন্ধু ও স্নেহময় মনিবকে একান্তই কি বাসী মড়া হ’তে হবে? আমি তোমার চেয়ে বয়েসে অনেক বড়—আমার এই অকুরোধটি রাখ। দোহাই তোমার, আমার এই”—এই পর্য্যন্ত বলিয়া গোবিন্দবাবু আরু কথা কহিতে পারিলেন না। তাঁহার কণ্ঠের গাঢ় হইয়া গেল ; দুই চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল।

ভুল-ভাঙ্গা

শরৎচন্দ্র দৈবৎ প্রবেশের সহিত, বলিল—“এঃ আপনি দেখছি মেরে-মাছুষেরও অধম। কথা কইতে, কইতে বুড়ো মিলে প্যান্-প্যান্ ক’রে কেঁদে ফেললেন যে। আচ্ছা মুন্সিলে গড়লুম দেখছি। ও,— শুনছেন ও গোবিন্দবাবু, আমি শেষ এক কথা বলে দিচ্ছি, শুনুন। দেখুন, আমি মনে করেছিলুম যে, সকলকে শেষ দেখবার সুযোগ দেবার জন্যে বাবার মৃত দেহটা তিনদিন বাড়ীতে রাখব। তা এখন আপনার অনুরোধে আমি এই পর্যন্ত ক’রতে পারি যে, আজই কয়েকজন বিশিষ্ট লোককে চিঠি লিখে জানিয়ে দোব যে, তাঁরা যেন কাল ছপূর বারটার মধ্যে এখানে এসে বাবার মৃত দেহকে শেষ দেখে যান। তারপর কাল বেলা একটার সময় বাবার দেহ শ্মশানে নিয়ে যেতে দোব। কিন্তু একটা কথা, আমাকে যদি বাবার মৃতদেহ নিয়ে শ্মশানে যেতে হয় তাহলে আপনারা কিন্তু ঐ হরিবোল, হরিবোল ব’লে গাঁ-গাঁ শব্দে চিৎকার ক’রতে পারবেন না। কারণ, আপনাদের ঐ হরিবোল, হরিবোল রব শুনে আমার বড়ই অস্বস্তি বোধ হয়, বুকের ভেতরটা গুরু গুরু ক’রে ওটে। ই্যা আরও এক কথা, আমি শ্মশানে বাবো, কিন্তু দিনের আলো থাকতে, থাকতে শ্মশান থেকে কিরে আসতে হবে, অন্ধকার হ’লে গেলে আমি আর এক মিনিটও সেখানে থাকব না—তা সে বাবার দেহের সংস্কার হোক আর নাই হোক। আমি সব কথা আগে থাকতে বলে দিচ্ছি; এই সব বুঝে কাজ করবেন। যান, এখন যান; আমার প্রস্তুত হতে দিন, আগামী কাল সকল লোকের কাছে শোক প্রকাশ করবার জন্যে আমার প্রস্তুত হোতে দিন।”

গোবিন্দবাবু চীৎকার শব্দে বলিয়া উঠিলেন—“এ আমি কি শুনছি;

ভুল-ভাঙ্গা

এই সব পাপ কথা শোনবার জন্যে আমি এখনও বৈতে আছি। বন্ধু, প্রভু স্বর্গ থেকে দেখ, তুমি কি রত্ন-স্বেচ্ছায় তৈরী ক'রে গেছ, একবার দেখ। শরৎ তুমি এ সব বলছ কি! তোমার বাপ এই মাত্র দেহ রেখেছেন আর তুমি তাঁর জন্তে শোক দুঃখ না করে এ কি—”

গোবিন্দবাবুর মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না। দুঃখে, ক্ষোভে, যুগার তিনি আর মাথার ঠিক রাখিতে পারিলেন না। সদ্য মৃত প্রিয় বন্ধুর ও প্রতিপালক প্রভুর মৃত দেহের পরিণাম দেখিয়া তিনি বিচলিত হইলেন। দুঃখ, বিরক্তি ও নিষ্কল-ক্রোধের আবেগে তাঁহার সমগ্র দেহ কাঁপিয়া উঠিল। চক্ষু তারকা কপালে উঠিয়া গেল। তিনি সবেগে দুই হাত উর্দ্ধে তুলিয়া, উর্দ্ধ মুখে স্বর্গগত প্রভুর উদ্দেশে কি বলিতে গেলেন কিন্তু তাঁহার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া গেল। তিনি ঐরূপ অবস্থায় থবু-থবু করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন।

শরৎচন্দ্র সহসা গোবিন্দবাবুর এই ভাবান্তর দেখিয়া একটু ভীত হইল। সে ভীত ও বিস্মিত চিত্তে, গোবিন্দবাবুর উক্ত প্রকার অবস্থা দেখিতে, দেখিতে দেখিল যে—গোবিন্দবাবু উর্দ্ধ মুখে ও উর্দ্ধ হস্তে থবু-থবু করিয়া কাঁপিতে, কাঁপিতে, দুই একবার মাথা নাড়িয়া অবশেষে গোঁ, গোঁ করিতে লাগিলেন। তাঁহার চক্ষু দুইটি ঘোর লাল হইয়া উঠিয়াছে এবং মাথার সমস্ত চুলগুলি খাড়া হইয়া রহিয়াছে। সহসা একবার তাঁহার মুখ-নিঃসৃত গোঙানি-রব থামিয়া গেল এবং তাঁহার ঠোঁট দুইটি নড়িয়া উঠিল বটে কিন্তু কোন কথা বাহির হইল না—দুই, তিন বার নড়িয়াই থামিয়া গেল এবং তিনি পূর্বের মত অবস্থায় আরও বেশী জোরে গোঁ গোঁ করিতে লাগিলেন।

ভুল-ভাঙ্গা

এই দৃশ্যে শরৎচন্দ্র মহা ভীত হইয়া উঠিল এবং সে কেমন একটা অস্বাভাবিক অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতে লাগিল; তাহার সর্বদা ঘামিয়া উঠিল। “গোবিন্দবাবুর ঐ রকম অবস্থা হঠাৎ কেন হ'ল” এই কথা ভাবিতে গিয়া চকিতে তাহার মনে হইল যে, “তাহার পিতার প্রেতাত্মা গোবিন্দবাবুর দেহে ভর করে নাইত? বোধ হয় করিয়াছে নচেৎ গোবিন্দবাবুর হঠাৎ এ রকম ভূতে-পাওয়ার-অবস্থা হবে কেন?” চকিত মনো যেইমাত্র তাহার মনে এই কথা উদ্ভিত হইল অমনই তাহার অন্তর শিহরিয়া উঠিল। সে তখন তাহার সেই ‘সর্বদা গ্যাড্-ম্যাড্ উচ্চারণ করা মুখে মামুলী ও পৈতৃক বুলি ‘বাবারে-মারে’ বলিয়া আর্ন্তনাদ করিয়া সেই ঘর হইতে পলায়ন করিতে উদ্যত হইল। সে, যে চেয়ারের উপর বসিয়াছিল সেই চেয়ারের উপর তড়াক করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সম্মুখে অবস্থিত ভেকস্টি অতিক্রম করিবার মানসে, সেই চেয়ারের উপর হইতে সবেগে লম্ফ প্রদান করিল। ভয়ের মাত্রাধিক্যে তাহার লম্ফের বেগের মাত্রাটাও আধিক্য প্রাপ্ত হইয়াছিল সেইজন্য এত মাত্রাধিক্য বরদাস্ত করিতে না পারিয়া তাহার দেহ বেচারা সামান্য দিতে অক্ষম হইয়া উন্টাইয়া পড়িল—শরৎচন্দ্র সম্মুখস্থ দেয়ালের নিকট ঘাওঁ-মাথা গুঁজড়াইয়া পড়িয়া গেল ও তাহার মস্তকটি সজোরে দেয়ালে ঠুকিয়া গেল।

এই ভাবে পড়িয়া যাওয়াতে শরৎ বেশ জোরে আঘাত পাইল কিন্তু সে আঘাতকে গ্রাহ্য না করিয়া সে পড়িয়া গিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইল এবং বাহিরে পলাইবার মানসে দরজা লক্ষ্য করিয়া ছুটিতে উদ্যত হইল।

ভুল-ভাঙ্গা

শরৎচন্দ্রের এই অস্বাভাবিক চিংকারে এবং পতন শব্দে গোবিন্দবাবুর চমক ভাঙিল; তাঁহার সেই আত্মবিস্মৃত-ভাবটা কাটিয়া গেল। তিনি চমক ভাঙিয়া সম্মুখে চাহিয়া দেখিলেন যে, শরৎ তাড়াতাড়ি কক্ষতল হইতে উঠিয়া সেই ঘর হইতে সবেগে বাহির হইয়া যাইতেছে। শরৎকে বাহির হইয়া যাইতে দেখিয়া তিনি মনে ভাবিলেন যে, ‘আমি যদি শরতের দুইটি পা ধরিয়া ভিক্ষা চাই তাহা হইলে সে আমাদের প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারে’। এই কথা চকিতে চিন্তা করিয়াই, শরতের দুই পা ধরিবার নিমিত্ত তিনি দুই হস্ত বিস্তার করিয়া পলায়নমান শরতের দিকে সবেগে অগ্রসর হইলেন।

সজোরে ভূমে পতিত শরৎচন্দ্র ভূতের ভয়ে—আঘাত-নিবন্ধন-বিষম-যন্ত্রণাকেও উপেক্ষা করিয়া এবং গাত্রের ধূলা পর্য্যন্ত না ঝাড়িয়া যেইমাত্র সেই ঘর হইতে পলাইবার জন্ত দ্বার লক্ষ্য করিয়া সবেগে ছুটিয়া পাঁচ ছয় পদ অগ্রসর হইয়াছে, অমনই দেখিল যে, গোবিন্দবাবু ভীষণ মৃদুভাৱে, দুই হাত বিস্তার করিয়া তাহার দিকে সবেগে অগ্রসর হইতেছেন। এই দৃশ্য দেখিয়া শরৎচন্দ্র মনে ভাবিল যে, ‘তাহাকে জাপ্টাইয়া ধরিয়া তাহার মৃণুটি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিবার জন্ত ভূতে-পাওয়া-গোবিন্দবাবু ঐ রকম ভাবে অগ্রসর হইতেছে।’ ভূতের ভয়ে সভ্য ও শিক্ষিত শরৎচন্দ্র পলাইতে গিয়া এইরূপ ভাবে বাধা প্রাপ্ত হইয়া আরও ভীত হইয়া আরও জোরে আর্তনাদ করিয়া উঠিল। তাহার শিক্কা, দীক্কা, সভ্যতা লঙ্ঘ্য পলায়ন করিল। সে দুই একবার যাঁ, যাঁ করিয়া একটা অস্পষ্ট কথা উচ্চারণ করিয়া সেটাহানে মূর্ছিত হইয়া পড়িল।

তাহার চিংকারে আকৃষ্ট হইয়া নিরতল হইতে কয়েকজন পারিচারিক

ভুল-ভাঙ্গা

এবং শরতের সহচরদ্বয় হরিচরণ ও মাধব তথায় ছুটিয়া আসিল। গোবিন্দ-বাবুর আদেশে দুইজন পরিচারক এক ঘটি জল ও একখানি পাখা লইয়া আসিল এবং শরতের মুখে, চোখে জল ছিটাইয়া দিয়া পাখার বাতাস করিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে শরতের লুপ্ত জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। সে চক্ষু মেলিয়া পিট-পিট করিয়া চারিদিক দেখিতে লাগিল। তাহাকে চক্ষু মেলিতে দেখিয়া গোবিন্দবাবু সমরোপযোগী হর্ষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—“জয় ভগবান, এই যে চোখ চেয়েছ। কি হয়েছিল বাবা তোমার? হঠাৎ এ রকম মুচ্ছা গেলে কেন?”

শরৎ শ্বেষ সহকারে এবং একটু মুখ ভাঙ্গাইয়া বলিল—“কি হয়েছিল বাবা তোমার! ঠাকা আর কি, যেন কিছুই জানেন না। আপনার জন্তেই তো আমার এই দশা হোল’—আর আপনি জেনে শুনে ঠাকা সাজছেন!”

গোবিন্দবাবু বলিলেন—“রাম, রাম—কি বলছ বাবা তুমি! আমি তোমার—”

শরৎচন্দ্র বলিল—“যাক আর কথা বাড়িয়ে কাজ নেই। আপনার মনস্কামনা তো পূর্ণ হয়েছে। যান, এখন উত্তোগ আয়োজন করুনগে যান; বাবার মৃতদেহ এখনই পুড়িয়ে আসা যাক। আপনি সব ঠিক-ঠাক ক’রে যাবার সময় আমার ডেকে নিয়ে যাবেন।”

গোবিন্দবাবু এই অপ্রত্যাশিত কথা শুনিয়া আর তথায় দাঁড়াইলেন না। স্বচ্ছন্দমনে তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেলেন। পরিচারকগণ তাহার অনুগমন করিল। শরতের সহসা এইরূপ ভাবান্তর দেখিয়া

ভুল-ভাগ্য।

গোবিন্দবাবু প্রভৃতি সকলেই বিস্মিত ও বিশেষ কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন ; কিন্তু কেহই মুখ ফুটিয়া কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। শরৎচন্দ্র ধীরে, ধীরে উঠিয়া বসিল এবং হরিচরণ ও মাধবকে ডাকিয়া লইয়া, তিন জনে তিন খানি চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ।

শরৎ পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া সহচরদ্বয়কে দুইটি দিয়া নিজের একটি ধরাইয়া লইয়া বলিল—“জাখ বড়ই মুন্সিলে প’ড়ে আগায় বাধা হ’য়ে আজই বাবার মৃতদেহ পোড়াবার অনুমতি দিতে হ’ল। বাধা হ’য়ে ঐ সব অসভ্য রীতিগুলো পালন ক’রতে হ’ল। বাবা তো সভ্য ছিলেন না তাই আমি যে কেন তাঁর মৃতদেহ দুই তিন দিন রেখে দিতে চাইছিলুম তাঁর মর্ষ বুঝলেন না। তিনি নেহাৎই-সেকালে, অসভ্য লোক ছিলেন তাই আমাদের আজকালকার সভ্য রীতি-নীতিগুলো তাঁর পছন্দ হ’ল না—তাই ঐ গোবিন্দবাবুর ঘাড়ে ভর ক’রে আমায় একবার ভর দেখিয়ে গেলেন। তা দেখ “যশ্বিন দেশে যদাচার”—ও ভূতকে ঘেঁটিয়ে কাজ নৈই, সে যে রকম চাইচে সেই রকমই করা যাক। দেখ যদি ‘অসভ্য-মানুষ’ হোত তাহলে না হয় তাকে বুঝিয়ে, সুঝিয়ে আজকালকার এই নবযুগের-উপযোগী-জ্ঞান দান ক’রে সভ্য ক’রে তুলতুম—এ ‘অসভ্য-ভূত’ একে সভ্য করি কি ক’রে?”

হরিচরণ ঈষৎ হাসি করিয়া বলিল—“আপনার বোধ হয় মনের ভুল হ’লে কি দেখতে কি দেখেছিলেন।”

শরৎচন্দ্র মহা কুপিত হইয়া বলিল—“হ্যাঁ মনের ভুল বই কিরে মূর্খ্য। যদি সেখানে তখন থাকতে তাহলে ব্যাপার বুঝতে পারতে। অন্য জায়গা থেকে সকলেই ওরকম ‘মনের ভুল ব’লে’ সাহস দেখাতে পারে।

ভুল-ভাঙ্গা

আমি কি একটা গাধা যে, ঠিক না বুঝে, মনের ভুলে অমনই যা, তা একটা ভেবে নিয়েছি। এখন ওসব কথা থাক, তোমাদের সঙ্গে বিশেষ একটা পরামর্শ আছে, শোন।”

এই কথার পর তিনজনে মিলিয়া কিছুক্ষণ ধরিয়া কি পরামর্শ করিল। শরৎচন্দ্র কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিল, ঐ দুই ভ্রাতার পর্যায়ক্রমে তাহার উত্তর করিল; এইভাবে কিছুক্ষণ কথাবার্তা ও তর্কাতর্কির পর শরৎচন্দ্র বলিল—“তোমরা যা বললে আমারও মনের ইচ্ছে তাই। আমি এ কথা আগে থেকে ভেবেও রেখেছি। যে রকম ব্যাপার দাঁড়াল তাতে আমি বাবার মৃতদেহের সৎকার আর শ্রাদ্ধশাস্তি প্রভৃতি কাজ ঠিক নিয়ম মত ক’রে যাবো। এখন একটু কষ্ট হবে বটে কিন্তু তারপর একেবারে চিরদিনের মতন নির্ভাবনা হওয়া যাবে। শ্রাদ্ধ-শাস্তি সব ঠিক নিয়ম মত হ’য়ে গেলে তখন আর ভুতের ভয় থাকবে না।”

স্বরচিত্রণ বিজ্ঞের মতন মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল—“নিশ্চয়ই না। মানুষ মরে গিয়ে প্রথমটায় ভূত হ’য়ে একটু-আধটু এদিক-ওদিক ঘোরে বটে কিন্তু শ্রাদ্ধ-শাস্তি হ’য়ে গেলে তখন একেবারে এ তল্লাট ছেড়ে চলে গিয়ে হয় স্বর্গে ব’সে মাল-টাল টেনে অপরীদের সঙ্গে প্রেমালাপ করে, আর না হয়তো নরকে গিয়ে সেখানকার কাজ-কর্ম বিনা-মাইনের করে আর বম-ছুতদের চোখে ধুলো দিয়ে কি করে কাজে ফাঁকি মারবে, সেই মতলব আঁটে। দেখুন, এখন এই কটা দিন আপনি হিন্দুরানী মতে সব ক্রিয়া কর্ম সেয়ে ফেলুন তাহলেই আপনার বাবার প্রেতস্থ মোচন হয়ে যাবে। তখন আপনি মনের সাথে বিলিভী-চাল চালুননা—কোনও মিঞা বাধা দিতে আসতে পারবে না।”

শরৎচন্দ্র সত্তরে বলিল—“হ্যাঁ, হাজার অসভ্যতা হ'লেও—উপস্থিত, বাবার মৃত্যুর অন্তে যে, যে বিধান, হিন্দুশাস্ত্রে আছে, একটা বামুনের কাছ থেকে জেনে নিয়ে, ঠিক মতন পালন ক'রে যাব। নইলে আজ যেমন গোবিন্দবাবুর ঘাড়ে ভর ক'রে বাবা আমার মেয়ে ফেলতে আসছিল সেই রকম রেগে-মেগে যদি আবার কোনও দিন আসে তাহলে আমার বিলেতী-চাল একবারে ভাত হয়ে যাবে। ও হিন্দুধর্ম বল; তার আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি যাই বল, সবতেই ঘৃণা দেখাতে আর গালাগাল দিতে প্রস্তুত আছি কিন্তু এই মড়া-সংক্রান্ত কোনও কাজে আমি বাবা এক তিলও বেচাল দেখাতে বা কোনও রকম বিরুদ্ধ-কথা বলতে রাজী নেই। বাবা যতদিন ভূত থাকবে ততদিন আমি বাধ্য হয়ে এই সব বর্করতাময় নিয়ম পালন ক'রে যাব। তারপর এই সব শ্রদ্ধ-শান্তির কাজ চুকে গেলে বাবা যখন আর ভূত থাকবে না তখন এই সবেচ চার গুণ শোধ দোব—ভূত হয়ে জোর ক'রে আমাকে দিয়ে এই সব বর্করতাময় হিন্দুরানীর কাজ করিয়ে নেবার কল খুব ভাল ক'রে জানিয়ে দোব। তখন বাড়ীতে বসে রোজ দু'বেলা মুরগী—মুরগী শুধু—গরু পর্য্যন্ত থাকো; সে সময় বাবা আমার কি ক'রতে পারে তা বুঝবো।”

মাধব সোৎসাহে বলিয়া উঠিল—“কিছুই ক'রতে পারবে না। এখন না হয় ভূত হ'য়ে আছেন ব'লে ভয় করা হচ্ছে—তখন আর ঘোঁড়ার ডিমের কিসের ভয়? তখন আপনি বাড়ীতে বসেই, শুধু মুরগী, গরু কেন—কচ্ছপ, ব্যাঙ, ছুঁচো, ইঁদুর, টিক্‌টিকি, গিরগিটি, এমন কি ইঁদুর-মাটি, আরসোলার-নাদী পর্য্যন্ত খান না; আপনার বাবার, বাবারও ক্ষমতা হবেনা যে, তখন আপনার কোনও অনিষ্ট করে।”

ভুল-ভাঙ্গা

শরৎচন্দ্র বলিল—“এখন ওসব কথা থাক । এখন চল ও-পাপ বিদেয় করে আসা যাক । বাবাকে টপ্ করে পুড়িয়ে আসা যাক চল ।”

হরিচরণ একটু ক্ষুব্ধভাবে বলিল—“তাই চলুন । যখন এরকম হ্যাঙ্গাম উপস্থিত হোল তখন আর সভ্যতা বজায় রেখে কি ক’রে ওই মড়া বাড়ীতে রাখা যায় বলুন । আচ্ছা সাহেবেরা তো পাঁচ, সাত দিন ধ’রে বাড়ীতে মড়া ফেলে রাখে ; কই তাদের তো এ রকম হ্যাঙ্গামায় প’ড়তে হয় না ।”

মাধব মুরুব্বীয়ানা-চালে তাড়াতাড়ি বলিল—“তারা রাখবার প্রক্রিয়া জানে তাই তাদের কোনও হ্যাঙ্গামায় প’ড়তে হয় না । সাহেবদের কাছ থেকে এবার আমাদের ওই প্রক্রিয়াটা শিখে নিতে হবে ; কি বলেন বাবু ? আপনার বাবার মৃত্যুতে ঠেকে শেখা গেল । তাই যাক, তাঁর বেলায় যা হবার হ’য়ে গেল ; এবার আপনার মা যখন মারা যাবেন তখন তাঁর বেলায় সে প্রক্রিয়াটা কাজে লাগান যাবে ।”

শরৎ ব্যস্ত ভাবে বলিল—“না, না, ওসব প্রক্রিয়া-ক্রক্রিয়া শিখে কাজ নেই । ও মড়া সংক্রান্ত কোনও কাজে আর কোনও বেচাল চালব না—এই নাকে কাণে ধর । আমার প্রাণটাই যদি চলে যায়—তাহলে আর আমার চাল চালবার অবসর কোথায় পাব ।”

শরতের কথা শেষ হইতেই মাধব কি বলিতে যাইতেছিল এমন সময়ে গোবিন্দবাবু আসিয়া তাহাদের ডাকিয়া লইয়া গেলেন ।

— — —

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ।

তারপর ?—তারপর শরতের পিভাঠাকুর ৩নবীনচাঁদের অস্ত্রোষ্টিক্রিয়া নিয়মিতরূপে সম্পন্ন হইয়া গেল। তারপর তাঁহার শ্রাদ্ধও একরূপ নিয়ম মত হুইল বটে কিন্তু তাহা দেশী ও বিলাতী ভাবে মিশ্রিত হইয়া একটা খিচুড়ীভাবাপন্ন হইয়া সম্পন্ন হইল। এ শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ-ভোজন হইল, দরিদ্র-নারায়ণদের ভাত করিয়া বিদার দেওয়া হইল এবং কতক নিমজ্জিতকে আসন পাতিয়া ও পাতা পাতিয়া দেশী পাত খাওয়ান হইল আবার কতক নিমজ্জিতকে চেম্বায় টেবিলে বসাইয়া বিদেশী পাত খাওয়ান হইল। একদিন হরিনাম সংকীৰ্ত্তন হইল আবার আর একদিন শরৎচন্দ্রের ভূতপূৰ্ব গৃহ-শিক্ষক ও তাহার স্বর্গীয় পিতার জন কয়েক নব্য, ভব্য, সভ্য বন্ধুগণ মিলিত হইয়া গিয়ানো বাজাইয়া গান ও উপাসনা করিলেন। শরৎচন্দ্র কিন্তু সংকীৰ্ত্তনেও যায় নাট এবং ঐ উপাসনায়ও যোগদান করে নাই। যাহা হউক মোটের উপর নবীনচাঁদের শ্রাদ্ধ বেশ সমারোহ সহকারে হইয়া গেল। পাড়ার পাঁচ জনে বেশ সুখ্যাতিও করিল ; সংবাদপত্রেও ইহার সুখ্যাতি বাহির হইল। তবে দুই এক জন নেহাৎ ঠোটকাটা লোক ঐ খিচুড়ী-ভাবের কথাটা ভরে ভরে উত্থাপন করাতে অন্য কয়েকজন ব্যক্তি তাহাদের একটু দমকাইয়া দিয়া বলিলেন যে—“ও রকম নিয়ম আজকাল সমাজের ভেতর চলে গেছে ; ওতে কোনও দোষ নেই। আজকাল শুধু শ্রাদ্ধ কেন, বিয়ে, উপনয়ন,

ভুল-ভান্সা

অন্নপ্রাশন সবেতেই হিন্দুধর্মেরও আচার-ব্যবহারের আশ্রয় নেওয়া হয় আবার মুসলমান ও খৃষ্টান-ধর্মেরও আচার-ব্যবহারের আশ্রয় নেওয়া হয়। এতে আর দোষ কি ? আজকালকার এই নব-শিক্ষার দিনে এই রকম ক'রলে তবেতো ভ্রাতৃত্বাব দেখান হবে—তবেতো উদারতা দেখান হবে।”

এই কথা শুনিয়া প্রথমোক্ত-শ্রেণীর ঠোটকাটা লোকেরা ভয়ে ভয়ে চূপ করিয়া গেল কিন্তু উহাদের মধ্যে একজন লোক চূপ করিয়া থাকিতে পারিল না। তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—“আচ্ছা খুড়ো যদি তাই হবে তাহলে যাদের কাছ থেকে এই নব-শিক্ষা পেয়েছ কই তারা তো এ রকম খিচুড়ীর কাজ করে না। বরঞ্চ তাদের কাছে গিয়ে, তাদের বিবাহ প্রভৃতি কোনও অনুষ্ঠানে তাদের ধর্মের আচার-ব্যবহারের সঙ্গে আমাদের ধর্মের আচার ব্যবহার মেশাতে বল দেখি, তাহলে তারা মারের চোটে ভোমার ঐ ভ্রাতৃত্বাবকে, অভাবে দাঁড় করিয়ে দেবে। আর সেই রকম হলে তবে যদি উপযুক্ত হয়।”

ঠোটকাটা লোকের এই কথার উত্তরে ঠোটওয়াল বাবুরা কোনও কথা বলিতে পারিলেন না। তাহাদের মুখ হইতে কেবল বাহির হইল—
“র্যাঁ? র্যাঁ?”

এখন কিছুদিন ইহারা এইরূপ “র্যাঁ—র্যাঁ” করিতে থাকুন, আসুন আমরা, আমাদের উপাখ্যানের অনুসরণ করি।

আপনারা প্রথম পরিচ্ছেদে উক্ত ‘শরৎচন্দ্রের চুল কামান পর্বের’ কথা বোধ হয় ভুলেন নাই ? ভূতের ভয়ে শরৎচন্দ্র, তাহার পিতার শ্রদ্ধা প্রভৃতি কার্যের প্রথমটায় বেশ নিয়ম পালন করিয়া যাইতেছিল। ‘কোনও অনিয়ম করিলে পাছে তাহার পিতা ভূত হইয়া আসিয়া তাহার ঘাড়টি

মটকাইয়া দেন তাহা হইলে তাহার এত বড় সম্পত্তিটা ভোগ করা হইবে না এবং প্রাণটাও যাইবে’ এই ভয়ে সে, সমস্ত নিয়ম পালন করিবে বলিয়া দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়াছিল এবং এমনকি তাহার অত সাধের চুল গুলিকে অবধি কামাইয়া ফেলিতে উদ্যত হইয়াছিল। কিন্তু সেই সময় সেই পদ্ম-পুরাণাচার্য্য ও পাতালখণ্ডতীর্থ পুরোহিত মহাশয় স্বয়ং উপদেষ্টক হইয়া বিধান দেওয়াতে সে—তাহা শাস্ত্র-সম্মত স্মৃতরাং আশঙ্কার কোনও কারণ নাই—এই ভাবিয়া তবে সে বিধান গ্রহণ করিয়াছিল। এবং পুরোহিত মহাশয়ের নিকট, ঐরূপ বিধান লওয়ার সম্মান পাইয়া, সে মধ্যে মধ্যে পুরোহিত মহাশয়কে ডাকিয়া আনিয়া, তাহার যে সব কার্য্যে অসুবিধা বোধ হইত, সেই সকল কার্য্য হইতে বিরতির জন্য বিধান ক্রয় করিতে চাহিত। পুরোহিত মহাশয়ও তাঁহার নিজের প্রাপ্য-গণ্ডা বজায় রাখিয়া তবে বিধান বিক্রয় করিতেন। অর্থাৎ যে সকল কার্য্য বাদ দিলে তাঁহার নিজের কোনও আর্থিক ক্ষতি নাই সেই সব কার্য্যের বেলা তিনি তাহা বাদ দিবার অসুমতি দিতেন কিন্তু যে সকল কার্য্য বাদ দিলে তাঁহার পাওনা-গণ্ডা বাদ যায় তিনি সে সকল কার্য্য বাদ দিবার অসুমতি দিতেন না এবং ‘তাহা বাদ দিলে বড়ই অমঙ্গল হইবে’ এইরূপ বক্তব্য প্রকাশ করিতেন।

নবীনচাঁদের মৃত্যুর পর এক বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। এই সময়ের ভিতর তেমন উল্লেখযোগ্য কোনও ঘটনা ঘটে নাই। নবীনচাঁদ অগাধ সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন; শরৎচন্দ্র মনের আনন্দে তাহা ভোগ করিতেছে। নবীনচাঁদের বিলাতী কাপড়ের কারবার পূর্বে যে রূপ চলিত এখন তাহা অপেক্ষা আরও ভাল চলিতেছে। কারণ দেশে এখন

ভুল-ভান্স

এই দ্রব্যের চাহিদা পূর্বাংগে অনেক বেশী পরিমাণে হইয়াছে এবং পিতার মৃত্যুর পর শরৎচন্দ্র এই ব্যবসায়—গোবিন্দবাবুর পরামর্শে—আরও অনেক টাকা ঢালিয়াছে। এখন একমাত্র এই বিলাতী কাপড়ের কারবার হইতে তাহার মাসিক, সমস্ত খরচা বাদে, প্রায় দশ সহস্র মুদ্রা আয় হইত। ইহা বাতীত ব্যাঙ্কে কিছু টাকা জমা ছিল এবং দুইখানি ভাড়াটিয়া বাড়ী ও কিছু টাকার কোম্পানীর কাগজ ছিল। এই সমস্ত হইতে মাসিক প্রায় বারশত টাকা আয় হইত। ইহাদের ব্যবসায়ের আয়ই বেশী, ভাড়াটিয়া-বাড়ী প্রভৃতি হইতে সামান্য আয়ই হইত। ইহার কারণ এই যে নবীনচাঁদ যত উপার্জন করিয়াছেন তাহার বেশীর ভাগ বরাবরই ব্যবসাকার্যে ঢালিয়াছেন; অন্য ব্যবসায় অতি সামান্যই দিতেন। তিনি অগ্র বাবসাটাকে বাড়াইতে চাতিতেন পরে বিয়য় সম্পত্তি বাড়াইবার লক্ষ্যকে মনে স্থান দিতেন।

নবীনচাঁদের মৃত্যুর পর তাঁহার সাম্প্রতিক বিলি-ব্যবহার বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয় নাই। বাটিতে একজন বৃদ্ধ সরকার ছিল, সেই বাটির সব কার্য দেখিত এবং গোবিন্দবাবু ব্যবসার সমস্ত কার্য পরিচালনা করিতেন।

শরৎচন্দ্র খায়, ঘুমায়; সহচরদ্বয়কে লইয়া গল্পগুজব করে; ভাস, দাবা খেলে এবং মদ্যে মদ্যে থিয়েটার দেখিয়া এবং নাটক, নভেল ও গবরের কাগজ পড়িয়া দিন যাপন করে। শরৎচন্দ্রের কোনও ভাবনা নাই, দিবা আরামে দিন কাটিতেছে। ভাল ভাল পোষাক পরিয়া, নানারূপ সুগন্ধি দ্রব্য মাখিয়া, গাড়ী জুড়ী চড়িয়া ও পরচর্চা করিয়া বেশ আনন্দেই আছে। শরৎচন্দ্রের বিলাসিতা এখন চরমে উঠিয়াছে। মাসিক পাঁচ ছয় হাজার টাকার কমে এখন আর তাহার খরচ চলে না।

ভুল-ভাঙ্গা

শরৎচন্দ্রের মাতা মোক্ষদাসুন্দরী এখন পূজা, অর্চনা ও দান, ধ্যান করিয়া দিন অতিবাহিত করিতেছেন। নানারূপ বার-ব্রত করিয়া ও তদুপলক্ষে বহু ব্রাহ্মণ-ভোজন, দরিদ্র-নারায়ন ভোজন করাইয়া ও অর্থ বস্ত্র, তৈজস-পত্র প্রভৃতি বহুবিধ দ্রব্য দান করিয়া অর্থের সদ্যবহার ও মনের যথার্থ তৃপ্তি লাভ করিতেছেন। তিনি যে কেবল এই সকল কার্য লইয়াই ছিলেন, তাহা নহে। প্রয়োজনাতিরিক্ত দাস, দাসী, ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী প্রভৃতি থাকিতেও তিনি সংসারের সমস্ত কার্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। তিনি, অস্তঃপুর-কর্ত্রীর কর্তব্য ঠিকমত পালন করিতেন। পরের উপর সমস্ত নির্ভর করিয়া, নিশ্চিন্ত থাকিতেন না।

তাহাদের বাটির অন্তর-মহলে একটি নাতিবৃহৎ কক্ষ পুরবাসীদের দ্বারা “ভাঁড়ার-ঘর” নামে অভিহিত হইত। সেই ঘরে সংসারের প্রয়োজনীয় অধিকাংশ দ্রব্যই থাকিত। তিনি অতি প্রত্যাষে শয্যাভ্যাগ করিয়া স্নানাদির পর সর্বদা এই ঘরে আসিয়া নিত্য-প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্য নিজের হাতে বাহির করিয়া দিতেন। তারপরে পূর্ব-কথিত ঠাকুর-ঘরে গিয়া নিজের পূজাৰ্চনা করিতেন এবং তৎপূর্বে শ্রীরাধা কৃষ্ণের নিত্য-সেবার যোগাড় নিজ হস্তে করিয়া দিতেন। • পরের উপর ঠাকুর সেবার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন না—থাকিতে পারিতেন না।

ইহা ব্যতীত, বার-ব্রত উপলক্ষে যখন যেমন প্রয়োজন পড়িত তখন তদনুরূপ কৰ্ম করিতেন। বাটির সকলের আহাৰাদির ও স্তম্ভচ্ছন্দতার সংবাদ নিজে লইতেন এবং প্রতিদিন দুইবার পুন্নের আহাৰের সময় তাহার নিকটে বসিয়া খাওয়াইতেন; তা—ইয়ারকি দেওয়া সমাপন করিয়া

ভুল-ভাগ্য

পুল্লের খাইতে আসিতে যত বেলা হউক বা যত রাত্রিই হউক এবং তিনি নিজে যতই কেন পরিশ্রাস্ত থাকুন না।

সারাদিবসের কার্যের পর সন্ধ্যাকালেও, তিনি আলস্যে না কাটাইয়া—পুরাণপাঠ শ্রবণ করিতেন। একজন সু-ব্রাহ্মণ প্রতিদিন সন্ধ্যার পর নানারূপ ধর্ম-গ্রন্থ পাঠ করিতেন এবং মোক্ষদাসুন্দরী ও তাঁহার দুই বিধবা ভগ্নী এবং—এমন কি তাঁহার স্ত্রীর পূণ্যবতী মহিলার সংসর্গের শুণে—বাটীর দাসী প্রভৃতি অন্তঃপুরস্থ সকলেই সেই পাঠ শ্রবণ করিতেন।

মোক্ষদাসুন্দরী বর্তমান অবস্থার একরূপ বেশ সুখেই ছিলেন কিন্তু একটি পুত্রবধূর অভাবের জন্য তাঁহার মনে একেবারেই সুখ ছিল না। এতদিন এক রকম কাটিয়া গিয়াছে কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি এ অভাবটা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিতেছিলেন। তাঁহার সংসারে ভাঁড়ারনী, ব্রাহ্মণী, চাকরানী প্রভৃতি অনেকেই ছিল, কিন্তু তাঁহার আপনার-লোক বলিতে কেহই ছিল না। স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে তাঁহার নিজ হাতে পাতা সংসার তাঁহার নিকট খাঁ, খাঁ করিতে লাগিল। এই সময় পুত্র শরৎচন্দ্রের বিবাহ দিয়া একটি নব বধূর মুখ দেখিবার জন্য তাঁহার প্রাণে বড়ই আগ্রহ হইতে লাগিল।

তাঁহার মনের বড় সাধ যে, তিনি শরতের বিবাহ দিয়া একটি সুন্দরী ও সঙ্গঃসমুত্তা কন্যাকে আনিয়া তাহাদের সংসার নূতন করিয়া পাতিয়া দেন এবং কিছুদিন পরে পৌত্রমুখ দর্শন করিবার পর তিনি এ সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া ৬কাশীধামে বাস করিয়া তথায় জীবনের অবশিষ্ট কাল কাটাইয়া অবশেষে মৃত্যুর পর একেবারে মোক্ষলাভ করেন। তাঁহার মনের সাধ কিন্তু এখনও, সেই পূর্বোক্ত মতন,

ভুল-ভান্সা

মনেই রহিয়া গেল। সহস্র অনুরোধ ও বিবিধ প্রকারের বিধিযত চেষ্টা সবই বিফল হইল। শরৎচন্দ্র বিবাহ করিতে রাজী হইয়া ব্যক্তি-বিশেষের সম্পত্তি হইতে রাজী হইল না। সে পূর্বেকার মতন এখনও সেই Public property হইয়াই রহিল।

মোক্ষদাসুন্দরীর পিতৃকুলেও বড় একটা কেহ ছিল না। কোনও একটা ক্ষুদ্র পল্লিগ্রামে তাঁহার বাপের বাড়ি। সে বাড়িতে বর্তমানে পুরুষমানুষ কেহই নাই। মোক্ষদার দুইটি বিধবা খুড়তুতো বোন তথায় বাস করিতেছিলেন। এই সময় তাঁহাদের দুইজনের কথা মোক্ষদাসুন্দরীর মনে পড়িল। তিনি স্বয়ং গোবিন্দবাবুকে তথায় পাঠাইয়া দিয়া তাঁহার সেই খুড়তুতো বোন দুইটিকে নিজের কাছে আনাইয়া লইলেন।

মোক্ষদাসুন্দরী ভগ্নী দুইটিকে নিজের কাছে আনাইয়া অনেকটা সোয়াস্তি পাইলেন। তাঁহার শূন্য প্রাণটার কতকটা স্থান যেন পূর্ণ হইল। ইহাদের সহিত সুখ-দুঃখের কথা কহিতে পারিয়া, প্রাণের ব্যথা জানাইতে পারিয়া তাঁহার দুঃখময় মনে কিঞ্চিৎ শান্তি হইল। মোক্ষদাসুন্দরী সংসারের কার্যে মনও দেন, সকলের সহিত বেশ হাসিখিলামও করেন কিন্তু তবুও তাঁহার মনটা বে সदा-সর্বদাই একটা দুঃখে ও হতাশে আচ্ছন্ন এটা সকলেরই চক্ষে পড়িয়া যায়। এবং সে দুঃখটি যে তাঁহার একমাত্র পুত্রের জন্য এটাও সকলেই জানে। তাঁহার ভগ্নী দুইটি আসিবার কিছুদিন পরে, একদিন পুরাণ পাঠ শ্রবণ করিবার পর মোক্ষদাসুন্দরী, তাঁহার ভগ্নী দুইটির সহিত নির্জনে বসিয়া ধানিকঙ্কণ কি পরামর্শ করিলেন এবং তৎপরদিন প্রাতঃকালেই একখানি পত্র লিখিয়া, সে পত্রটি সর্বীয়ে

ভুল-ভান্স

এবং নিজ হস্তে ডাক-বান্সে ফেলিয়া দিবার জন্ত, বাটির বৃদ্ধ সরকারের নিকট ছক্কর পাঠাইলেন।

পত্রগানি পাঠাইবার পর হইতে মোক্ষদাসুন্দরীকে অপেক্ষাকৃত অল্প বোধ হইতে লাগিল।



পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ।

তীর্থরাজ হরিদ্বারের ভিতর যাইয়া আরও দুই, তিন কোশ পথ অতিক্রম করিয়া যাইলে গঙ্গাতীরে, লোক-বিরল পর্বতের পাদদেশে জনৈক মহাপুরুষ বাস করেন। স্থানীয় সকল লোকেই এই মহাপুরুষকে জানে, তাঁহার অলৌকিক যোগ-প্রভাব ও ধর্মবলের কথাও জানে। কিন্তু, এই সন্ন্যাসী যে কতদিন হইতে এইস্থানে বাস করিতেছেন, সে কথা কেহই বলিতে পারেনা। সকলেই বলে যে, তাহারা তাহাদের পিতৃ-পিতামহের মুখ হইতে শুনিয়াছে যে—তাঁহারাও এই সন্ন্যাসীকে তাঁহাদের জ্ঞান-বিকাশের সময় হইতেই ঐ স্থানে দেখিয়া আসিতেছেন।

আমাদের নবীনচাঁদও, জীবদ্দশায় এবার তীর্থপর্যটন মানসে বাটী হইতে বাহির হইয়া অনেক তীর্থ সন্নিহিত যখন হরিদ্বারে আসেন, তখন স্থানীয় লোকের মুখে এই মহাপুরুষ সম্বন্ধে অনেক অশ্রুচর্যজনক কথা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে যান।

নবীনচাঁদ শাস্তি ও ধর্মপ্রাভ করিবার জন্য তীর্থযাত্রা করিয়াছিলেন। সঙ্গে কেবলমাত্র স্ত্রী মোক্ষদাসুন্দরী ও একটি পরিচারক এবং একটি পরিচারিকা মাত্র লইয়াছিলেন। খুব ধূনধাম ও বাহ্যিক আড়ম্বর না করিয়া, বেশ সাধাসিধা ভাবে বাটী হইতে বাহির হইয়াছিলেন।

উক্ত মহাপুরুষের কথা শুনিবার পরই তাঁহার চরণ দর্শন মানসে তৎক্ষণাৎ তাঁহার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছিলেন। মহাপুরুষের সঙ্গে

ভুল-ভাঙ্গা

সাক্ষাতের পরে এবং তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত অমৃতোপম কথাবার্তা শুনিবার পরে নবীনচাঁদ, তাঁহার নিকট হইতে 'দীক্ষা' লইবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়েন এবং অবশেষে এক শুভদিনে ও শুভযোগে সঙ্গীক দীক্ষা গ্রহণ করেন।

তারপর দীর্ঘকাল অতীত হইয়া গিয়াছে। এতদিনের মধ্যে নবীনচাঁদ আর একবার মাত্র শ্রীগুরুর শ্রীচরণ দর্শন মানসে এখানে আসিয়াছিলেন এবং দুইবার, দুইটি বিপদে পড়িয়া গুরুদেবের নিকট পত্র প্রেরণ করিয়া, পত্রযোগে শ্রীগুরুর আশীর্বাদ ভিক্ষা করিয়াছিলেন।

এই সকল ঘটনার পর অনেকদিন চলিয়া গিয়াছে। বর্তমানে মোক্ষদামুন্দরী বিপদে পড়িয়া, বহুদিন পরে আবার শ্রীগুরুকে স্মরণ করিয়া তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছেন। এইস্থানে একটি কথা বলিয়া রাখা ভাল এই যে, এই মহাপুরুষকে কোনও পত্র লিখিতে হইলে তাঁহার শিষ্যগণ, হরিদ্বারস্থ জনৈক ধনবান ব্যক্তির নিকট সেই পত্রখানি পাঠাইতেন। এই ধনবান লোকটিও এই মহাপুরুষের শিষ্য। তাঁহার নিকট—গুরুদেবের নামীয় পত্র আসিলেই, তিনি স্বয়ং সেই পত্র লইয়া গিয়া মহাপুরুষের চরণ প্রান্তে দিয়া আসিতেন।

মহাপুরুষের নিকট দুই, চারিজন সন্ন্যাসী-শিষ্য অবস্থান করিত এবং অনেকগুলি যোগ-শিক্ষার্থী-শিষ্য প্রতিদিন আগমন করিত। এতদ্ব্যতীত জ্ঞান-প্রার্থী, উপদেশ-প্রার্থী, দর্শন-প্রার্থী প্রভৃতি অনেক লোক সন্নয়, সন্নয় আসিত। একদিন প্রাতঃকালে যোগ-শিক্ষার্থী শিষ্যগণকে সম্বোধন করিয়া মহাপুরুষ বলিলেন যে—“তোমরা আমার নিকট তিনদিন এসোনি।”

ভুল-ভাঙ্গা

গুরুদেবের মুখে সহসা এই কথা শুনিয়া শিষ্যবর্গ সকলেই বিস্মিত হইল। কারণ তাঁহার মুখে এরূপ কথা, ইহার পূর্বে আর তাহারা কখনও শোনে নাই। উপদেশ-দানে বা শিক্ষা-দানে ইহার, কোনও দিনই ক্লাস্তি বা বিরাম ছিল না।

সেইদিন অপরাহ্নে একটি বৃহৎ বটবৃক্ষতলে বসিয়া মহাপুরুষ নানারূপ শাস্ত্রকথা কহিতেছিলেন। তাঁহার নিকটে সমস্ত শিষ্যবর্গ ও ছই, চারিজন নবাগত ব্যক্তি বসিয়াছিলেন; এমন সময় মোক্ষদাম্বন্দরী-প্রেরিত সেই পত্রখানি তাঁহার নিকট পৌঁছছিল। পত্রখানি পাঠ করিয়া তিনি শিষ্যবর্গকে বলিলেন—“আমি আজই এস্থান ত্যাগ ক’রে কলিকাতা অভিমুখে যাবো।”

গুরুদেবের মুখে এই সম্পূর্ণ নূতন কথা শুনিয়া শিষ্যবর্গ বড়ই বিস্মিত হইল। কারণ—গুরুদেবকে এইস্থান ত্যাগ করিয়া কোথাও যাইতে, তাহারা কখনও দেখে নাই। তাহারা বিশ্বয়ভরে পরস্পরে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওরি করিতে লাগিল।

মহাপুরুষ, শিষ্যগণের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন—“ঊষ—এতদিন কোথাও যাবার প্রয়োজন হয়নি তাই কোথাও যাইনি, কিন্তু আজ একটি বিশেষ প্রয়োজন পড়েছে, তাই কলিকাতায় যাবো।”

মহাপুরুষের কথায় শিষ্যদের বিশ্বয় দূর হওয়া দূরে থাক, তাহাদের বিশ্বয়ভাব আরও বাড়িল। “প্রয়োজন? তাহাদের গুরুদেবের প্রয়োজন?” এ কথাটি তাহাদের মনে বড়ই আশ্চর্য্যভাবের সঞ্চার করিল।

কিছুক্ষণ চিন্তার পর মহাপুরুষ বলিলেন—“ঊষ, তোমাদের মতন স্নেহভাজন আমার একটি শিষ্য, কোনও বিপদে প’ড়ে বড়ই সঙ্কটভরে

ভুল-ভাঙ্গা

আমায় আহ্বান ক'রেছেন। তাঁর মনের দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমি তাঁদের বাটিতে একবার উপস্থিত হ'লেই তাঁর সমস্ত বিপদ ও অশান্তি দূর হ'য়ে যাবে। এ জগতে অতি দুঃখাপা, অমূল্যরত্ন যে বিশ্বাস, আমি সেই বিশ্বাস নষ্ট ক'রতে চাই না। সেই জন্যে আমার কলিকাতায় যেতেই হবে। আজই সন্ধ্যার পর আমি এ স্থান থেকে যাত্রা ক'রব।”

সেইদিন সন্ধ্যার পরই মহাপুরুষ সেইস্থান ত্যাগ করিলেন। তৎপরে কলিকাতায় উপনীত হইয়া তিনি শরৎচন্দ্রের বাটিতে পদধূলি দান করিলেন।

বাহ্য্যভরে এইস্থানে পূর্ব-কথান পুনরুক্তি না করিয়া সংক্ষেপে পর-বৃত্তান্ত বিবৃত করিলাম।

মোক্ষদাসুন্দরী গুরুদেবের পদধূলি গ্রহণ করিয়া, গলার কাপড় দিয়া প্রণাম করিয়া—তাঁহার মত যোগী-সন্ন্যাসী যে যোগ, তপ ছাড়িয়া এবং অনেক ক্লেশ স্বীকার করিয়া, কেবলমাত্র পরের কল্যাণার্থ এতদূর আসিয়াছেন, সেজন্য ভক্তিসহকারে প্রাণের কৃতজ্ঞতা জানাইলেন। তৎপরে সময়োচিত হুই, চারিটি কথার পর মোক্ষদাসুন্দরী, তাঁহার বিপদ ও অশান্তির সমস্ত কথা শ্রীগুরুর চরণে নিবেদন করিলেন।

মহাপুরুষ সমস্ত কথা শুনিয়া, অল্পক্ষণ নীরব থাকিয়া, বলিলেন—
“সকলই অদৃষ্ট মা—তুমি আমি তার কি ক'রব বল?”

মোক্ষদাসুন্দরী বলিলেন—“বাবা আপনার দয়া হলেই আমার ছেলে ঠিক ভাল হবে। আমার একটি মাত্র ছেলে; আমার সকল আশা, ভরসা সুখ, শান্তি সবই ওই ছেলের ওপর নির্ভর করছে। কিন্তু ঐ ছেলে আমাদের জ্ঞান ঠিক বিপরীত ভাবে চলছে। ভিন্ন-ধর্মীর আচারে,

শুল-ভাঙ্গা

ব্যবহারে নিজের জীবন কাটাচ্ছে। এ জগতে কেবল মাত্র নিজেরই সুখ নিজেরই আরাম সার করেছে। সে, এই অগাধ বিবয়ের মালিক হয়েছে, সে মনে করলে কত সং কাজ করতে পারে, কত লোকের ভাল করতে পারে কিন্তু সে সবে তার একদম মন নেই। গরীব, দুঃখী এসে দুঃখ জানালে, তাদের কিছু দেওয়া ছুঁতে থাক, তাদের দুঃখে দুঃখিত হওয়া ছুঁতে থাক উল্টে তাদের পুলিশে দিতে চায়। কোনও রকম ভাল কাজে তার মন নেই, কেবলমাত্র নিজের বিলাসিতা আর ধীন-সুখের দিকে মন আছে। আর সে, আমার একটি মাত্র ছেনে- তার বিয়ে হবে হবে আমার স্থানীর বংশ বজার থাকবে' এই উচ্চাই এখন আমার প্রাণের অর্ধেকটা স্থান অধিকার করে আছে; এর দ্বন্দ্ব তাকে আমি কত অনুরোধ করেছি, কত দুঃখ জানিয়েছি, যা হয়ে তার হাতে পর্যন্ত ধরেছি কিছু কিছুতেই ওকে রাজী করতে পারিনি। এই কথার উত্তরে কতকগুলো এমন অশ্রাব্য কথা বলে—তা আর আপনাকে কি ক'রে বলব।" ইত্যাদি, ইত্যাদি শরৎচন্দ্র ঘটিত সমস্ত কথা বলিয়া মোক্ষদা-সুন্দরী করজোড়ে, গুরু মুখপানে চাহিয়া রহিল।

শ্রীগুরু বলিলেন—“তাইত বড়ই বিপদের কথা; তা না আমি সম্রাসী মানুষ; আমি এর কি ক'রব বল? আমি তো আর তোনার পুত্রের নিজের ঘটকালী ক'রে একটি সুলক্ষণা কত্তা অশ্রমণ ক'রে দিতে পারি না। কিংবা, আমার এমনও সময় নেই যে আমি কিছু কাল ব্যবস দিবারাত্র ওর সঙ্গে থেকে ওকে সংপথে নিয়ে আসি। আমার না বৃথা কেন ডেকে আনলে?”

মোক্ষদাসুন্দরী ভক্তিভরে বলিলেন—“আপনার দ্বারাই আমার বিপদ

ভুল-ভাঙ্গা

সাক্ষাতের পরে এবং তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত অমৃতোপম কথাবার্তা শুনিবার পরে নবীনচাঁদ, তাঁহার নিকট হইতে 'দীক্ষা' লইবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়েন এবং অবশেষে এক শুভদিনে ও শুভযোগে সঙ্গীক দীক্ষা গ্রহণ করেন।

তারপর দীর্ঘকাল অতীত হইয়া গিয়াছে। এতদিনের মধ্যে নবীনচাঁদ আর একবার মাত্র শ্রীগুরুর শ্রীচরণ দর্শন মানসে এখানে আসিয়াছিলেন এবং দুইবার, দুইটি বিপদে পড়িয়া গুরুদেবের নিকট পত্র প্রেরণ করিয়া, পত্রযোগে শ্রীগুরুর আশীর্বাদ ভিক্ষা করিয়াছিলেন।

এই সকল ঘটনার পর অনেকদিন চলিয়া গিয়াছে। বর্তমানে মোক্ষদামুন্দরী বিপদে পড়িয়া, বহুদিন পরে আবার শ্রীগুরুকে স্মরণ করিয়া তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছেন। এইস্থানে একটি কথা বলিয়া রাখা ভাল এই যে, এই মহাপুরুষকে কোনও পত্র লিখিতে হইলে তাঁহার শিষ্যগণ, হরিদ্বারস্থ জনৈক ধনবান ব্যক্তির নিকট সেই পত্রখানি পাঠাইতেন। এই ধনবান লোকটিও এই মহাপুরুষের শিষ্য। তাঁহার নিকট—গুরুদেবের নামীয় পত্র আসিলেই, তিনি স্বয়ং সেই পত্র লইয়া গিয়া মহাপুরুষের চরণ প্রান্তে দিয়া আসিতেন।

মহাপুরুষের নিকট দুই, চারিজন সন্ন্যাসী-শিষ্য অবস্থান করিত এবং অনেকগুলি যোগ-শিক্ষার্থী-শিষ্য প্রতিদিন আগমন করিত। এতদ্ব্যতীত জ্ঞান-প্রার্থী, উপদেশ-প্রার্থী, দর্শন-প্রার্থী প্রভৃতি অনেক লোক সন্মুখ, সন্মুখ আসিত। একদিন প্রাতঃকালে যোগ-শিক্ষার্থী শিষ্যগণকে সম্বোধন করিয়া মহাপুরুষ বলিলেন যে—“তোমরা আমার নিকট তিনদিন এসোনি।”

ভুল-ভাঙ্গা

সাক্ষাতের পরে এবং তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত অমৃতোপম কথাবার্তা শুনিবার পরে নবীনচাঁদ, তাঁহার নিকট হইতে 'দীক্ষা' লইবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়েন এবং অবশেষে এক শুভদিনে ও শুভযোগে সঙ্গীক দীক্ষা গ্রহণ করেন।

তারপর দীর্ঘকাল অতীত হইয়া গিয়াছে। এতদিনের মধ্যে নবীনচাঁদ আর একবার মাত্র শ্রীগুরুর শ্রীচরণ দর্শন মানসে এখানে আসিয়াছিলেন এবং দুইবার, দুইটি বিপদে পড়িয়া গুরুদেবের নিকট পত্র প্রেরণ করিয়া, পত্রযোগে শ্রীগুরুর আশীর্বাদ ভিক্ষা করিয়াছিলেন।

এই সকল ঘটনার পর অনেকদিন চলিয়া গিয়াছে। বর্তমানে মোক্ষদামুন্দরী বিপদে পড়িয়া, বহুদিন পরে আবার শ্রীগুরুকে স্মরণ করিয়া তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছেন। এইস্থানে একটি কথা বলিয়া রাখা ভাল এই যে, এই মহাপুরুষকে কোনও পত্র লিখিতে হইলে তাঁহার শিষ্যগণ, হরিদ্বারস্থ জনৈক ধনবান ব্যক্তির নিকট সেই পত্রখানি পাঠাইতেন। এই ধনবান লোকটিও এই মহাপুরুষের শিষ্য। তাঁহার নিকট—গুরুদেবের নামীয় পত্র আসিলেই, তিনি স্বয়ং সেই পত্র লইয়া গিয়া মহাপুরুষের চরণ প্রান্তে দিয়া আসিতেন।

মহাপুরুষের নিকট দুই, চারিজন সন্ন্যাসী-শিষ্য অবস্থান করিত এবং অনেকগুলি যোগ-শিক্ষার্থী-শিষ্য প্রতিদিন আগমন করিত। এতদ্ব্যতীত জ্ঞান-প্রার্থী, উপদেশ-প্রার্থী, দর্শন-প্রার্থী প্রভৃতি অনেক লোক সন্ধ্যা, সন্ধ্যা আসিত। একদিন প্রাতঃকালে যোগ-শিক্ষার্থী শিষ্যগণকে সম্বোধন করিয়া মহাপুরুষ বলিলেন যে—“তোমরা আমার নিকট তিনদিন এসোনি।”

ভুল-ভাঙ্গা

বাবু। তোমার মনিব, ওই শরৎবাবু, আমার সামনে দাঁড়িয়ে যে রকম হাত-পা খেঁচছিল আর দাঁত-মুখ খিঁচোচ্ছিল তাতে আমি নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি যে, ও বাবুকে শেরালে কামড়েচে। আমাদের দেশে সেদিন একটা লোককে শেরালে কামড়েছিল, সে লোকটা শেরালে কামড়াবার পর থেকে প্রথমটায় ঠিক ওই রকম খেঁচতে লাগলো ~~স্বাভাৱিক~~ দাঁত-মুখ খিঁচোতে লাগলো; তারপর তিন, চারদিন বাদে “হুকা হুকা” ক'রে শেরাল ডাকতে, ডাকতে মরে গেল। তুমি দেখে নিও মেজখুঁড়ো, তোমার বাবুও তিন, চার দিন, বড় জোর ~~শেষ~~ সাত দিনের মধ্যে ওই রকম “হুকা হুকা” ক'রে শেরাল ডাকতে, ডাকতে মরবে। বাপরে! চাকরী আমার মাথায় থাক; শেষটা কি ~~চাকরীর~~ পৈত্রিক প্রাণটা খোয়ার। ও শালার রোগে যাকে কামড়াবে সেই মরবে। তোমার বাবু শেষকালে কোনওদিন যদি শেরালের মাথা ~~আমায়~~ ঠেসে এক কামড় মারে তাহলে আমাকেও ওই রকম “হুকা হুকা” ক'রে মরতে হবে।”

এই কথা শুনিয়া দীর্ঘতো হাসিয়া আকুল ~~হাসিতে~~ হাসিতে, হাসিতে বলিল—“ওরে পাড়াগেঁয়ে ম্যাড়া, ও বাবুকে শেরালে কামড়াবে কেন রে? ও বাবু টেরি বাগাবার সময় রোজই ওই রকম করে।”

নূতন-চাকরটি বলিল—“হ্যাঁ রোজই ওই রকম করে। পাড়াগেঁয়ে লোক বলে কি আমার একেবারে বাদর মনে কর নাকি? মুহু শরীরের সহজ মানুষ কি কখনও ঐ রকম করে খেঁচতে থাকে নাকি। দরকার নেই আমার চাকরীতে—” এই কথা বলিয়া সে ছুটিয়া চলিয়া গেল।

“কীহু অতি ব্যস্তভাবে বলিল—“আরে শোন, শোন; আমার কথাটাই শোন।” আর শোন—সে ব্যক্তি ততক্ষণে এক দৌড়ে পগার পার।

ভুল-ভাঙ্গা

ঠিক এই রকম নয় ; কিন্তু এই রকম ধরনের ঘটনা মধ্যে, মধ্যে ঘটিত । একদিনের একটা ঘটনার কথা আপনাদের শুনাইয়া রাখিলাম । এখন এইবার ; যে কথা হইতেছিল, সেই কথার সূত্র ধরা যাক ।

শরৎচন্দ্র কিছুক্ষণ ধরিয়া ঐরূপভাবে আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া দাঁত-মুখ খিঁচাইবার পুর ; ধীরে ধীরে আয়নার নিকট হইতে একটু সরিয়া গিয়া পোষাক পরিতে লাগিল । কামিজ, পরিয়া কলার ও নেকটাই পরিতে প্রায় পনের মিনিট কাটিয়া গেল । তারপর কোট পরিয়া আবার আয়নার সম্মুখে আসিয়া, মাথায় Rigaud'এর খানিকটা Lotion ঢালিয়া দিল । তারপর একখানি রুমাল বাহির করিয়া তাহাতে তাহার বড় প্রিয় এবং বিলাসী ধনীগণের অতি প্রিয় Coty'র এক শিশি এসেন্সের প্রায় অর্ধেকটা রুমালে ঢালিয়া দিল এবং বাকী অর্ধেকটা পোষাকে ঢালিয়া দিল । এইরূপ ভাবের সাজগোজ প্রতিদিনই হয় । ইহাতে কত অর্থ অপব্যয়িত হক ! এক, একটা সূট দেড়শত হইতে সাড়ে চার শত টাকা মূল্যে প্রস্তুত হইয়াছে এবং দুই, চারিবার ব্যবহারের পর তাহা আর ব্যবহৃত না হইয়া বাস্তবজাত হয় ও অবশেষে নষ্ট হইয়া যায় । একখানি Paiseley রুমাল কিনিতে পাঁচ, ছয় টাকা ব্যয় হয় এবং এক শিশি এসেন্স তের টাকা হইতে ত্রিশ টাকা অবধি মূল্যে ক্রীত হয় । দেশে কত লোক না খাইতে পাইয়া মারা যায়, অর্থাভাবে কত লোক এক বেলাও পেট ভরিয়া হুন-ভাত খাইতে পার না ; আর ধনী শরৎচন্দ্রের—অন্য সব ব্যয়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া কেবলমাত্র এসেন্স, রুমাল, লোসন, সাবান আর সিগারেটের জন্য প্রতিদিন একশত টাকার উপর খরচ হয় । হায় রে হৃদয়হীন ধনী শরৎচন্দ্র !

বাহা ইউক, পোষাক পরিয়া, এসেন্স মাখিয়া মুখে খুব খানিকটা

ভুল-ভাঙ্গা

পাউডার মাথিরা শরৎচন্দ্র মুখটাকে সাদা করিবার চেষ্টা করিয়া, সিঁতা কাটিয়া ফেলিল। তারপর আরসীতে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিতে, দেখিতে—নিজের রূপে নিজেই মোহিত হইয়া গেল। নিজের প্রতিবিম্ব দেখিতে, দেখিতে সহসা তাহার মনে হইল যে, তাহার বন্ধুগণ সর্বদাই বলে যে,—‘শরৎবাবু অতি রূপবান, তাহার রূপ দেখিলে ত্রীলোক দূরের কথা পুরুষ অরধি পাগল হয়।’ এই কথা স্মরণ হওয়াতে শরৎচন্দ্রের মন গর্বে ভরিয়া গেল; তাহার চ্যাপটা নাকটা ওরই মধ্যে যতটা সম্ভব, একটু ফুলিয়া উঠিল।

ঠিক এই সময়ে তাহার সহচর-যুগল হরিচরণ ও মাধব সেই কক্ষে উপস্থিত হইল। তাহারা দুই ভ্রাতায় সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া, শরৎচন্দ্রকে ওদবস্থায় দেখিয়া, পরস্পরে একটু মুচকি-হাসি হাসিয়া, চোখে চোখে ইসারা করিল। জ্যেষ্ঠ হরিচরণ, শরৎকে বলিল—“বাবু অত ক’রে আরসীতে মুখ দেখবেন না—শেষটায় কি নিজের রূপে নিজে মোহিত হ’য়ে গিয়ে, নিজেই নিজের প্রেমে পড়ে যাবেন।”

হরিচরণের কথা শুনিয়া মহা আনন্দিত হইয়া শরৎচন্দ্র বলিল—“হ্যাঁ ভূমিও যেমন; আমার চেহারা কি এতই ভাল নাকি? যে, যে দেখবে সেই প্রেমে পড়ে যাবে?”

হরিচরণ খুব দৃঢ়স্বরে বলিল—“নিশ্চয়ই। এ কথা শুধু আমি কেন, জগতের সকল লোকেই বলে।”

হরিচরণের কথা শেষ হইতে না হইতেই তাহার কনিষ্ঠ সন্তোদর মাধব তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—“সত্যি বাবু আপনার রূপ যথার্থই মুনিমনোহর। আপনার এই সুন্দর চেহারা, আপনার এই মুনিমনোহর রূপ দেখে,

আমাদেরই যখন স্বীলোক হোতে ইচ্ছে ক'রে তখন না জানি স্বীলোক-দের যনে কি হয় !”

এই কথা শুনিয়া শরৎচন্দ্র মহা খুসী হইয়া গাল ভরিয়া হাসিতে লাগিল। তাহার দেখাদেখি হরিচরণ ও মাধবও জোর করিয়া ও চেঁচা করিয়া হাসিতে লাগিল। শরৎচন্দ্র এইরূপ ভাবে হাসিতে হাসিতে সহসা—একেবারে সহসা, মহা গম্ভীর হইয়া গেল এবং নিকটস্থ চেয়ারে হতাশভাবে বসিয়া পড়িয়া; একটা হাত বুকের উপর রাখিয়া, অন্য হাতটি গালের উপর দিয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের “স্বা” কি চিন্তা করিতে লাগিল।

শরৎকে হাসিতে হাসিতে সহসা ঐরূপভাবে গম্ভীর হইতে দেখিয়া, তাহার সহচরদ্বয় একটু ভীত হইয়া মনে করিল যে, তাহারা হঠাৎ অজ্ঞাতে, শরতের মনঃপূত নয় এমন কোনও কথা বলিয়া ফেলিয়াছে সেই জন্য শরৎ বিরক্ত হইয়া ঐরূপ গম্ভীর মূর্তী ধারণ করিয়াছে। এই মনে করিয়া হরিচরণ বিনা কারণে শরতের কোটের ধুলা ঝাড়িতে, ঝাড়িতে বলিল—
“বাবু, আনন্দ ক'রতে, ক'রতে আপনি হঠাৎ এমন গম্ভীর হ'য়ে গেলেন কেন? আমরা কি না জেনে কোনও অন্তর কথা ব'লে ফেলেছি, যার জন্যে আপনি রাগ করে উঠলেন।”

শরৎচন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইল এবং দুই হাত বন্ধে রাখিয়া, বিজ্ঞের স্তায় গম্ভীর ভাবে বলিল—“তোমাদের কথার আমার রাগ হয়নি বটে তবে বড় ভাবনা হয়েছে। দ্যাখ, আমার রূপ দেখে যদি একসঙ্গে পাঁচ, ছয়জন মেয়ে মানুষ আমার ভালবেসে কেলে তখন আমার কি দশা হবে?”

ডুল-ভাঙ্গা

হরিচরণ বলিল—“আজ্ঞে তখন আপনার একাদশ বৃহস্পতির-দশা হবে। প্রেমের পক্ষে স্ত্রীলোক কি রকম জানেন? মুড়ীর পক্ষে কচি শশা যেমন—ঠিক তেমনি। আপনার সে দশা যখন হবে তখন আপনি মিলন-নুন মাখিয়ে পাঁচ ছয়টি কচি শশা দিয়ে প্রেম-মুড়ী চিবুতে থাকবেন।”

এই কথা শুনিয়া সকলেই একচোট হাসিল। কিন্তু ইহাদের মধ্যে শরৎচন্দ্র একরূপ উচ্চৈঃস্বরে একরূপ প্রচণ্ড হাসি হাসিল যে, তাহার সেই হাস্য-রবে; নিকটবর্তী দুই চারিখানি বাটির ছোট, ছোট ছেলেমেয়েরা মহা-ভয়ে আঁৎকাইয়া উঠিয়া ছুটিয়া গিয়া মায়ের কোলে বাঁপাইয়া পড়িয়া মাকে আঁকড়াইয়া ধরিল। সে সময় জনৈক গোরালী—“দুখে কতখানি জল দিয়াছে এবং তাহাতে কত লাভ করিবে—” এই কথা এক মনে ভাবিতে, ভাবিতে মাথার উপর এক বালতী দুধ গইয়া, শরতের কন্ধের সম্মুখস্থ রাজপথ দিয়া যাইতেছিল। সেই গোরালী বেচারী ঐ রকম অন্তিমনস্ক ভাবে যাইতে, যাইতে সহসা, শরতের সেই ভীষণ ও প্রচণ্ড হাসির শব্দে “বাপরে” বলিয়া চম্কাইয়া উঠিল এবং সঙ্গে, সঙ্গে তাহার মস্তকের উপরিস্থিত দুধের বালতী সবেগে ও সশব্দে উলটাইয়া পড়িয়া, দুধ সমেত রাস্তার উপর গড়াইতে লাগিল।

সহসা যে কি হইয়া গেল, তাহা গোরালী ব্যাচারা প্রথমটার বৃষ্টিতে না পারিয়া খানিকক্ষণ হতভম্ব হইয়া ভাবা-গঙ্গারামের মতন দাঁড়াইয়া রহিল। তৎপরে একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল এবং মহা অপ-শোষের সহিত ও নিফল-ক্রোধের সহিত বলিল—“ওঃ কে'ন্ শালা হাসলে! শালা নিশ্চয়ই মামদোর ছানা কিংবা পেত্নীর পুষিপুত্তর—

ভুল-ভাঙ্গা

নয়ত মাথুষের বাচ্ছা কখনও ওরকম ক'রে হাসতে পারে।” এইরূপ ধরণের নানা প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিতে, করিতে গরলার-পো শূন্য বালভী তুলিয়া লইয়া ক্ষুণ্ণমনে প্রস্থান করিল।

এদিকে ঘরের ভিতর বাবুদের হাসি থামিতে না থামিতে, একটি চাকর একটি ট্রেতে করিয়া চা, বিস্কুট, টোষ্ট করা রুটি, ডিমের পোচ্, প্রভৃতি লইয়া উপস্থিত হইল। শরৎচন্দ্র, সহচরদ্বয়কে লইয়া মনের সাধে সেই সকল দ্রব্যের সদ্যবহার করিতে লাগিল। তৎপরে শরৎচন্দ্রের আদেশে সেই চাকরটি শরতের বড় প্রিয় সিন্ধুটিপট্‌ড আবহুলা নামক ইজিপ্সিয়ান সিগারেটের বাক্স আনিয়া হাজির করিল। শরৎচন্দ্র ও তাহার সহচরদ্বয় সেই সিগারেট লইয়া উপর্যুপরি ধূমপান করিতে লাগিল। এই সিগারেটের জন্য শরতের প্রতিদিন বাইশ টাকা খরচ হইত।

একটি সিগারেট টানিতে, টানিতে শরৎচন্দ্র, সহচরদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া বলিল—“জাথ হরিচরণ আর মাধব, এক কাজ ক'রলে হয় না—দিন কতক বেড়িয়ে এলে হয় না? বাবা মায়া যাবার পর থেকে মা প্রায়ই বলত যে—দিন কতকের জন্তে কলকেতা ছেড়ে মাকে তীর্থদর্শন করিয়ে আনতে, তা আমি এতদিন রাজী হইনি; ভাবতুম যে কলকেতা ছেড়ে কোথায় বিদেশে, বিদেশে ঘুরে ম'রব। তা জাথ এখন ভাবছি যে, দিন কতক ঘুরে আসা যাক। মন্দ কি, বেশ নতুন রকমের ক্ষুণ্ণী হবে। একটা টুরিষ্ট-কার ভাড়া ক'রে নোয়া যাবে—ও তীর্থদর্শন, কীর্তদর্শন ও সব কিছু নয়—তবে হাঁ, নানান দেশ ভ্রমণ ক'রে আসা যাবে।”

দেশ ভ্রমণের কথা শুনিয়া হরিচরণ ও মাধব আনন্দে লাফাইয়া উঠিল। তাহারা কিছু বলিবার পূর্বে শরৎচন্দ্র বলিল—“জাথ, আজ

ভুল-ভাঙ্গা,

বাবার সময় ছপুরবেলা মা কের আমার অনেক ক'রে—তীর্থভ্রমণে নিয়ে বাবার কথা বলছিল। তা আমি এক রকম রাজী হয়েছি বটে কিন্তু তখন বলুম যে—হরিচরণ আর মাধব যদি আমার গাইড্ হয় তাহলে আমি এখনই যেতে রাজী আছি।”

একে দেশ-ভ্রমণে যাওয়া তার উপর টুরিষ্ট-কান্নে, শরতের মতন ধোরচে লোকের সঙ্গে। এই চিন্তার দুই ভ্রাতার মনে আনন্দিত হইয়া-ছিল। শরতের কথা শেষ হইতে না হইতেই হরিচরণ অসীদ আনন্দের আবেগে বলিয়া উঠিল—“বাবু আমরা, আপনার গাইড্ হ'লে খুব রাজী—আপনি এখনই দেশ-ভ্রমণে চলুন। আপনি যদি দয়া ক'রে আমাদের সঙ্গে নিয়ে যান তাহলে আপনার গাইড্ হওয়া কি-বা অনেক—আমরা আপনার গারজেন্, আপনার গ্র্যাণ্ড-ফানার অবশি হ'লে রাজী আছি।”

শরৎচন্দ্র বলিল—“তা'হলে তোমরা যেতে রাজী?”

দুই ভ্রাতার সম্মুখে বলিয়া উঠিল—“রাজী, রাজী, খুব রাজী; একশোবার রাজী, হাজারবার রাজী।”

শরৎচন্দ্র বলিল—“আজ হল শুক্রবার; শনি, বহি, সোম তিন দিন মাঝে থাক, মঙ্গলবার দিন এখান থেকে বেরায়ে যাবে। এই তিন দিনের মধ্যে সব যোগাড়-যন্ত্র ক'রে নিতে হবে। আজ হরিচরণ, আমি একখানা টেলিগ্রাম লিখে দিচ্ছি; তুমি কাল সকালে উঠেই এখানা নিজ হাতে পোষ্ট অফিসে নিয়ে গিয়ে পাঠাব। তুমি ক'রবে। আমরা এখান থেকে বেরিয়ে প্রথমেই কাশীতে যাবো। দাবার বন্ধ একজন কাশীতে থাকেন, তিনি সেখানকার একজন বড় বাদসাদার আর খুব বড়লোক। আমি তাঁর কাছেই এই ভাবখানা পাঠাচ্ছি।” এই

কথা বলিয়া শরৎচন্দ্র একটি ব্লটিন প্যাডের ভিতর হইতে একখানি টেলিগ্রাফ-করম বাহির করিয়া নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখিয়া দিল :—

ভৈরবপ্রসাদ দোবে কানী।

মাকে লইয়া দেশভ্রমণে বাহির হইতেছি কানীতে সাতদিন থাকিব একটি ভাল বাড়ী ঠিক করিয়া রাখিবেন বুধবার সকালের মেলের সময় ষ্টেশনে লোক পাঠাইবেন।

শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষ

৩নবীনচাঁদ ঘোষের পুত্র

কলিকাতা।

টেলিগ্রাফ লেখা সনাপ্ত করিয়া, সেখানি হরিচরণের হাতে দিয়া শরৎচন্দ্র বলিল “আখ, প্রথমে কানীতে যাবো। সেখানকার সব দেখে শুনে যাবার সময় বাবার ঐ বন্ধুর কাছ থেকে একজন বেশ এক্সপার্ট লোক নিয়ে নোবো—সে আমাদের সব পশ্চিমের ভাল, ভাল দেশ দেখিয়ে, আনবে।”

ইহা শুনি পর আরও অনেক কথাবার্তা ও পরামর্শ হইবার পর, তিনজনে সেই কক্ষ ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিল। বাড়ীর ফটকের সম্মুখে জুড়ী ওয়েলারযুক্ত একটি উঁচু ধরণের বৃহৎ ল্যাণ্ডো দাঁড়াইয়াছিল। তাহাতে আরোহণ করিয়া তিনজনে বেড়াইতে চলিলেন। বাবুরা বেড়াইবার নাম করিয়া বাহির হইলেন বটে কিন্তু কার্যতঃ তাঁহাদের আর বেড়ান হইল না—বেড়ান হইল বাবুর অশ্ব ও অশ্বিনীর।

বাবুর গাড়ী, গড়ের মাঠ দিয়া গিয়া, ইডেন গার্ডনের দক্ষিণ ফটকের

ভুল-ভাগ্না

সম্মুখ দিয়া গিয়া বাঁয়ে মোড় ফিরিয়া গঙ্গার ধার দিয়া বরাবর দক্ষিণ মুখে চলিয়া গেল। বাবুর হইল সিগারেটের ধূম চাকনা দিয়া খানিকটা বায়ু ভক্ষণ আর বাবুর অস্থ ও অস্থিনীর হইল—বথার্থ ভ্রমণ ও তৎফল শারীরিক ব্যায়াম।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ।

শিবের ত্রিশূলের উপর অবস্থিত ৮কানীধাম । সম্মুখে সর্বপাপ-নাশিনী জননী গঙ্গা—সগিলরাপিনী ব্রহ্মময়ী—প্রবাহিতা । এই কানীধামের ধনী অধিবাসী ও বিখ্যাত ব্যবসায়ী ভৈরবপ্রসাদের সংবাদ লইতে আপনারা এইবার পূণ্যতীর্থ কানীধামে আসুন । আশা করি আপনারা ভৈরবপ্রসাদ দোবে মহাশয় ও তাঁহার কন্যা লক্ষ্মী এবং তাঁহার মনোনীত, ভাবী-জামাতা' অযোধ্যানাথকে ভুলিয়া যান নাই । “ভৈরবপ্রসাদের, কন্যাকে শিক্ষিতা করিবার প্রয়াস ও অযোধ্যাকে ভাবী জামাতা নির্বাচন করিবার বিবরণ এবং ভৈরবপ্রসাদের লাঠির কুপায় কি করিয়া লক্ষ্মী ও অযোধ্যা, তাঁহাকে লুকাইয়া, প্রেমালাপ করিত এবং অবশেষে একদিন সেই লাঠিগাছটি ছিল না বলিয়া ইহারা কিরূপ ভাবে ধরা পড়িয়া যান” ইত্যাদি ইত্যাদি কৌতুকময় কাহিনী বোধ হয় আপনাদের মনে আছে ।

একদিন প্রাতঃকালে ভৈরবপ্রসাদ তাঁহার সুসজ্জিত ড্রয়িংরুমে একখানি বড় কুশন্ চেয়ারে দুই পা ভুলিয়া উবু হইয়া বসিয়া আছেন, এবং এক লোটা, গঙ্গাজলে প্রস্তুত গরম চা পান করিবার উত্তোগ করিতেছেন । কিঞ্চিদূরে একটি ছোট টেবিলের কাছে, লক্ষ্মী ও অযোধ্যা দুইখানি ছোট কুশন্ চেয়ারে বসিয়া—কাপে করিয়া চা পান করিতেছে এবং নিবিষ্টচিত্তে নানারূপ গল্প, অক্ষুটস্বরে করিতেছে ।

ভৈরবপ্রসাদের নিত্য আহাৰাদি করিবার অন্তত রীতি ও দৈনিক

ভুল-ভাঙ্গা ।

জীবন-বাণন করিবার অপক্লপ প্রণালীর কথা বোধ হয় মনে আছে ? আর তাঁহার সেই বিশাল উদরের ও বিরাট বপুর কথা বোধ হয় মনে আছেই । এতদিন উত্তম ছাতু ও ঘিউ খাইয়া তাঁহার সেই বিশাল ভুঁড়িটি আরও বৃহৎ আকার ধারণ করিয়াছে ।

তাঁহার সেই বোম্বাই জালার মতন বিশাল ভুঁড়িটি সম্মুখ দিকে উচু করিয়া, একখানি বড় চেয়ারের উপর উবু হইয়া বসিয়া, কাপড়ের খুট দিয়া সেই লোটাটি দুই হস্তে ধরিয়া ভৈরবপ্রসাদ লোটাছু চা পান করিবার জন্য, লোটাটি মুখের নিকট লইয়া গেলেন কিন্তু লোটাটি গরম হইয়া বাগুরার দরুণ চা পান করিতে পারিলেন না । গরম চা পূর্ণ সেই লোটা অর্থাৎ ঘটি, মুখে অল্পমাত্র ঠেকিতেই ঠোঁটে আঁচ লাগিতেছে ; ভৈরব-প্রসাদ সেই জন্য দুই চারিটি ফুৎকার দিয়া আবার পান করিতে গেলেন কিন্তু পুনরায় ঠোঁটে আঁচ লাগিল । দুই একবার এইরূপ চেষ্টা করিয়া ক্লতকাৰ্য্য না হওয়াতে ভৈরবপ্রসাদ রাগিয়া উঠিলেন । তিনি এইবার রাগের চোটে সেই ঘটিটিকে সজোরে চাপিয়া ধরিয়া, তাঁহার সেই মোটা গাল ফুলাইয়া খুব বড় বড় করিয়া চার পাঁচটি ফুৎকার দিয়া, টপ্ করিয়া ঘটিতে মুখ দিয়া সজোরে খানিকটা চা খাইয়া ফেলিলেন । ওই ভয়ানক গরম চা ঐরূপভাবে টপ্ করিয়া খাইয়া ফেলাতে ভৈরবপ্রসাদের ওষ্ঠাধর ও মুখের ভিতরটার ভয়ানক আঁচ লাগাতে তিনি চমকিয়া উঠিলেন এবং সেই সঙ্গে তাঁহার হাত ও সর্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠাতে ঘটি হইতে চল্কাইয়া উঠিয়া অনেকটা গরম চা তাঁহার সেই বিশাল উদরের উপর পড়িয়া গেল । ভৈরবপ্রসাদ হস্তস্থিত ঘটিটি সজোরে নিক্ষেপ করিয়া সবগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং “জান্ গিয়ারে,” “বাপরে জান্ গিয়ারে” বলিয়া তিড়িং-

ডুল-ভাঙ্গা

মিড়িং করিয়া লাফাইতে লাগিলেন ও দুই হাত দিয়া পেট চাপড়াইতে লাগিলেন।

লছমী ও অযোধ্যা একমনে গল্প করিতেছিল। ভৈরবপ্রসাদের ঘণ্ডের ঝায় চিংকারে এবং গানরের ঝায় উলফনে চমকিত ও বিস্মিত হইয়া তাহার ছুটিয়া নিকটে আসিল এবং ব্যাপার বুঝিয়া, দুইজনে ভৈরবপ্রসাদের দুই হাত ধরিয়া “কিছু নয় ; একটু গরম চা পোড়ে গেছে, সামান্য আঁচ লেগেছে মাত্র, এখনই সেরে যাবে”—প্রভৃতি বলিয়া ভৈরবপ্রসাদকে সাধনা দিতে লাগিল। ভৈরবপ্রসাদ চিংকার করিয়া “ওরে বাবারে বড় জালা করুচ্ছেরে ; ওঃ ওঃ জলচ্ছেরে” এই কথা বলেন আর সম্মুখ দিকে এক একটি প্রচণ্ড ফুৎকা দেন। লছমী ও অযোধ্যা, তাঁহার দুই দিকে অবস্থান করিয়া তাঁহার দুই হাত ধরিয়া সজোরে টানিয়া, অতি কষ্টে কোনও রকমে তাঁহার শাড়ি করাইয়া রাখেন। কিছুক্ষণ এইরূপ লাফা-লাফি ও টানাটানির পর সেই বৃহৎ ড্রয়িং-রুমের মধ্যস্থলে গিয়া সেই ঘরের প্রবেশ দ্বারের নিকট পিছন কিরিয়া সকলে দাঁড়াইলেন। ভৈরবপ্রসাদ ওইভাবে দাঁড়াইয়া তাঁহার বিশাল উদরে “আ-ফু, আ-ফু,” করিয়া বড় বড় ফুৎকার দিতে লাগিলেন এবং তাঁহার আদেশে লছমী ও অযোধ্যা ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাঁহার উদরে আন্তে আন্তে ফুঁ দিতে লাগিল।

ঠিক এমনি সময় একটি ছোকরা টেলিগ্রাফ-পিওন সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে, তিনটি লোকই পিছন কিরিয়া দাঁড়াইয়া কি করিতেছে। পিওনটি অল্পক্ষণ চূপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল তৎপরে তাঁহাদের দিকে অগ্রসর হইল। ভৈরবপ্রসাদ একমনে নিজে ফুঁ দিতেছেন এবং “আঃ ঠাণ্ডা হচ্ছে ; দাঁও লছমী জোরসে ফুঁ দাও, অযোধ্যা ফুঁ দাও, কৃপণভা-

ভুল-ভাঙ্গা

ক'রনা ফুঁ দাও" এই কথা বলিতেছেন; এমন সময় পিওনটা তাঁহার পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইল এবং তাহার হস্তস্থিত একখানি টেলিগ্রাম, ভৈরবপ্রসাদের সম্মুখ দিকে আগাইয়া দিতে যাওয়াতে সেটা হঠাৎ ভৈরবপ্রসাদের পৃষ্ঠে ঠেকিয়া গেল। টেলিগ্রামখানি হঠাৎ তাঁহার অঙ্গে লাগাতে ভৈরবপ্রসাদ মহা ভীত ও চমকিত হইয়া, অযোধ্যা ও লছমীকে দুই হাতে ধাক্কা দিয়া "আরে মারীয়ে" বলিয়া চোঁচাইতে, চোঁচাইতে সম্মুখ দিকে খানিকটা অগ্রসর হইয়া গেলেন। তাঁহার এইরূপ বিসদৃশ ব্যবহারে পিওন বিস্মিত হইয়া "হুজুর একঠো তারু আয়া, হুজুর একঠো জরুরী তারু আয়া" এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার নিকট দৌড়াইয়া গেল এবং তারুখানি তাঁহার সম্মুখদিকে আগাইয়া ধরিল।

পিওনের কথার আকৃষ্ট হইয়া ভৈরবপ্রসাদ গিছন ফিরিয়া পিওন ও টেলিগ্রাম দেখিয়া অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইলেন কিন্তু সেই পিওন বেচারার উপর মহা গরম হইয়া বলিলেন—"তুম্ হামকো এয়সা চমক্ লাগায় দিয়া কেওরে বদমাস্?"

বিস্মিত পিওনটা কি যে উত্তর দিবে ঠিক করিতে না পারিয়া বলিল—
"হুজুর হামতো, হামতো, হামতো তারু—"

নিকটে পতিত সেই প্রিয় ও সদা-সর্বদার সহচর লাঠি-গাছটি তুলিয়া লইয়া ভৈরবপ্রসাদ মহা তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া লাঠিটা দুই চারিবার ভূমিতে মজোরে ঠুকিয়া, অবশেষে লাঠির ডগা দিয়া পিওনের পেটে একটা খোঁচা দিয়া বলিলেন—
"চুপ-চাপ খাড়া কাহে ; বোলো, জলদী বোলো—কাহে হামকো এয়সা চমক্ লাগায় দিয়া। আবতক্ হামরা ছাতিকা অনর এইসি তেইসি করতা হায়।"

পিওন বেচারা ভয়ে ভয়ে পুনঃপুনঃ সেলাম করিয়া টেলিগ্রামখানি সম্মুখে আগাইয়া ধরিয়া বলিল—“মাফ কিজিয়ে হজুর ; কস্বর হো গিয়া ! এই তার্ লিজিয়ে ।”

ভৈরবপ্রসাদ অপেক্ষাকৃত নরম স্বরে বলিলেন—“দেও ।” টেলিগ্রামখানি লইয়া সহি করিয়া দিয়া পিওনকে বলিলেন—“যাও, যাও, চলা যাও ।” পিওন চলিয়া গেল ।

খাম ছিড়িয়া টেলিগ্রাম পাঠ করিয়া ভৈরবপ্রসাদ মহা আনন্দিত হইলেন । তিনি হঠাৎ দুই হাত তুলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—“আখ, আখ এট তারুটা পড়ে দেখ—আমার একজন মহা-বন্ধুর ছেলে আমার কাছে আসছে ।” এই কথা বলিয়া তিনি টেলিগ্রামের কাগজখানি অযোধ্যার হাতে দিলেন । অযোধ্যা তাহা পাঠ করিয়া লক্ষ্মীকে পড়িতে দিল । ভৈরবপ্রসাদ আপন মনে অশ্রুটস্বরে কি বকিতে লাগিলেন ।

কিছুক্ষণ পরে লক্ষ্মীর হাত হইতে টেলিগ্রামের কাগজটা লইয়া ভৈরবপ্রসাদ আবার সেটা পাঠ করিয়া, মহা আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—“টেলিগ্রাম-প্রেমক কে জান ? সে হচ্ছে আমার মহা ভালবাসার ও উপকারী বন্ধু নবীনচাঁদ বাবুর একমাত্র পুত্র শরৎচন্দ্র । আমাতে আর শরতের পিতাতে ভয়ানক ভালবাসা আর বন্ধুত্ব ছিল । আমরা আগে অনেকদিন ধরে দুজনে মিলে মাল-পত্রের লেন-দেন ক’রতুম । আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুর পুত্র শরৎচন্দ্র যখন আমার সেই বন্ধুর পত্নীকে নিয়ে এখানে—আমার দেশে আসছে তখন, আমি বেঁচে থাকতে তারা এখানে এসে ভাড়াটে বাড়ীতে থাকলে, আমার বড় দুর্ভাগ্য হবে । অযোধ্যা তুমি নিজে

ডুল-ডাঙ্গা

বুধবারে ট্রেনে গিয়ে এই সব কথা তাঁকে বুঝিয়ে বলবে আর খুব খাতির ক'রে তাদের এইখানে নিয়ে আসবে।”

অঘোখা ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। ভৈরবপ্রসাদ উপরোক্ত কথাগুলি পুনরায় বুঝাইয়া বলিয়া বলিলেন—“দেখো, কোনও রকমে তাদের যেম অখাতির না হয়। তুমি খুব সমাদরের সহিত তাদের, আমার এই বাড়ীতে নিয়ে আসবে।”

এই কথাগুলি বলিয়া, যে চেয়ারে বসিয়া চা পান করিতেছিলেন সেই চেয়ারের পারার নিকট পতিত খড়ম জোড়াটা পায়ে পরিয়া, ভৈরবপ্রসাদ সেই ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবার জন্য দরজার নিকট আসিয়া দেখেন যে, সেই টেলিগ্রাফ-পিণ্ডনটী দরজার কাছে বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া ভৈরবপ্রসাদ তেলে-বেগুনে চটিয়া উঠিয়া তাহাকে ঘরের ভিতর ডাকিয়া বলিলেন—“কোন্ বখত, তুমি কো চলা যাহেন বোলা অউর আব তক্ তুম বৈঠা হ্যায় ? চোরিকা মতলব হ্যায়—না ?”

সহি লইবার পর, ভৈরবপ্রসাদের আদেশে পিণ্ডন বখন চলিয়া যাইতেছিল সেই সময় ভৈরবপ্রসাদকে, টেলিগ্রাম পড়িয়া আনন্দ করিতে দেখিয়া, কিছু বখসিগ্ পাইবার আশায় সে, ঘরের বাহিরে দরজার কাছে বসিয়াছিল। এক্ষণে ভৈরবপ্রসাদের আদেশে ঘরে ঢুকিয়া সেলাম করিয়া বলিল—“হাম কোম্পানীকা নোকর্—চোরি করোগা কাহে ? তারুমে আচ্ছা খবরু আয়া ওহি বাস্তে কুছ বগসিস তো মিলনা চাহিয়ে।” এই কথা বলিয়া সে ভৈরবপ্রসাদের দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া দিল।

ভৈরবপ্রসাদ, তাহার প্রসারিত হস্তের উপর লাঠির একটি ঘা মারিয়া

বলিলেন—“তুম চমক্ লাগার দেকে হামকো ঘাবড়ার দিরাথা, অউর আভি বখসিস্ মাংতা ?”

একে কোম্পানীকা নোকর, তার উপর আবার—এখানে প্রথমে আশিয়া, একরূপ বিনাদোষে, অত ধমক্-ধামক্ খাইয়াছে। এখন—বখসিস্ দেওয়া দূরে থাক—পরিবর্তে চোর-বদনাম। পিওনটি ধৈর্য ধারণ করিতে পারিল না। সে একে ছোকরা তার উপর আবার পশ্চিম দেশীয় লৌক। কোনওরূপ বিদ্যা না করিয়া সে বলিল—“আরে জী তুম্ এতনা মোটা হোকে লেড়কাকা মাকিক ঘাবড়ায় গিয়া, ইসমে হামারা কসুর কেয়া ?”

মোটা লোককে মোটা বলিলে সে কিরূপ ভয়ানক রাগিয়া উঠে, তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। ভৈরবপ্রসাদকে মোটা না বলিয়া যদি শালা বলিত তাহা হইলে বোধ হয় পিওনের উপর তিনি এত চটিতেন না। ভৈরবপ্রসাদ তেলে-বেগুণে জলিয়া উঠিয়া, লাঠি লইয়া পিওনকে মারিতে উত্তত হইলেন। পিওনটি আর পশ্চাতে না চাহিয়া একেবারে লম্বা দৌড় দিল। ভৈরবপ্রসাদ, তাহাকে পরিবার জন্ত তাহার পিছনে তাড়া করিলেন এবং ঘর হইতে বাহির হইয়া মর্মর-প্রস্তর-মণ্ডিত বারান্দায় পদার্পণ করিবামাত্র তাহার খড়ম পিছলাইয়া গেল, তিনি “ওঁক্” করিয়া একটা শব্দ করিলেন এবং সবেগে একটি আছাড় খাইলেন। পিওন ততক্ষণে বারান্দা, বাগান, সদর দরজা পার হইয়া রাজপথে পড়িয়া, দৌড়ের মাত্রা দ্বিগুণ করিয়া দিল।

“উঃ” “আঃ” প্রভৃতি শব্দ করিয়া ভৈরবপ্রসাদ উঠিলেন এবং চাকর-বাকরদের ডাকিয়া—দৌড়াইয়া গিয়া পিওনকে ধরিতে এবং মারিতে,

ভুল-ভাঙ্গা

ঝারিতে তাঁহার নিকট আনিতে, আদেশ দিলেন।- তাহারা সব ছুটিয়া চলিয়া গেল। ভৈরবপ্রসাদ পুনরায় ঘরে গিয়া চেয়ারের উপর বসিলেন। ক্রিয়াক্ষণ পরে খুব হাঁক-ডাক করিতে করিতে চাকর-বাকরেরা ফিরিয়া আসিল এবং বলিল যে—“তাহারা বহু চেষ্টা করিয়াও সেই দুর্দান্ত পিণ্ডন ব্যাটাকে ধরিতে পারিল না।”

ভৈরবপ্রসাদ সরোষে গর্জন করিয়া বলিলেন—“তোরা এতগুলো লোক মিলে, একটা লোককে ধ’রতে পারিলি না? অকস্মাৎ-ধাড়ী ব্যাটারা সব। আজ সবাইকে ডিসমিস্ ক’রব।”

চাকরেরা বলিল—“হুজুর আমাদের কোনও দোষ নেই। আমরা পিণ্ডনটাকে একেবারে দেখতেই পেলুম না। বাড়ী থেকে বেরিয়ে সে যে কোন্ দিকে চলে গেল আমরা তা কিছুই দেখতে পেলুম না।”

ভৈরবপ্রসাদ বলিলেন—“সে কিরে ব্যাটারা এমন দিনের আলোয়, এই কাট্-ফাটা রোদুরে তোরা তাকে দেখতে পেলিনি। বুঝেছি, সব ব্যাটার এক সঙ্গে চোখ খারাপ হয়ে গেছে। যাও, তোমাদের এবার আর ডিসমিস্ করলুম না। কিন্তু শোন অযোধ্যা, এই সব ব্যাটার মাইনে কেটে প্রত্যেককে একখানা ক’রে চশমা কিনে দাও।”

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ।

“বেনারস-ক্যান্টনমেন্ট” বা “সিকরোল” রেল ষ্টেশনের প্লাটফর্মের উপর একটি ক্ষুদ্র জনতা, রেলের আগমন প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করিতেছে। অগ্নি বুদ্ধবার; শরৎচন্দ্রের প্রতীক্ষায়, ভৈরবপ্রসাদের ভাবী-জামাতা অযোধ্যা সাগ্রহে পারচারী করিতেছে। কিছুক্ষণ পরে “হুস্-হুস” শব্দে ট্রেন আসিয়া থামিল। চারিদিকে ছুটাছুটি পড়িয়া গেল। অযোধ্যা মনে, মনে ভাবিল যে—“আমি তো শরৎচন্দ্র, ফরৎচন্দ্র কাউকে চিনি না; এখন এই ভিড়ের মধ্যে আমি কি ক’রে তাকে খুঁজে বার করি? আচ্ছা এক কাজ করা যাক—এন্জিনের কাছ থেকে আরম্ভ ক’রে গার্ডের গাড়ী অবধি ঘুরে দেখি, তা হলেই সন্ধান পেরে যাবো। এই ভাবিয়া অযোধ্যা এন্জিনের দিকে চলিয়া গেল।

শরৎচন্দ্র একখানি টুরিষ্ট-কারে ভ্রমণ করিতেছিল। রেলপথে নিয়মাসু-সারে তাহার অধিকৃত সেই টুরিষ্ট-কার বা সেলুন-কারখানি একেবারে সব পিছনে অর্থাৎ গার্ডের গাড়ীর পিছনে জুড়িয়া দেওয়া ছিল। ষ্টেশনে গাড়ী থামিতেই শরৎচন্দ্র, মাতা ও মাসীমাতাঘর এবং সহচর-যুগলকে লইয়া প্লাটফর্মে নামিয়া পড়িয়া সহচরদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া বলিল—“জ্ঞাথ, আমাদের অন্ত সব মাল-পত্র এখন কিছুই নামিয়ে কাজ নেই কারণ আমার জন্তে ওই গাড়ীটা এইখানেই কেটে রাখবে। যা আর মাসীমাদের লেডিস্ ওয়েটিংরুমে বসিয়ে রেখে, চল আগে আমরা

ভুল-ভাঙ্গা

রিফ্রেশমেন্টরূমে গিয়ে কিছু থেরে নি।” এই কথা বলিয়া বিশ্রামাগারে স্ত্রীলোকদের বসাইয়া শরৎচন্দ্র সবাক্বে রিফ্রেশমেন্টরুম বা ভোজনাগারে প্রবেশ করিল। শরৎচন্দ্র যখন ভোজনাগারে প্রবেশ করিয়াছে— অযোধ্যা তখন ট্রেনখানির মাঝামাঝি-বরাবর-গাড়ীতে শরৎচন্দ্রকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে।

শরৎচন্দ্র সাহেবী পোষাক পরিধান করিয়া খুব কায়দা করিয়া সশব্দে পা ফেলিতে, ফেলিতে ভোজনাগারে আসিয়া একখানি টেবিল অধিকার করিয়া বসিল। তাহার সঙ্গের হরিচরণ ও মাদব, তাহার অনুকরণে পা ফেলিতে ফেলিতে আসিয়া সেট টেবিলের অন্য পার্শ্বস্থ দুইখানি চেয়ার টানিয়া বসিল। আজ ইহারা দুইজনেও সাহেব সাজিয়াছে। শরৎচন্দ্র ইহাদের জন্ত কতকগুলি সাহেবী পোষাক আনাইয়া দিয়াছে। প্রথমে সাহেবী পোষাক পরিতে পাইয়া ইহাদের আনন্দ আর ধরে না। কিন্তু তাহাদের এ আনন্দ বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না। পোষাক পরিবার কিছুক্ষণ পর হইতেই ইহারা দুইজনে বিষম অন্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। বাটি হইতে বাহির হইয়া হাবড়া স্টেশন অবধি কোনও রকমে উপস্থিত হইয়া ইহারা আর থাকিতে পারিল না; শরৎকে বলিল যে, “এ পোষাক পরিয়া তাহাদের বড়ই কষ্ট হইতেছে অতএব এখনই ইহা খুলিয়া ফেলিতে চার।” শরৎচন্দ্র বলিল—“না তা হ’তে পারে না একেবারে কানীতে গিয়ে বাসায় পৌঁছে তারপর পোষাক খুলবে। নইলে বড়ই অসভ্যতা প্রকাশ পাবে।” অবশেষে বহু কথা কাটাকাটির পর শরৎচন্দ্র বলিল যে—“ট্রেন ছেড়ে দিলে তার পরে পোষাক খুলবে তারপর আবার কাল সকালে কানীতে নামবার সময় পোষাক পরবে।”

ভুল-ভাঙ্গা

এ আদেশ তবু মনের ভাল—কোন ও রকমে কষ্ট সহ করিয়া ইহারা ট্রেন ছাড়া অবধি অপেক্ষা করিয়া 'রহিল এবং ট্রেন হাবড়া ত্যাগ করিলে ইহারা পোষাক ছাড়িয়া বাঁচিল এবং মনের সাধে সর্বান্ত্রে একবার সর্বান্ত্র চুলকাইয়া লইয়া তারপর অন্য কাজ করিল।

শরৎচন্দ্রের আদেশে অণ্ড মোগল-সরাই স্টেশন হইতে আবার ইহাদের সেই সাহেবী-পোষাক পরিতে হইয়াছে এবং অস্বস্তির চোটে ইহাদের প্রাণ ত্রাহি-মধুসূদন ডাকিতেছে। ট্রেন হইতে নামিয়া ভোজনাগারে প্রবেশ করিয়া শরৎচন্দ্র—তিনটি “ছোট্ট হাজরী” আনিতে বয়স্ক আদেশ করিয়া, হরিচরণকে বলিল—“রেল বেড়ানটা কি রকম লাগল?” হরিচরণ বলিল—“সুন্দর, অতি সুন্দর। কিন্তু বাবু এই সাহেবী-পোষাকটার জন্তে প্রাণটা বড় আই-টাই ক’রচে।”

মাধব বলিল—“ট্রেনে বেড়ানর সমস্ত আনন্দ এই এক ঘোঁড়ার ডিমের পোষাকের জন্তে একেবারে নষ্ট হ’য়ে গেল। পোষাকটা খুলে কেনিতে পারলে, যেন আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে। এই কাটের মতন শক্ত কলার প’রে আমার ঘাড়ে ষা ব্যাথা হয়েছে তাতে অন্ততঃ পক্ষে তিনজন লোককে দিয়ে—তিন দুগুণে ছয় সের তেল মালিস ক’রলে তবে যদি এ ব্যাথা যায়। উঃ তারওপর এই গ্যালিস্—ওঃ, কলারটা আমার মুণ্ডটাকে ঠেসে চেপে ধ’রে ওপর দিকে ঠেলে দিচ্ছে; আর গ্যালিস্‌টা কাঁধের ওপর ক’সে চেপে বসে গিয়ে দেহটাকে নীচের দিকে টানচে, এ দুয়ের মাঝখানে প’ড়ে আমার হতভাগ্য প্রাণ বেচারী—টাগ্-অব-ওয়ারের দড়ির অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে।”

শরৎচন্দ্র চোখ টিপিয়া ইসারা করিয়া বলিল—“চুপ, চুপ। ওসব

তুল-ভাঙ্গা

কথা এখন বন্ধ কর। কেউ যদি, শুনতে পার তো আমাদের নেহাৎ অসভ্য ঠাওরাবে।”

মাধব একটু উত্তেজিত ভাবে বলিল—“আরে মশাই আপনি তো বলছেন চুপ কর কিন্তু প্রাণটা যে কিছুতেই চুপ ক’রতে চাইছেন। এ শালার টানাটানির কষ্ট যদি বা সহ হয় কিন্তু চুলকুণীর কষ্ট কিছুতেই সহ ক’রতে পারছি না। এই ঘোঁড়ার ডিমের পোষাকে আলকুসির ঝুঁড়ো মাখান আছে কিনা জানি না, কিন্তু এটা পোরে অবধি বুক পিঠ, কোমর, উরোত, পা, হাত সব চুলকুচে : এদিকে কিন্তু পোষাকের এমনি মহিমা যে, চুলকুণীর চোটে সর্বাস্ত কুট-কুট ক’রে : উঠলেও চুলকোবার যো নেই। হাত থাকতেও ঝুঁটোর মতন চুপ ক’রে ব’সে এই নিদারুণ চুলকুণীর কষ্ট সহ ক’রতে হবে। ওহো—হো—হো—ওঃ গেছিরে, গেছিরে, আবার চুলকে উঠেছে। এতক্ষণ অন্য পাঁচটা কথায় এক রকম ভুলেছিলুম ; এই চুলকুণীর কথা : মনে হ’তে আবার সেই রকম চুলকে উঠলো। ওহো-হোঃ পিটটা চুলকুচে, বড্ড-চুলকুচে, গেছিরে বাবা—” এই কথা বলিয়া মাধব আর বাবুর অনুরাগিতার অপেক্ষা করিল না, তাড়াতাড়ি উঠিয়া, সেই কক্ষের দেয়ালের উপর নিজের পৃষ্ঠদেশ রাখিয়া খুব জোরে রগড়াইতে লাগিল। তাহার কাল কোটের উপর দেয়ালস্থিত চুণ লাগিয়া খানিকটা সাদা হইয়া গেল। ভোজনাগারে অবস্থিত সকলেই হোঃ-হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

• ৭২৮৩ তাহার উপর ভয়ানক বিরক্ত হইয়া উঠিল এবং সরোষ-কটাক্ষে তাহাকে নীরবে ভৎসনা করিল বটে ; কিন্তু তাহার কল্যাণ

সে মনের সাথে দেয়ালের উপর পিঠ বগড়াইয়া—“আঃ বাচলুম”—ইত্যাদি বলিতে, বলিতে দিয়া সপ্রতিভ ভাবে চেয়ারে আসিয়া বসিল।

তিনটি “ছোট্ট হাজরী” যথা সময়ে উপস্থিত হইল। খাণ্ড দ্রব্য আসিতেই মাধব ও হরিচরণ দুই মিনিটের মধ্যে সব খাণ্ড নিঃশেষ করিয়া দিল। পরে যখন সবে মাত্র একটি ডিমের পোচ খাইয়া, খানিকটা চা পান করিয়া আবার আর একটি ডিমের পোচ খাইবার নিমিত্ত মুখে তুলিয়াছে ; হরিচরণ তখন খাওয়া শেষ করিয়া একটি সিগারেট প্রায় শেষ করিয়া ফেলিয়াছে। সিগারেটে আর একটি টান দিয়া সেটি কেলিয়া দিয়া, টেবিল হইতে স্কাপ্কিন্ তুলিয়া লইয়া হরিচরণ খুব জোরে, জোরে ঘসিয়া নিজের মুখ মুছিল। মুখ মুছিতে, মুছিতে টেবিলের উপরস্থিত “ভিনিগার” ও “সশের” শিশির উপর হঠাৎ তাহার নজর পড়াতে সে স্কাপ্কিন্টি রাখিয়া দিয়া টেবিলের উপর হইতে টপ করিয়া “সশের” শিশিটি তুলিয়া লইয়া ছিপি খুলিয়াই, এক হাত দিয়া শিশিটি ধরিয়া নিজের মাথার উপর খানিকটা “সশ” ঢালিতে লাগিল এবং অন্য হাত দিয়া তাহা মাথার উপর খাড়াইয়া দিতে লাগিল।

এই বিসদৃশ ব্যাপারে সেখানকার সকলে, এমন কি খানসামাগণ পর্যন্ত হাসিতে লাগিল। পরে চন্দ্র একে মাধবের ব্যবহারে মুহা লজ্জিত ও বিরক্ত হইয়াছিল এক্ষণে হরিচরণের কাণ্ডে—সকলের সম্মুখে আবার এইরূপ ভয়ানক লজ্জা পাওয়াতে—ভয়ানক রাগিয়া উঠিল। সে রাগে অধীর হইয়া—কোনও কথাটি না বলিয়া—হরিচরণের হাত হইতে সেই “সশের” শিশিটি সজোরে কাড়িয়া লইয়া, সম্মুখ দিকে সবগে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। একটি বৃহৎ কাচ-নির্মিত-সো-কেস-আলমারীতে

ভুল-ভাঙ্গা

নানারূপ বিলাতী মণ্ডের বোতল সাজান ছিল—শরৎচন্দ্রের হস্ত-নিষ্কিপ্ত “সশের” শিশিটি সবেগে সেই সো-কেদ-আলমারীর উপর পড়িল এবং সশকে একখানি বৃহৎ কাচ ও কয়েকটি মদের বোতল ভাঙিয়া গেল।

ভোজনাগারের অধ্যক্ষের মুখের হাসি ছুটিয়া পলাইল। তিনি আরক্ত লোচনে, জ্রুটি করিয়া শরতের নিকট উপস্থিত হইয়া—তাহাদের পুলিশের হস্তে দিবার অভিপ্রায় জানাইলেন। শরৎ কোনও বাক্যব্যয় না করিয়া পকেট হইতে একতাড়া নোট বাহির করিয়া তাহার মধ্য হইতে আড়াই শত টাকার নোট লইয়া অধ্যক্ষের দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিল—“মশাই রাগ ক’রবেন না। আপনার যা ক্ষতি হয়েছে তার দ্বিগুণ টাকা আমি আপনাকে ক্ষতি-পূরণ স্বরূপ দিচ্ছি—দয়া ক’রে গ্রহণ করুন আর এটাকে একটা দৈবদুর্ঘটনা ব’লে মনে ক’রে নেবেন।”

নগদ করকোরে আড়াই শত টাকা পাইয়া অধ্যক্ষ একগাল হাসিয়া শরতের সহিত করমর্দন করিয়া বলিলেন—“অন্য লোক হ’লে আমি তাকে নিশ্চয়ই পুলিশে দিতুম কিন্তু আপনার মতন সম্মান লোকের বেলায় অন্য কথা। তা অনুগ্রহ ক’রে যখন এসেছেন তখন আর এক পেয়লা ক’রে চা খেয়ে যান।”

শরৎচন্দ্র পুনরায় সবাক্বে চা পান করিল। চা পান করিতে, করিতে হরিচরণকে বলিল—“দেখদেখি তোমার গাধামীর জন্তে আমার আড়াই—আড়াইশো টাকা মিছিমিছি বেরিয়ে গেল।”

হরিচরণ বলিল—“আপনি ও টাকা ফেরৎ নিন বাবু। ও ম্যানেজার আমাদের কিছুই ক’রতে পারবে না—আমি মারের চোটে সব ঠাণ্ডা ক’রে দৌব।”

ভুল-ভাঙ্গা

শরৎ বলিল—“থাক্ আর বীরভে কাজ নেই। পুলিশে দেবার নাম শুনে তখন তো ভয়ে কাঁপছিলেন। • আচ্ছা তুমি হঠাৎ “মশ্” মাথতে গেলে কেন?”

হরিচরণ বলিল—“আরে মশাই ও গুলো যে খালি সাজিয়ে রেখেছে—খদ্দেরে মাথলে যে, ওরা চোটে যায় তা কি ক’রে জানব বলুন। আমি মনে করলুম যে “রেনে বেড়িয়ে রাত্রিতে ঘুম না হ’লে মাথা ধরলে লোকে ওইগুলো মেখে মাথা ঠাণ্ডা ক’রবে—এই জন্তে ওই শিশিগুলো টেবিলের ওপর সাজিয়ে রেখেছে।” এই ভেবে আমি ওই শিশি থেকে খানিকটা মাথায় মেখেছিলুম—এতে মে এত হ্যান্ডাম হ’তে পারে তা জানতুম না।”

শরৎ বলিল—“সে কি হে—ওগুলো যে খাবার জিনিস; তুমি মাথায় মাখতে গেলে কোন আক্কেলে।”

হরিচরণ বলিল—“ওহো তাই বটে, তাই এত গোলমাল—ওগুলো খাবার জিনিস? আরে মশাই আপনি বাড়ীতে সব ওই রকম শিশিতে ওই রকম রন্ধের জিনিস নিয়ে মাথায় মাখেন না, আমি তাই মনে ক’রে ওটা মাথায় মাখতে গেছিলুম।”

শরৎ বলিল—“আরে মুখু’র আমি তো বাড়ীতে যা মাথায় মাখি সেগুলো হচ্ছে (Lotion) লোসান। বাক, এখন এস; আর ওরকম মুখতা ক’র না।

অধ্যক্ষের নিকট হইতে বিদায় লইয়া তিনজনে ভোজনাগার হইতে বাহির হইল। আসিবার সময় মাধব আপন মনে বলিল—“বাবু যা মাথায় মাখেন সেটা হ’ল লোসান। আমরা তো জানি বাবা, যা ধুতে হ’লে লোসান দিয়ে ধুতে হয়।”

উনবিংশ পরিচ্ছেদ !

অযোধ্যানাথ ষ্টেশনের ভিতরে অনেক অনুসন্ধান করিয়াও শরৎচন্দ্রের কোন সন্ধান পাইল না। কিয়ৎক্ষণ পরে ট্রেনখানি ষ্টেশন পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। অযোধ্যা বাহিরে চলিয়া আসিয়া একবার অনুসন্ধান করিল এবং যে সকল যাত্রী সহরের ভিতর যাইতেছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকের নিকট—“মোশাই কি কালকাতা হোতে আসছেন—আপনার নাম কি শোরোত বাবু”—এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া কিন্তু শরতের কোনও সন্ধান পাইল না! তাহাকেই উক্ত কথা জিজ্ঞাসা করে সেই-ই তাহার উত্তর না দিয়া তাহাকেই আবার একটা প্রশ্ন করিয়া বসে। কেহ বলে যে—“তুমি কি পুলিশের গোয়েন্দা?” কেহ বলে যে—“তুমি কি বাইজীর দালাল?” অযোধ্যা বিরক্ত হইয়া ষ্টেশনের ভিতর চলিয়া গেল। সেখানে কোনও যাত্রীকে দেখিতে না পাইয়া পুনরায় ষ্টেশনের বাহিরে চলিয়া আসিয়া বাটী ফিরিবাদ্ধ উদ্যোগ করিতেছে এমন সময় একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল যে, তিনটি লোক ষ্টেশনের ওভার-ব্রীজ বা ‘লাইন পার হইবার পুলের’ উপর দাঁড়াইয়া আছে এবং তাহাদের মধ্যে একটি লোক তাহার দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া পার্শ্ববর্তী লোককে কি বলিতেছে।

ভোজনাগার হইতে বাহির হইয়া শরৎচন্দ্র একবার ষ্টেশনের ভিতরে অনুসন্ধান করিয়া সেই ওভার-ব্রীজের উপর আসিয়া হরিচরণকে সম্বোধন

ভুল-ভাঙ্গা

করিয়া বলিল—“আমাদের, খেতে গিয়ে দেবী হওয়াতে ভৈরব বাবুর লোক কিরে গেছে ; এখন কি করা যার ? আমি তো এখানে কখনও আসিনি, তার বাড়ীও চিনি না।”

হরিচরণ বলিল—“চলুন গাড়ীভাড়া কর। যাক—গাড়োয়ানকে ঠিকানা ব’লে দিলে সে বোধ হয় ঠিক নিয়ে যেতে পারবে।”

এইরূপ কথা কহিতে, কহিতে অগ্রসর হইয়া পুলের নীচে, অযোধ্যাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া শরৎচন্দ্র বলিল—“দেখ ঐ যে একটা লম্বা তাল-পাতার-সেপাইয়ের মতন লোক, পারজামা পোরে আর খুব জবর পাগড়ী মাথায় দিবে দাঁড়িয়ে আছে, ঐ লোকটার কাছে গিয়ে ভৈরব প্রসাদ বাবুর বাড়ীর খোজ নাও দেখি। লোকটাকে দেখলে ভদ্রলোক আর পরসাতলা লোক হ’লে মনে হয়—ও বোধ হয় ঠিক সন্ধান দিতে পারবে। আর দেখ, বেশ বিনয়ের সঙ্গে, ভদ্রতার সঙ্গে কথা বোলো ; নেহাৎ অসভ্যতা ক’র না। ওখানে যেমন কেলেকারী করে এলে, সে রকম কিছু ক’রে কাশী সহরে যেন আমার নাম ডুবিও না।”

হরিচরণ—“যে আজ্ঞে—” বলিয়া একটু দ্রুতপদে নামিয়া আসিয়া অযোধ্যার নিকট উপস্থিত হইয়া, প্রথমে খুব লম্বা একটা সেলাম করিয়া বলিল—“এঃ, এঃ ভাই লটপট সিং, হামকো একোটা কথার উত্তর দয়া করে দেগা ?”

অযোধ্যা সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—“কেয়া বাৎ বোলো।”

হরিচরণ তাহার মুখের কাছে হাত নাড়িতে, নাড়িতে বলিল—“কি মুন্সিল, বাত কেয়া ? বাত নয়, বাত নয়, বরঞ্চ ডিস্‌পেন্‌সিয়া বোলনে

ভুল-ভাঙ্গা

পারত। তা বরং একটু আধটু আছে। ইং সেই ডিস্‌পেন্‌সিয়ার সারানেকা বাস্‌তে আর বায়ু-ভক্ষণকা বাস্‌তে এই প্রদেশমে আয়া। কিন্তু সে জন্তে তুমকো ইংকা ডাকা নেই। হামরা একটা অস্ত্র—”

অযোধ্যা তাহাকে মাতাল মনে করিয়া, ঘৃণাভরে মুখ ফিরাইয়া লইয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। হাতের শীকার পলায় দেখিয়া হরিচরণ মহা ব্যস্তভাবে ঈষৎ উচ্চস্বরে বলিল—“ও, ও ভাই লটপট সিং তুম বুঝি ডাক্তার? হামারা ব্যায়রামকা কথা বোলা নেই ব’লে রাগ ক’রে চলে যাতা? তা ভাই একান্তই যদি গোসা করকে চলে যাবে তাহলে ইংয়াকা একোটা বড়া লোককো বাড়ী কাঁহা, রোলকে যাও।”

একজন বড় লোকের বাড়ী খুঁজিতেছে শুনিয়া গমনোদ্যত অযোধ্যা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—“কোন বড়া আদমী, নাম বোলো।”

হরিচরণ বলিল—“তুম্, ভৈরব প্রসাদ—ভৈরব প্রসাদ, আহা কি যে ছাই ভুলে যাচ্চি; ইং, ইং তুম্, ভৈরব প্রসাদ মেড়ুরাবাজীকা বাড়ী জানতা?”

অযোধ্যা সাগ্রহে বলিল—“আপ্ কেয়া কালকাতাসে আতে হেঁ?”

হরিচরণ সগর্বে বলিল—“ইং-হেঁ। তুম্ কি সেই মেড়ুরাবাজীকা মোসাহেব?”

অযোধ্যা সর্বিনয়ে বলিল—“ইং, হাম আপকো তাঁবেদার।”

হরিচরণ, আপ্যায়িতের ভাব দেখাইয়া বলিল—“তা ভাই তাঁবেদার, হাম, তুমকো চিনতে না পেরে যদি হু একোটা ধুষ্টতার কথা বোলে থাকি তো হামাকে মাফ্ করো ভাই।” এই বলিয়া পুনঃ পুনঃ সেলাম করিল।

ভুল-ভাঙ্গা

অযোধ্যাও পুনঃ পুনঃ সেলাম করিতে করিতে বলিল—“আরে ও
কেয়া বাৎ—আপ হামকো মাফ্ কিজিয়ে, আপ হামকো মাফ্ কিজিয়ে—
হামতো, আপকা গোড়কা ময়লা।”

হরিচরণ দাঁত মুখ খিঁচাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—“আরে ভাই
হামিও, তোমার বাড়ীর নর্দমার শ্যাওলা, উত্তুনকা কয়লা, গরুকা
গরলা—”

দুইজনে কিছুক্ষণ ধরিয়া সেলাম বিনিময়ের পর, শরতের নিকট উপস্থিত
হইল এবং আলাপ পরিচয়ের পর সকলে মিলিয়া, ভৈরবপ্রসাদের প্রেরিত
কোতোয়ালী-জুড়ীতে চড়িয়া ট্রেন পরিত্যাগ করিল।

—

বিংশ পরিচ্ছেদ ।

ভৈরবপ্রসাদ মধ্যাহ্নের আহার সমাপনান্তে তাঁহার ড্রিং রুমের মধ্যস্থলস্থিত তাকিয়া বেষ্টিত ঢালা-বিছানার উপর চিং হইয়া শয়ন করিয়া আছেন । এবং গড়গড়ার নল মুখে লাগাইয়া তামাকু সেবন করিতেছেন । তিনি শরতের আগমন প্রতীক্ষায় বিশেষ উৎকণ্ঠিত রহিয়াছেন এবং মধ্য, মধ্য চার, পাঁচটা পান লইয়া এক সঙ্গে মুখের ভিতর ফেলিয়া দিতেছেন ও গাল ফুলাইয়া ‘চপৎ চপৎ’ শব্দ করিতে করিতে পান চিবাইতেছেন । তাঁহার কন্যা লছমী, নিকটে একখানি চেয়ারে বসিয়া পশমের গেঞ্জি বুনিতোছে ।

কিয়ৎকাল অতীত হইবার পর অযোধ্যা একটু দ্রুতপদে সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল—“আপনার বন্ধু-পুত্র এসেছে ।”

“এসেছে—”এই কথা বলিয়া মহা আনন্দিত ভাবে ভৈরবপ্রসাদ উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং তিনি দ্বারের দিকে একটু অগ্রসর হইতেই—শরৎচন্দ্র আসিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিল । ভৈরবপ্রসাদ একগাল হাসিয়া বলিলেন—“এস, এস বাবা । এই বাড়ী, ঘর, দোর, জানলা, সারী, খাট, পালঙ, টেবিল, চেয়ার, হারমনিয়ম, পিয়ানো, গ্রামোফোন, সব তোমার নিজের ব’লে জানবে । এ সব নিজে তোমার যা ইচ্ছে তাই ক’রবে । তোমার ইচ্ছে হয় তো এ সব ভেঙ্গে ফেলে দিও ; আর না হয়তো এ সব রেখে দিও—বুঝলে ? তোমার স্বর্গগত পিতা আমার পরম বন্ধু ছিলেন ।” এই কথা বলিয়া তিনি, দুই হাত দিয়া শরৎকে জড়াইয়া ধরিলেন ।

ঈশ্বর মস্তক অবনত করিয়া শরৎ বলিল—“আপনি আমার প্রীতিপূর্ণ অভিবাদন আর সৌজন্যপূর্ণ সম্ভাষণ জানবেন। আপনাকে আমি পিতার মতই দেখব।”

ভৈরবপ্রসাদ আনন্দে গলিয়া গেলেন। তিনি আনন্দে গদগদ হইয়া বলিলেন—“বড় আনন্দ দিলে বাবা—প্রাণে বড় আনন্দ দিলে।” এই বলিয়া তিনি শরতের চিবুকে হাত দিয়া, সেই হাতটী চুম্বন করিলেন এবং তাঁহার সেই বিশাল হস্ত বিস্তার করিয়া শরতকে তাঁহার বিশাল উদরের উপর চাপিয়া ধরিয়া স্নেহে আলিঙ্গন করিলেন।

ভৈরবপ্রসাদ শরতের অপেক্ষা অধিক লম্বা ছিলেন, এই জন্য শরৎ একটি লম্বা দিয়া উচ্চে উঠিয়া—“Dady, Dady, Dear Dady—” বলিতে বলিতে ভৈরবপ্রসাদের গালে একটি প্রচণ্ড চুমু খাইল। ভৈরব প্রসাদের গালে খুব খানিকটা থুতু লাগিয়া গেল। স্নেহের চুম্বনে থুতু লাগিয়া গেল এই জন্য তিনি কিছু বলিতে পারেন না এই ভাবে অথচ ঘণায় নাক মুখ সিঁটকাইয়া, এক হাতে গাল মুছিতে, মুছিতে এবং অন্য হাত দিয়া লছমীকে দেখাইতে, দেখাইতে বলিলেন—“শরৎ, এইটি—এইটি আমার একমাত্র কন্যা লছমী। খুব শিক্ষিতা, নব্য-ভাবে দীক্ষিতা, সমস্ত রকম কুসংস্কার থেকে সদত্তে রক্ষিতা—এক কথায়, এক কথায়—আমি একে ঠিক—”

ভৈরবপ্রসাদের কথা শেষ হইবার পূর্বেই, শরৎচন্দ্র দ্রুতপদে লছমীর নিকট উপস্থিত হইল এবং তাহার কোলের উপর পতিত তাহার হাতখানি তুলিয়া লইয়া করমর্দন করিতে, করিতে বলিল—“আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়াতে বড় সুখী হ’লুম। আর নিজেকে

ভুল-ভঙ্গী।

অতীব ভাগ্যবান মনে ক'রলুম।" এই কথা বলিয়া শরৎ ধপাস করিয়া লছমীর পাশের চেয়ার খানিতে বসিয়া পড়িল।

শরৎচন্দ্র বসিবার পর ভৈরবপ্রসাদ সেই ঢালা বিছানার উপর যাইয়া বসিলেন এবং অযোধ্যাকে নিকটে বসাইলেন। দুই, চারিটা পান মুখে দিয়া খুব হাত, মুখ নাড়িতে, নাড়িতে ভৈরবপ্রসাদ—শরতের পিতার সম্বন্ধে নানারূপ পুরাতন গল্প বলিতে লাগিলেন। শরৎ গল্প শুনিতে শুনিতে মধ্যে মধ্যে—“হ্যাঁ, আজ্ঞে হ্যাঁ”—বলিতেছে বটে কিন্তু তাহার মনটা সম্পূর্ণরূপে লছমীর বিষয় চিন্তা করিতেছে এবং তাহার দৃষ্টিও, বেশীর ভাগ লছমীর দিকেই নিবদ্ধ রহিয়াছে।

শরৎ সবেগে আসিয়া হঠাৎ তাহার হাত তুলিয়া করমর্দন করাতে এবং তাহার গাত্র ঘেসিয়া ওইরূপ ভাবে বসাতে লছমী অতীব লজ্জা ও কেমন এক রকম অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। অঞ্চ নব-সভ্যতার খাতিরে হঠাৎ উঠিয়াও যাইতে পারিতেছিলনা। এক্ষণে হঠাৎ—দূরে টেবিলের উপরস্থিত পশমের গোলার উপর—নজর পড়াতে, সে পশম লইবার অছিলায় সেই টেবিলের কাছে উঠিয়া গিয়া পশমের গোলাটি তুলিয়া লইল এবং ঐ টেবিলেরই পার্শ্বস্থিত কতকগুলি চেয়ারের মধ্যে একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া সেই গেঞ্জি বুনিতে লাগিল এবং মধ্যে, মধ্যে কোতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে শরতের দিকে চাহিয়া, তাহার ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া মুচকি-হাসি হাসিতেছিল।

শরৎচন্দ্র মহা ক্ষুণ্ণভাবে ভৈরবপ্রসাদের সহিত দুই একটি বাজে আলাপ করিয়া বলিল—“আপনার বিদ্যুৎ কন্টার সঙ্গে দু' চারটে, শিক্ষা সম্বন্ধে আলাপ করা যাক। এমন শিক্ষিতা মহিলার সঙ্গে, যখন ভাগ্যগুণে

ভুল-ভাঙ্গা

পেরেছি তখন সে শুভ-অবসর ত্যাগ করা উচিত নয়।” এই কথা বলিয়া শরৎচন্দ্র টপাক করিয়া উঠিয়া পড়িয়া সেই টেবিলের নিকট চলিয়া গেল এবং লছমীর পার্শ্বের চেয়ারে তাহার গা ঘেসিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিল—
“আপনার মতন রূপবতী, গুণবতী হিলার সঙ্গে আলাপ ক’রতে এলুম—
বুঝলেন? আপনার পিতামহাশয়ের কাছে শুনলুম যে, আপনি অনেক
পাশ্চাত্য লেখকের বই প’ড়েছেন। আচ্ছা, আলেকজান্ডার ডুমার লেখা,
আপনার কেমন লাগে?”

আরক্তমুখী লছমী মৃদুস্বরে বলিল—“এ’র কোনও বই আমি পড়িনি!”

ইহাদের এইরূপ ভাবের দুই চারিটা কথাবার্তা হইতে লাগিল।
শরতের এইরূপ ব্যবহারে অযোধ্যা কিন্তু মহা বিরক্ত হইল; সে
মনে মনে অত্যন্ত চটিয়া উঠিল। সে ভৈরবপ্রসাদকে চুপি চুপি বলিল—
“আপনার বন্ধু-পুলের এ কি রকম ব্যবহার! আপনি লছমীকে অন্তরে
যেতে বলুন।”

ভৈরবপ্রসাদ ধীরভাবে বলিলেন—“কেন—ও, এটিকেট-বিরুদ্ধ কোনও
কিছু করেনিতো। ওর সঙ্গে লছমীকে Introduce ক’রিয়ে দিলুম—
আর ও তার সঙ্গে আলাপ ক’রবে না? নব্য-চালে বিশেষ দক্ষ বলে
আমার সুনাম আছে; লছমীকে এখন অন্তরে যেতে বললে, আমার
সুনামে আঘাত পড়বে। তুমিওতো নব্য-চাল ভালবাস, তুমিওতো এই
রকম ভাবের স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী—তোমার মুখে এ কথা শোভা
পায় না। হিঃ, হিঃ।”

অযোধ্যা মুখে আর কোনও কথা বলিতে পারিল না; কিন্তু
তাহার বুকের ভিতর ঘোড়-দোড় হইতে লাগিল।

ভুল-ভাঙ্গা

অল্পক্ষণ পরে ভৈরবপ্রসাদ বলিলেন—“আচ্ছা তোমার মার, আমার স্বর্গগত-প্রিয়তম-বন্ধুর পত্নীর যে ‘এখানে আসবার কথা ছিল, কই তিনি এলেন না তো?’

শরৎচন্দ্র তাচ্ছিল্যভাবে বলিল “সে এসেছে তো। আমার দুই মাসীও এসেছে—তারা সব গাড়ীতে বসে রয়েছে। আমি আপনার সঙ্গে আলাপ করবার জন্তে আগে এলুম, তারপর—”

ভৈরবপ্রসাদ ব্যস্তভাবে বলিলেন—“ব্যাঁ সে কি কথা! তাঁরা সব গাড়ীতে বসে রয়েছেন কি! চল, চল, তাঁদের নিয়ে আসি চল। চল মা লছমী আমার সঙ্গে চল।”

শরৎ বলিল—“আপনি যান। আমি আর যেতে পারি না। আমি ততক্ষণ আপনার এই গড়গড়াটার একটু তামাক খাই। এই বলিরাই গড়গড়ার নলটি মুখে দিয়া শরৎ, ধূমপান করিতে লাগিল।

ভৈরবপ্রসাদ ব্যস্তভাবে বলিলেন—“আহা-হা কর কি, কর কি! যাঃ গড়গড়াটা মেরে দিলে? তা যাকগে, ওটা বদলে ফেলব এখন।”

শরৎ উপহাসের-হাসি হাসিয়া বলিল—“আপনার ঐ সব কুসংস্কার আছে নাকি? আমি তো শুনেছি যে, আপনি একজন সভ্য ও শিক্ষিত এবং আলোকপ্রাপ্ত লোক। আমি, আপনার গড়গড়াটা টেনে তাহলে আপনার জাত মেরে দিয়েছি বলুন—হাঃ, হাঃ, হাঃ।”

ভৈরবপ্রসাদ একটু হাস্ত করিলেন মাত্র। তাহার কথার কোনও উত্তর না দিয়া, লছমী ও অষোধ্যাকে লইয়া প্রস্থান করিলেন।

শরৎচন্দ্র এতদিন কেবল, পুস্তকেই স্বাধীনতার কথা পড়িয়া-ছিল এবং দূর হইতে স্বাধীনা-স্বাধীনলোকদের দেখিতে মাত্র পাইয়া-

‘ভুল-ভাঙ্গা

ছিল। কখনও কোনও স্বাধীনতা ও আলোক-প্রাপ্তা যুবতীর সহিত মেলামেশা করিতে পার না। এক্ষণে লছমীকে দেখিয়া, তাহার সহিত কথাবার্তা কহিয়া, তাহার চাল-চলন দেখিয়া সে কেমন এক রকম ভাবাচাচা মারিয়া গেল। তাহার মনে হইতে লাগিল যে, সে যেন—এতদিনকার ভোগ করা পুরাতন পৃথিবী ছাড়িয়া আজ কোনও নূতন পৃথিবীতে আসিয়াছে। শরতের মনে বরাবরই বড় সাধ যে, সে স্বাধীন প্রেম করিবে; আজীবন স্বাধীন ও সভ্য প্রেমের সমুদ্রে স্বাধীন ও সভ্য ভাবে সন্তরণ করিবে। আজ, বহুদিন পরে, তাহার মনের বাসনা পূর্ণ হইবে মনে করিয়া সে আনন্দে অধীর হইল। লছমীকে দেখিয়া সে, মনে মনে স্থির করিল যে, “এই লছমীকেই আমার প্রথম প্রেমের সঙ্গিনী ক’রব। এ রকম শিক্ষিতা, সভ্যা না হ’লে কি বিয়ে ক’রে সুখ হয়। এর সঙ্গে প্রথমে দিনকতক কোর্টসিপ ক’রব তারপর একে বিয়ে ক’রব। এ রকম স্ত্রীলোক পেলে আমি একশোবার বিয়ে ক’রতে রাজী আছি। এর সঙ্গে বিয়ে হ’লে আমি সুখীও হব। লছমীকে প্রথমবার দেখেই আমি ভালবেসে ফেলেছি। ভৈরবপ্রসাদ যে রকম শিক্ষিত ও নব্য ধরণের সভ্য তাতে সে কখনই আমার সঙ্গে লছমীর বিয়ে দিতে আপত্তি করবে না। আর লছমীও যে আমার ভালবেসে ফেলেছে সে বিষয়েও কোনও সন্দেহ নেই। আমার এই সুন্দর রূপ, এই সুন্দর চেহারা দেখে কোন্ স্ত্রীলোক আমার না ভালবেসে থাকতে পারে? আমার রূপ দেখে কত শালা পুরুষের মুণ্ড ঘুরে যার; ও তো সামান্ত একটা স্ত্রীলোক। আমার যদি লছমী ‘ভালবেসে’ না কিনে

ভুল-ভাঙ্গা

তা হ'লে ঐ অলঙ্কণ মাত্র আমার সঙ্গে কথা কইতে কইতে অন্ততঃ পঞ্চাশ বার আমার দিকে আড়-চোখে চেয়ে দেখছিল কেন? আমার কথার উত্তর দেবার সময় অমন মুচকি-হাসি ভাসছিল কেন? যখন এই ঘর থেকে চলে যায় তখনও ফিরে, ফিরে আমার দিকে চেয়ে দেখতে, দেখতে যায়। এ সমস্তই প্রেমের লক্ষণ—আমি কি কিছু বইতে পড়িনি যে, এ সব বুঝতে পারব না। আহা-হা লছমীরে—”এই কথা বলিয়া শরৎচন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইল এবং লছমীর পরিত্যক্ত উলের গোলা এবং প্রায়-সমস্ত-বোনা-গেঞ্জিটি তুলিয়া লইয়া তাহাতে দুই চারিটি চুসন করিল। দুই চারিটি চুসনের পর তাহা একবার বক্ষে চাপিয়া ধরিল এবং সেটিতে পুনরায় যেই চুসন করিতে যাইবে অমনই অযোধ্যা সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। অযোধ্যাকে সহসা প্রবেশ করিতে দেখিয়া, শরৎচন্দ্র সেই উলের গেঞ্জিটি দেখিয়া যেন চমৎকৃত হইয়া গিয়াছে, এইরূপ ভাব দেখাইয়া এবং এইরূপ ভাবে ঐ গেঞ্জিটি দেখিতে দেখিতে উচ্চৈঃস্বরে বলিল—“বাঃ, বাঃ, ইয়ে থাসা চিজ হায়; অতীব সুন্দর দ্রব্য হায়। যো আদমী—ওহো-হো I mean যো আদমিনী এই থাসা চিজঠো কুরুস্কাটি দেকে বোনা হায়, সে নারী কুলে ধন্তনি, তার জন্ম সার্থকনি, তার বোনা কৃতার্থনি। মিষ্টার অযোধ্যানাথ বাবু, এই সুন্দর, সুঠাম, সুবোনা গেঞ্জিটি প্রথমে কোনও International Exhibition (আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে) পাঠিয়ে দেবেন; তাহলে পৃথিবীময় আমাদের জাতির একটা সুনাম বেরিয়ে যাবে। তারপর এটিকে মিউজিয়মে পাঠিয়ে দেবেন; তারা—“আদর্শ শিল্প” ব'লে এটিকে সম্বন্ধে রক্ষা ক'রবে, রক্ষা ক'রতে গৌরব বোধ ক'রবে; রক্ষা ক'রে গৌরবান্বিত হবে।”

ভুল-ভাঙ্গা

এই সব দেখিয়া অযোধ্যার পিত্তি জলিয়া যাইতেছিল। সে,
এ সকল কথার কোনও উত্তর, না দিয়া গম্ভীর ভাবে বলিল—
“আপ ইনার আইয়ে, ভৈরবপ্রসাদ বাবু, আপকো অন্দরমে বোলাতেই।”

শরৎ এক মুখ হাসিয়া বলিল—“ব্যাঁ, আমাকে অন্দরমে বোলাতেই—
তা চলুনই, আমি আপকো পশ্চাত্তাগমে, পশ্চাত্তাগমে যাচ্ছি হেঁ।”

একবিংশ পরিচ্ছেদ ।

ভৈরবপ্রসাদের উদ্যান-বাটীর দুই প্রান্তের প্রাচীরের নিম্ন দিয়া দুইটা লাল কাঁকর দেওয়া রাস্তা—উদ্যানের মধ্যস্থিত অট্টালিকার সম্মুখ হইতে আসিয়া—একেবারে সদর ফটকে রাজপথে মিশিয়াছে । দক্ষিণ প্রান্তের রাস্তার পার্শ্বে ফোয়ারা ও নানারূপ ফুলের গাছ সাজান আছে এবং বাম প্রান্তের রাস্তার পার্শ্বে একটি সুন্দর ও সুপরিষ্কৃত, শ্যামল-তৃণরাজি-শোভিত মাঠ । সেই মাঠের উপর লছমী, তাহার সঙ্গিনীদের লইয়া টেনিশ খেলিতেছে । লছমীর সঙ্গিনীদের কথা আমাদের পুস্তকের প্রথমাংশে বিস্তারিতভাবে বলা হইয়াছে সুতরাং বাহুল্য ভয়ে তাহার আর পুনরুক্তি করিলাম না । লছমীদের খেলা খুব জমিয়া গিয়াছে । তাহার বিপক্ষ-পক্ষরা তিনটা 'Love Game'এ হারিয়া, খুব জোর খেলা আরম্ভ করিয়াছে কারণ সন্ধ্যা হইতে আর বিলম্ব নাই—এই সময়ের মধ্যে যদি তাহারা কিছুও প্রতিশোধ দিতে পারে ।

শরৎচন্দ্র, আজ তের দিন হইল কানীতে রহিয়াছে । কানীতে সাত দিন থাকিবার কথা হইলেও সে, কানী ত্যাগ করে নাই । লছমীর রূপমোহে ও তাহার নব্য ধরণ-ধারণ ও কামদার-মোহে শরৎচন্দ্র একেবারে মজিয়া গিয়াছে । লছমীর প্রেম-সাগরে পড়িয়া সে একেবারে নাকানি-চোবানি খাইতেছে । লছমীকে বিবাহ করিবার জন্য সে পাগলের মতন হইয়া উঠিয়াছে । ষত দিন যাইতেছে ততই তাহার—লছমীকে পাইবার নেশা

ভুল-ভাল

বাড়িয়া উঠিতেছে। এই কয়দিন সে নানান ছুতার, যখন-তখন লছমীর নিকট উপস্থিত হইবার চেষ্টা করিত কিন্তু—এক মধ্যাহ্নকাল ও রাত্রি নয়টা, সাড়ে-নয়টা ভিন্ন—সে লছমীর সঙ্গ-সুখ পাইত না। কারণ সকালে ও সন্ধ্যাকালে : লছমী, অযোধ্যার কাছে পড়াশুনা করে এবং বৈকালে, সঙ্গিনীদের লইয়া টেনিস খেলে কিংবা তাহাদের বাটীতে বেড়াইতে যায়। মধ্যাহ্নকালে যদি বা লছমীর দেখা পাওয়া যায়, সে সময় ভৈরবপ্রসাদ ও অযোধ্যা তাহার কাছে থাকে। আর রাতে ভৈরবপ্রসাদ যখন বন্ধু-বান্ধব লইয়া তাম খেলা ও গল্প গুজব করেন সেই সময় একবার—তাও সন্ধ্যাকালীন পাঠাদি সমাপনের পর লছমী মাত্র ঘণ্টাখানেকের জন্য—সেইখানে খাটয়া বসে। লছমীকে একাকিনী পাইবার জন্য শরৎ বহু চেষ্টা করিয়াও সফলকাম হওয়া দূরে থাক পরিবর্তে বরং অযোধ্যার আকুটী-ভঞ্জে তাহাকে সম্বাসিত হইতে হইয়াছে। শরতের মনে দৃঢ় ধারণা যে, তাহার রূপে লছমীও মোহিত হইয়া তাহাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে কিন্তু স্ত্রী-সুলভ লজ্জার বশবর্তী হইয়া মুখ ফুটিয়া কিছু ব্যক্ত করিতে না পারিয়া— তাহারই মতন ছটকট করিতেছে। এখন যদি একবার ইহাদের দুইজনের নির্জনে সাক্ষাৎ হইয়া যায় তাহা হইলে দুইজনে পরস্পরের প্রতি প্রেম-জ্ঞাপন করিয়া বিবাহের দিন স্থির করিয়া ফেলে এবং অযোধ্যাকে কি ভাবে তাড়ান হইবে, সেই মতলব আঁটে। শরৎচন্দ্র দিবারাত্র এই চিন্তায় মগ্ন। শরনে, স্বপনে, আহারে, বিহারে কোনও সময়ই এ চিন্তার আর বিরাম নাই। অপরাহ্নে সেইরূপ ভাবে অঙ্গরাগ ও সাজ-সজ্জা করিয়া, প্রায় সন্ধ্যার সময় চা-পান করিয়া শরৎচন্দ্র ছড়ি ঘুরাইতে, ঘুরাইতে সবাক্বে বেড়াইতে বাহির হইল। ভৈরবপ্রসাদের উদ্যান-বাটীর ঠিক

ভুল-ভাঙ্গা,

মধ্যস্থলে অট্টালিকা অবস্থিত এবং অট্টালিকার চারিপাশে উঠান। অট্টালিকার সম্মুখভাগের উঠান “বাহিরের বাগান” এবং পশ্চাভাগের উঠান পিছনকার বাগান “বলিয়া পুরবাসীদের দ্বারা অভিহিত হইত এ কথা বোধ হয় আপনাদের মনে আছে। এই “পিছনকার বাগানে” ফুলের বাগান, মর্শ্বর বেদী মর্শ্বর-পুস্তলিকা প্রভৃতি সজ্জিত আছে এবং ইহার বাম দিকে একটি ছোট দ্বিতল বাটী ও তাহার সম্মুখে একটি বৃহৎ পুষ্করণী আছে। লছমীর মাতা যখন জীবিতা ছিলেন সেই সময় তিনি এই ছোট বাড়ীটিতে আপনার পূজাৰ্চনা প্রভৃতি করিতেন। শরৎচন্দ্রের থাকিবার জন্য ভৈরব-প্রসাদ এই বাটীটি পরিষ্কার করাইয়া রাখিয়াছিলেন। এই বাটীতে থাকিলে—শরৎচন্দ্রের বিধবা মাতা ও মাসীমাতাদের কোনও রকম অসুবিধা হইবে না বলিয়া, এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল।

শরৎচন্দ্র প্রতিদিন দুই বেলা বেড়াইতে যাইত। অল্প বেড়াইতে বাহির হইয়া “সামনের বাগানের” দক্ষিণ প্রান্তস্থিত রাস্তার উপর দিয়া, সদর রাস্তার উদ্দেশে যাইবার সময় দেখিল যে, লছমী ও তাহার সঙ্গিনীগণ টেনিস খেলা শেষ করিয়া, তাহাদের হস্তস্থিত র্যাকেটগুলি একখানি লৌহ নির্মিত বেঞ্চির উপর রাখিয়া দিয়া—বাগানের বাম-প্রান্তস্থিত রাস্তার উপর দিয়া, অট্টালিকার অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। যাইবার সময়—অপর প্রান্তস্থিত রাস্তার উপর শরৎকে দেখিয়া লছমী ঈষৎ হাস্ত-সহকারে, কোমর হইতে ক্রমালখানি টানিয়া লইয়া উর্দ্ধে আনোদিত করিল। এই দৃশ্য দেখিয়া শরৎচন্দ্র ‘আনন্দে আটখানা’ হইয়া পকেট হইতে ক্রমাল বাহির করিয়া প্রথমটার ঐরূপ ভাবে আনোদিত করিয়া অবশেষে তাহার ছড়ির ডগায় ক্রমালখানি বাধিল এবং তাহা উর্দ্ধে তুলিয়া

ঘন, ঘন নাড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে রুমালখানি পকেটে পুরিয়া সে হস্ত দ্বারা ঘন, ঘন ইঙ্গিত করিয়া, লছমীকে দাঁড়াইতে বলিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহার ইঙ্গিতে কোনও ফল হইল না। কারণ, তাকে ঐ ভাবে চড়িতে বাঁদিয়া রুমাল ঘুরাইতে দেখিয়া লছমী ও তাহার সঙ্গিনীগণ হাসিয়া আকুল হইয়া, একরূপ ছুটিতে ছুটিতে অট্টালিকার ভিতরে চলিয়া গেল।

লছমী তাহার ইঙ্গিত বুঝিতে না পারিয়া দ্রুতপদে বাটীর ভিতর চলিয়া যায় দেখিয়া—তাহার কাছে উপস্থিত হইবার জন্য শরৎচন্দ্র দৌড়িয়া আসিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু সে যখন, ঐ দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া, মাত্র মাঠের কাছে উপস্থিত হইল, লছমীরা তখন বাটীর কাছে উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া, সে আর অগ্রসর হইল না বটে কিন্তু ঐ মাঠের উপর গিয়া লছমীরা যে স্থানটিতে দাঁড়াইয়া টেনিস খেলিতেছিল—সেই স্থানে শুইয়া পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিল এবং ঘাসের উপর চুষন করিতে লাগিল।

শরতকে ঐ ভাবে দৌড় মারিতে দেখিয়া হরিচরণ ও মাধব বিস্মিত হইয়া পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিল এবং তাহারাও দৌড়াইয়া মাঠের উপর আসিয়া, শরতকে ঐ অবস্থার দেখিয়া বলিল—“ও কি বাবু, ও কি ব্যাপার? উঠুন, উঠুন।”

“দাঁড়াও, দাঁড়াও, উঠচি, উঠচি।” এই কথা বলিয়া শরৎচন্দ্র আবার ঘাসের উপর গোটাকয়েক চুমু খাইল এবং তথাকার পানিকটা মাটি তুলিয়া লইয়া, জামা খুলিয়া বুকের উপর রগড়াইয়া মাখিতে লাগিল। তৎপরে সোৎসাহে লক্ষ্য দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—“আর কি কেহ্না ঘেরে দিয়েছি। আমার ওপর লছমীর ভালবাসা সম্বন্ধে যে তিলমাত্র সন্দেহ ছিল, সেটা আজ দূর হয়ে গেল।”

ভুল-ভাঙ্গা

হরিচরণ বলিল—“কিসে বুঝলেন বাবু-মশাই, লছমী কি আপনার চেহারার স্মৃতি ক’রেছে নাকি ?”

শরৎচন্দ্র একটু বিরক্তভাবে বলিল—“তুমি কি কাণা নাকি ? আমি যখন ওই ধারের রাস্তা দিয়ে আসছিলুম সে সময় লছমী ওর friendদের আমার দিকে আঙ্গুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিচ্ছিল মনে আছে ? দেখ, লছমী যে আমার ভালবাসে, সেটা আমার কাছে নাই লজ্জার খাতিরে আগে বলতে পারছেন। কিন্তু ওর সঙ্গীদের কাছে কেন লজ্জা করবে ? সঙ্গীদেরই, মনের কথা সকলে বলে। ‘আমি যে ওর মনোচোর’ সেইটা আমার দেখিয়ে দিয়ে, ওদের বলে তারপর ওরা, ‘ঐ যে লজ্জায় মুখ লাল ক’রে হেসে ছুটে পালাল,’ ওটা প্রেমের লক্ষণ ; মহা প্রেমের লক্ষণ—বুঝলে এবার বোকচন্দর।”

হরিচরণ একটু ঢোক গিলিয়া বলিল—“তা আপনি ঠিক বুঝতে পেরেছেন তো—তা’হলেই হোল।”

শরৎচন্দ্র বলিল—“আরে শুধু কি আজকের এই ব্যাপার—আজ এই ক’দিন ধরে আমি, প্রতি দিন লক্ষ্য ক’রে যাচ্ছি যে, লছমী আমার সঙ্গে যখনই কথা কর তখনই মুচকে হেসে তবে কথা কর। আর ঘন, ঘন আমার দিকে চুরি ক’রে চেয়ে দেখে। যেই আমি তার দিকে চাইলে তার চুরি ধরা পড়ে যায় অমনই টপ্ ক’রে চোখ নামিয়ে নেয়।”

হরিচরণ বলিল—“তা বাবু, যদি আপনাকে, লছমী ভালবেসে ফেলে থাকে তাহলে আপনাকে, তার প্রেমটা জানায় না কেন ?”

শরৎ বলিল—“আরে মুখু, হাজার আমার চেহারা ভাল হোক আর হাজার আমার প্রেমে পড়ে থাক তবুও লছমীতো মেয়ে মানুষ—

ডুল-ভাল্লা

নারী-সুগভ একটা লজ্জাওতো ওর আছে। তা' দেখ, লছমী আমার প্রেমে যে রকম পড়েছে তাতে আমার বোধ হয়, লছমী লজ্জা-ফজ্জার ধার ধারতো না, আমার গলা ধরে স্পষ্টই আগায়, উপযাচিকা হ'য়ে বলতো যে, 'ওগো আমি তোমার বড় ভালবাসি'। কিন্তু কেন তা করেনা জান? ওরকম ক'রলে—এরপরে বিয়ে হ'য়ে গেলে সে সময় পাছে আমি—নির্লজ্জা, বেহারা—ব'লে ওকে ভৎসনা করি, এই ভয়ে ও তা করে না। নইলে ভৈরবপ্রসাদ, অযোধ্যা এরা সব সামনে থাকতেও, লছমী যে রকম ভাবে আমার দিকে চেয়ে দেখে তাতে আমারক্কে ভয় হয় যে, ও বুঝি বা কষ্ট করে এসে, ওদের সামনেই আমার গলা জড়িয়ে ধরে প্রেম জানায়। দেখ আরও এক কারণে লছমীর—শুধু লছমীর কেন, আমারও বড় অসুবিধে হয়। এই অযোধ্যা ব্যাটা, আমাদের ভালবাসা সম্বন্ধে সন্দেহ ক'রে লছমীকে সদা-সর্বদা চোখে, চোখে রেখেছে। আর তা ছাড়া এই ব্যাটা বুড়ো, বেরসিক ভৈরবপ্রসাদও লছমীকে কাছ-ছাড়া করেনা। যখনই যাও, দেখবে যে এদের একজন, সময় সময় এরা দুজনেই, লছমীর কাছে রয়েছে। একবার যদি ওকে নির্জনে পাই তাহলে সব গোলমাল মিটে যায়। দেখ হাজার হোক আমি বিদেশী বঁধু; আমার মুখ থেকে কিছু না শুনলে লছমী ব্যাচারা তো ভরসা পাচ্ছেনা কিনা? আমার মুখ থেকে যেই একবার শুনবে যে—'আমি তাকে ভালবাসি'—অমনই দেখ' সে ছুটে এসে, ক'সে চেপে গলা জড়িয়ে বলবে—'ওগো আমি তোমার বড় ভালবাসি গো বড় ভালবাসি; ওগো আমি তোমার দাসী গো তোমার জোড়া চরণের দাসী।' এই কথা বলিতে বলিতে শরৎ আনন্দে লাফাইয়া উঠিল।

ভুল-ভাঙ্গা ।

হরিচরণ বলিল—“তা’-বাবু মশাই শুনতে পাই যে, অযোধ্যার সঙ্গে লছমীর বিয়ের সব ঠিক-ঠাক হয়ে গেছে । তা অযোধ্যাকে কি লছমী ছাড়বে?”

শরৎ তাচ্ছিল্যভাবে বলিল—“আমার এমন সুন্দর চেহারা আর অযোধ্যা ব্যাটা ওই রকম বিক্রী দেখতে---ও কখনও আর অযোধ্যাকে ভালবাসতে পারবে । আগে আমার দেখেনি তাই অযোধ্যাকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছিল । এখন যখন আমার দেখেছে, তখন দেখে নিও—আমার মুখে একবার আশার কথা পেলো—ও তখনই ওই অযোধ্যা ব্যাটাকে Hoot out ক’রে দেবে । লছমী আমার, প্রাণের চেয়ে ভালবাসে ।”

হরিচরণ বলিল—“তা’ ভাল না বাসবেই বা কেন ? আপনার মতন এমন সুন্দর চেহারা কোথায় পাবে ।”

মাধব তাড়াতাড়ি বলিল—“তা যা বলেছ, বাবুকে দেখলে আমাদেরই যখন ভালবাসতে ইচ্ছে করে তখন লছমীতো মেয়েমানুষ ।”

হরিচরণ গম্ভীর ভাবে বলিল—“একটু সাবধানে চলবেন বাবু—“দেখবেন শেষে ঐ অযোধ্যা ব্যাটা আপনার প্রেমে না পড়ে যায় ।”

মাধব আরও গম্ভীর ভাবে বলিল—“হ্যাঁ একটু সাবধানে চলা দরকার । আমারতো বাবু বড় ভয় হয় যে, এই বিটের-কনষ্টেবলটা বুঝি আপনার প্রেমে পড়ে যায় । আপনি রাস্তায় বেরোলে, কনষ্টেবলটা যে রকম ঘন, ঘন আপনার দিকে কটাক্ষপাত করে, তাতে তো আমার মনে হয় যে, কনষ্টেবলটা আপনাকে থপ্ ক’রে আলিঙ্গন ক’রে, ডাকে বুঝি আপনাতঃ বোলে ।”

শরৎচন্দ্র মহা গম্ভীর ভাবে বলিল—“না হে না, সে সব কোনও ভয় নেই—আমি খুব সাবধানে আছি।”

এইরূপ ধরনের নানা গল্পগুজব করিতে, করিতে অনেকগুলি সিগারেট পোড়াইয়া, শরৎচন্দ্র বলিল—“দুখ, আজ আমি এক মতলব করেছি—সেই মতলবেই আমার কার্য-সিদ্ধি হবে। আজ আমি একখানি চিঠি লিখে, লছমীকে আমার সঙ্গে নির্জনে দেখা ক’রতে বলেছি। আমি আর একটু পরে লছমীর শোবার-ঘরের জানালা গলিয়ে চিঠি খানা কেলে দোব। সেই চিঠি পেয়ে, লছমী নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে দেখা ক’রতে আসবে। তার পরে ওর সঙ্গে সব ব্যবস্থা ঠিক করে নোব। আগে ঐ অযোধ্যা ব্যাটাকে তাড়বার ব্যবস্থা ক’রব। তার পর বিয়ের দিন ঠিকঠাক ক’র শুভকর্মে লাগিয়ে দোব। তোমরা এগন বাড়ীর দিকে যাও। বাড়ী গিয়ে একেবারে ঘরের ভেতর বসে থাকগে; দেখে পবরদার আমার ঘেন খুঁজতে এস না। আমি এই চিঠিতে—পুরুষধারে এসে দেখা করবার জন্তে—লছমীকে লিখেছি।”

হরিচরণ বলিল—“আমরা যাচ্ছি; কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞেস ক’রে যাই। আচ্ছা লছমী না হয় আপনার অলোকসামান্ত-রূপ দেখে মোহিত হয়ে আপনাকে ভালবেসেছে, কিন্তু ভৈরবপ্রসাদ তো আর আপনার রূপে মোহিত হ’য়ে আপনার প্রেমে পড়েনি—সে কেন আপনাদের এই বিয়েতে সম্মতি দেবে?”

শরৎচন্দ্র বলিল—“সম্মতি দেবে না? না, না, নিশ্চয়ই দেবে ভৈরবপ্রসাদ নব্য সভ্যতার পক্ষপাতী; তার মনে কোনও রকম কুসংস্কার নেই, সে স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী। তার মেরে থাকে বিয়ে ক’রতে

ভুল-ভাঙ্গা

চাইবে, সে তাতেই সন্ততি দেবে। ভৈরবপ্রসাদ যে কুসংস্কারাচ্ছন্ন বর্ষের নয়, সে যে সভ্য ও নব্যচালে দক্ষ, এ সব দেখাবার এই একটা মহা সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। এ সুযোগ ভৈরবপ্রসাদ কখনই ত্যাগ ক'রবে না।”

হরিচরণ বলিল—“তা যাই বলুন বাবু, আমার বোধ হয় যে, ভৈরব প্রসাদ খোঁটা হরে বাঙ্গালীর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবে না; ও সব কুসংস্কার বা সভ্যতার কথা পরের বেলায়—নিজের বেলায় নয়। আর যখন এ বিয়েতে অনেক বাধা, তখন কাজ নেই বাবু ও হাঙ্গামায় গিয়ে।”

এই কথা শুনিয়া শরৎচন্দ্র একটু দমিয়া গেল। সে কিছুক্ষণ যাবৎ মনে মনে এই সব কথা তোলা-পাড়া করিয়া, হঠাৎ জোড়-হস্তে ও উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিল—“দোহাই বাবা বিশ্বনাথ, লছমীকে পাবার পথে যে সব বাধা রয়েছে সে সব দূর ক'রে দাও বাবা।”

হরিচরণ ও মাধব সমস্তরে বলিয়া উঠিল—“ওকি বাবু, আপনি বাবা বিশ্বনাথকে ডাকছেন যে। এ কি ব্যাপার! ষাঁ!!”

শরৎচন্দ্র বলিল—“মা টা সব তোমরাইতো বল যে, বাবা বিশ্বনাথকে ডাকলে মনের কমনা পূর্ণ হয়।”

হরিচরণ বলিল—“আমরা তো বলি আর এখনও বলছি; কিন্তু আপনি যে এই কথার জন্তে আমাদের কত গাল-মন্দ করেছেন। আপনার Nature আজ কোথায় গেল। এই Nature এর কথা নিয়ে আমাদের বাপ তুলে গালাগাল অবধি দিয়েছেন। এখন Nature কে না ডেকে বাবা বিশ্বনাথকে ডাকছেন কেন? আজ হঠাৎ ভূতের মুখে রাম-নারী শুনিছি কেন?”

সভ্য, কুসংস্কার-মুক্ত বিজ্ঞান-জ্ঞানিত শরৎচন্দ্র এখন আর এ কথার কোনও উত্তর দিতে পারিল না। সে এসকল কথা কানে না তুলিয়া, বাবা বিশ্বনাথকে ডাকিতে লাগিল। কিন্তু সে নিজে যেমন পাষাণ, তার শিক্ষা যেমন, তাহার মন যেমন, ঠিক তেমনি ভাবে ভগবানকে উদ্দেশ্য করিয়া, পরীক্ষা করিবার ভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিল—“দোহাই বাবা বিশ্বনাথ, লছমীকে পাইয়ে দাও বাবা; তোমায় খুব ভাল ক’রে পূজো দোব। তুমি যদি তিন দিনের মধ্যে লছমীকে পাইয়ে দাও তাহ’লে আমি একশো—দুশো—আচ্ছা তা কেন, একেবারে পাঁচশ টাকার পূজো দোব। তুমি তো বাবা পাঁটা খাও না। নইলে বাবা তোমায়, খুব ভাল মিটুলাঁওলা পাঁটা পূজো দিতুম বাবা। অন্য লোকদের মতন শুধু কাঁচা মাংস পূজো দিয়ে, তোমার ঘাড়ে ঘি মশলার খরচা চাপাতুম না আর তোমার কাজও বাড়াতুম না বাবা। বেশ ভাল ক’রে কারী, কোরমা রাঁধিয়ে, চপ কাটলেট তৈরী করিয়ে তবে তোমায় নিবেদন করাতুম, তোমায় পূজো দিতুম। দোহাই বাবা লছমীকে পাইয়ে দাও বাবা। পুতুল ব’লে পাথর ব’লে কখনও তোমায় ডাকিনি বাবা। তা ছাড়া কখনও কোনও দরকার পড়েনি তাই তোমায় ডাকি নি। আমাদের মতন বড় লোকেরা এক মামলা মোকদ্দমার সময়, তাতে জিত হবে ব’লে; আর সাহেব-সুবোর সঙ্গে দেখা ক’রতে যাবার সময়, বে সামাল না হরে নির্ঝিঁয়ে ফিরতে পারবে ব’লে, তোমাকে ডাকে। আমি কিন্তু দেখ বাবা ঐ সব দরকারের সময়ও তোমায় ডাকিনি। আজ কিন্তু তোমায় যখন আমি ডাকছি তখন এটা তোমার পক্ষে খুব শুভ অবসর বলতে হবে। “Nature-এর (স্বভাবের) দ্বারা পৃথিবী ইত্যাদি সব সৃষ্টি হয়েছে” এ কথা বরাবর

ডুল-ভাঙ্গা ।

মেনে আসছি। আজ কিন্তু দেখছি যে, Nature-এর দ্বারা ঠিক সময়-মত সব প্রয়োজন পূর্ণ হয় না। তুমি যদি বাবা আমার এই প্রয়োজনটি পূর্ণ কর তা'হলে স্বীকার ক'রব যে, তুমি ঈশ্বর, আর ঈশ্বরের দ্বারা পৃথিবী ইত্যাদি সব সৃষ্টি হয়েছে—বুঝলে বাবা ? এমন সুযোগ ছেড়না বাবা ; যদি এ সুযোগ ছাড় তা'হলে এর পরে তোমার পশুভা হবে। তখন কিন্তু আমায় হাজার বল্লেও আমি সেই Nature কেই মানব—তোমায় মানব না।” এই কথাগুলি উর্কমুখে ও উর্ক দিকে দুইটা হস্ত জোড় করিয়া তুলিয়া বলিয়া শরৎচন্দ্র, বাবা বিশ্বনাথের উদ্দেশ্যে ভূমিতে মাথা ঠুকিয়া, স্বকার্য সাধনের জন্য নানারূপ প্রলোভন দেখাইল। তারপর, হরিচরণ ও মাধবকে সেস্থান হইতে বিদায় করিয়া দিয়া সে, সেই মঠের উপর একপানি বেষ্টিতে বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পূর্বে চাঁদ উঠিয়াছিল। শরৎচন্দ্র একদৃষ্টে সেই চাঁদের পানে চাহিয়া, কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর সেস্থান ত্যাগ করিয়া স্বকার্যসাধনে অগ্রসর হইল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ ।

লছমীর শয়ন-কক্ষ । গৃহের মধ্যস্থলে একখানি সুন্দর খাট, তাহার উপর সুপরিষ্কৃত বিছানা । বিছানার উপর মাথার বালিসের কাছে দুই-খানি বাঙ্গলা উপন্যাস রহিয়াছে । সেই ঘরের একটা প্রবেশ-দ্বার, প্রবেশ-দ্বারটা বাটার ভিতর দিকে অবস্থিত । ঘরের অন্য প্রান্তে দুইটি জানালা খোলা রহিয়াছে, সেই জানালার নিচেই বাগান । ঘরের ভিতরে জানালার কাছে একটা ছোট সেক্রেটারিয়েট-টেবল রহিয়াছে । টেবিল-টির মধ্যস্থলে একটা বড়, কেরোসিনের টেবিল-আলো জলিতেছে এবং তাহার চারিদিকে কতকগুলি বই, খাতা, দোয়াত, কলম প্রভৃতি বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে । এই টেবিলের দুই পার্শ্বের দুইখানি চেয়ারে অযোধ্যা ও লছমী বসিয়া আছে । লছমী একখানি পাতার একমনে কি লিখিতেছে ; অযোধ্যা নিবিষ্টচিত্তে, জগদ্বিখ্যাত ফরাসী কবি আনাতোল ফ্রাঁসের সুবিখ্যাত ও সুন্দর উপন্যাস “লা-রতিসারি-দ-লা রেন পেডক” নামক পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদ “গ্যাট দি সাইন অব্ দি রেন পেডক” একমনে পড়িতেছে । এই ঘরের ভিতরে—খাটখানির নিকটে একটা বৃহৎ ও সুন্দর আনলা-বাক্স রহিয়াছে—তাহার উপর দিকে লছমীর নিত্য ব্যবহার্য কয়েকখানি সাড়ী, ওড়না ও তিন, চারিটা জামা বোলান রহিয়াছে এবং নীচের দিকে কয়েক জোড়া বিলাতী জুতা সাজান রহিয়াছে ।

কিছুক্ষণ পরে, পুস্তক হইতে মুখ তুলিয়া অযোধ্যা বলিল—“লছমী একটু তাড়াতাড়ি লিখে নাও, রাত্রি সাড়ে নয়টা বেজে গেল !”

ভুল-ভাঙ্গা

লছমী কোনও উত্তর না দিয়া, আপন মনে লিখিয়া যাইতে লাগিল। এই ঘরটি লছমীর শুইবার ঘর, এটি দ্বিতলে অবস্থিত। লছমীর পড়িবার-ঘর বাটীর এক তলায়। আজ কিন্তু লছমী পড়িবার ঘরে, পড়িতে না গিয়া এই ঘরে অযোধ্যাকে ডাকাইয়া আনিয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। এরূপ করিবার কারণ এই যে, আজ সন্ধ্যার সময়, টেনিস খেলিবার পর, শরতের রুমাল-ঘোরান বাপারে হাসিতে, হাসিতে লছমী যখন দ্রুতপদে বাটীর দিকে আসিতেছিল; সেই সময় একটা মাটির টবে ঠোঁকর লাগিয়া সে, পায়ে বড় আঘাত পায়। তারপর বাটীতে আসিয়া একেবারে নিজের শয়ন-কক্ষে গিয়া, কাপড়-চোপড় ছাড়িবার পর : পায়ের ব্যাথাটা, একটু বেশী বলিয়া মনে হওয়াতে, সে—সেদিন আর নীচের তলার না নাযিয়া ঐ শয়ন-কক্ষে বসিয়া পড়িবার মানস করিয়া অযোধ্যাকে ডাকিয়া পাঠায়। অযোধ্যা এই সংবাদ শুনিয়া উপরে আসে এবং লছমীর আঘাত-প্রাপ্ত স্থানে হোমিওপ্যাথিক “আরনিকা-লোসন” লাগাইয়া দিয়া তারপর পড়াইতে বসে।

ইহাদের দুই জনের নিস্তরতা ভঙ্গ করিয়া হঠাৎ জানালার খট্ করিয়া একটা আওয়াজ হইল। দুই জনেই একবার জানলার দিকে চাহিয়া—কিছুই দেখিতে না পাইয়া—আবার নীরবে যে-যার কাজে মন দিল।

লছমীর শয়ন-কক্ষের নিচেই বাগান, সেই বাগানের উপর অনেকগুলি নগ্ন মর্ম্মর-মূর্ত্তী, মূর্ত্তিকা নির্ম্মিত বেদীর উপর শোভা পাইতেছে। লছমীর শয়ন-কক্ষের জানালার ঠিক নিচেই যে মর্ম্মর-মূর্ত্তীটি রহিয়াছে, শরৎচন্দ্র তাহার পাদদেশে আসিয়া দাঁড়াইল। সেস্থান হইতে উপর দিকে চাহিয়া—লছমীর শয়ন-কক্ষে আলো দেখিতে পাইয়া সে মনে, মনে বলিল—“ঠিক

হয়েছে, ঠিক সময়ে এসে পড়েচি। সাড়ে নটা বেজে গেছে—এই সময়ে লছমী পড়াশুনো শেষ ক’রে শোবার ঘরে এসে কাপড়-চোপড় বদলে তারপর ওর বাপের বন্ধুদের কাছে বসে। ঐ যে ঘরে আলো জ্বলছে, লছমী তা হ’লে নিশ্চয়ই কাপড় বদলাবার জন্তে—পড়বার ঘর থেকে এই ঘরে এসেছে। দি এইবার চিঠিখানা ফেলে। এই সময় লছমী একলা রয়েছে, এই ঠিক সুযোগ।” এইরূপ চিন্তা করিয়া শরৎচন্দ্র, ভূমি হইতে একটি ছোট্ট টিল তুলিয়া লইয়া, তাহার পকেট হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া সেই টিলটিতে মোড়ক করিল এবং লছমীর ঘরের উদ্দেশ্যে সেই মোড়কটা ছুঁড়িয়া দিল। মোড়কটা ঘরের ভিতর গেল না; জানালায় লাগিয়া একটি শব্দ করিয়া পুনরায় বাগানে আসিয়া পড়িল।

শরৎচন্দ্র তখন সেটা কুড়াইয়া লইয়া, সেই বেদীর উপর উঠিয়া দাঁড়াইল এবং এক হস্তে মর্ম্মর মূর্তীটিকে চাপিয়া ধরিয়া, অন্য হস্ত দ্বারা সজোরে সেই মোড়কটি ছুঁড়িয়া দিল। এবার সেই মোড়কটা লছমীর শয়ন-কক্ষের ভিতর ঢুকিয়া গেল এবং টেবিলের উপরিস্থিত আলোর চিমনির গাঁয়ে ঠং করিয়া পড়িয়া, টেবিলের উপর গড়াইয়া পড়িল। শরৎচন্দ্র নিশ্চিন্ত মনে ধীরে, ধীরে বেদীর উপর হইতে নামিয়া, বরাবর বাটার পিছন দিকে উপস্থিত হইয়া, ‘পিছনকার বাগানের’ কিয়দংশ অতিক্রম করিয়া—তথায় যে পুকুরটা আছে, সেই পুকুরের ঘাটের উপর সান্ বাধান চাঁদমীতে যাইয়া বসিল এবং মনের আনন্দে শিস্ দিয়া গাহিতে লাগিল।

ঠং করিয়া শব্দ শুনাতে লছমী ও অযোধ্যা উভয়েই চমকিত হইয়া চাহিয়া সেই কাগজের মোড়কটা দেখিতে পাইল। লছমী কিছু বলিবার পূর্বেই অযোধ্যা ক্ষিপ্ত-হস্তে সেই মোড়কটা তুলিয়া লইয়া, তাহা তুলিয়া

ভুল-ভাঙ্গা।

ফেলিল; এবং দেখিল যে, সেটি একখানি বাঙ্গলায় লেখা চিঠি। বিস্মিত হইয়া অযোধ্যা পত্রখানি পড়িতে লাগিল। পত্রে এইরূপ লেখা ছিল :—

বহু-বহু-বিদূষী, মহা-মহা-মহিয়সী শ্রীমতী লছমী-সুন্দরী
শ্রীপদ-পঙ্কজেষু।

হে প্রাণ-পিয়ারী, বড়-বড়-নরনিন্দিতা-নারী, লছমী প্রাণেশ্বরী,

তুমি আমার অতুলনীর রূপে মোহিত হইয়া আমার ভালবাসিয়াছ এবং নারী-সুলভ লজ্জায় তাহা আমাকে জানাইতে না পারিয়া মহা কষ্টে পাইতেছ, এ কথা আমি বুঝিতে পারিয়াছি। আমার এই অতুলনীর রূপের মহিমাই এই যে—আমার নে দেখে সেই মজে, কিন্তু আমার পারনা—কারণ আমি নিজে মজিনা। আমার দেশে, এ পর্যন্ত কত শত স্ত্রীলোক আমার দেখিবামাত্রই আমার প্রেমে লটু-পটু থাইয়াছে, তাহার আর সীমা-সংখ্যা নাই। আমি কিন্তু তাহাদের মধ্যে কাহারও দিকে কিরিয়া চাই নাই।

আমার এই অতুলনীর রূপের আরও মহাত্ম এই যে—স্ত্রীলোক তো দূরের কথা, পুরুষে অবধি আমার রূপে মোহিত হইয়া আমার প্রেমে পড়িয়া যায়। এই কথা যদি তোমার বিশ্বাস না হয় তাহা হইলে তোমাদের এই ঘাঁটির কনেষ্টবলকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে পার। আজ মাত্র করদিন আমি তার সামনে দিয়ে চলা ফেরা করেছি তাতেই—ওহো Pity—তাতেই সেই Poor কনেষ্টবলটি, আমার প্রেমে পড়ে লাঠিমের মত বন্ বন্ ঘুরচে। আমি যখনই তার সামনে দিয়ে যাই সে তখনই—সব লোক ছেড়ে, কেবল আমার দিকে আড়ে-আড়ে অর্থাৎ সঙ্গজ-ভাবে চেয়ে দেখে—এটা প্রেমে পড়ার লক্ষণ কি না, তুমিই বল।

ভুল-ভাঙ্গা

এই ব্যাপারেই বোধ হয় আমার রূপ সন্দেহে তোমার খুব উচ্চ ধারণা হয়েছে? আর বেশী কিছু প্রমাণ তোমায় দেখাতে হবে না বোধ হয়?

এত লোকে আমার প্রেমে পড়ে শুনে, তোমার বোধ হয় খুব ভয় আর ‘জেলাসি’ হচ্ছে? কিন্তু প্রাণেশ্বরী—এতে তোমার কোনও ভয় নাই, কোনও চিন্তা নাই জানিবে। কারণ এপর্যন্ত অনেকে আমার প্রেমে পড়েছে বটে, আমি কিন্তু কাহারও দিকে কিরিয়া চাই নাই। আমি শকৎ, মহা-শকৎ করিয়া, অতি উচ্চকণ্ঠে বলিতে পারি যে, আমি এ পর্যন্ত অমূৰ্খ্যস্পৃশ্য আছি। তার ওপর আমি তোমায় ভালবাসিয়াছি এবং আমি তোমায় চাই। তোমার বাহাদুরী আছে, কারণ হাজার, হাজার লোক তাহা পারে নাই তুমি তাহা পারিয়াছ—আমাকে তোমার প্রেমের ফাঁদে বন্দী করিয়াছ। আর এ কথাও নিশ্চয় মে, তুমি পূৰ্ব্বে জন্মে মাথা কাটিয়া আহুতি দিয়া মহা তপস্যা করিয়াছিলে তাই আমার মতন জ্ঞানবান, গুণবান, চরিত্রবান, প্রেমবান, রূপবান, সুন্দর দেহবান, লম্বাবান, চঁওড়া-বান, ধনবান, সদা-প্রেমে-আনন্দান পুরুষ-সতী পতি লাভ করিতেছ।

আমি পুকুর ঘাটে অপেক্ষা করিতেছি—তুমি এখনই একবার আইস—আমাদের বিবাহ সন্দেহে পরামর্শ করিয়া যাও; আর আজিকার এই বেশ পরিষ্কার, ধোয়া-মাজা-সাদা-শিশির-মতন জোৎস্নাময়ী নিশিতে, চাঁদকে সাক্ষী রাখিয়া আমাদের প্রথম ‘কোর্টসিপ’ হউক।

ভাগ্যবতী, তোমার প্রতি অতি সুপ্রসন্ন

মহামতি শরৎচন্দ্রবাবু।

অযোধ্যা পত্রখানি উপযুক্তপরি দুই, তিনবার পাঠ করিল এবং বিস্ময়

ভুল-ভাঙ্গা,

ও ক্রোধে অভিভূত হইয়া, সেই নিরীহ ও নিরপরাধ টেবিলটির উপর দুই তিনটি ঘুসী মারিল।

অযোধ্যার রকম-সকম দেখিয়া লছমীর বিষয় ভাবটা কিছুক্ষণের জন্য দূরে পলাইল। সে তো হাসিয়াই আকুল। হাসিতে হাসিতে বলিল—
“ব্যাপার কি অযোধ্যা, হঠাৎ অমন চোটলে কেন?”

অযোধ্যা দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া বলিল—“রাতদিনই কি যে দাঁত বের ক’রে হাস। সব সময় ওরকম হাসি ভাল লাগে না; তোমার ঐ রকম হাসি দেখলে আমার হাড় পিণ্ডি জলে যায়। এই নাও, এই চিঠি খানা প’ড়ে দেখ।”

অযোধ্যার হাত হইতে পত্রখানি লইয়া লছমী পড়িতে লাগিল। অযোধ্যা চেয়ারের উপর একটি পা তুলিয়া দিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া কি ভাবিতে লাগিল।

পত্রপাঠ শেষ করিয়া লছমী গম্ভীর ভাবে বলিল—“কি ক’রবে ঠিক ক’রলে। বাবাকে চিঠি খানা দিইগে—কি বল?”

অযোধ্যা বলিল—“না, না; তাতে ঠিক ফল হবেনা। তুমি একটু দাঁড়াও, আমি এখনই ঘুরে আসছি। তোমার একখানা সাড়ী আর একখানা ওড়না টপ্ করে দাও দেখি।

লছমী আলনা হইতে সাড়ী, ওড়না নামাইয়া দিল। অযোধ্যা সেগুলি কাঁধে ফেলিয়া দ্রুতপদে সেই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ ।

সান্-বাঁধান পুকুর ঘাটের টাঁদনীর উপর শরৎচন্দ্র বসিয়া আছে এবং পা নাচাইতে নাচাইতে শিশ দিতেছে । কিছুক্ষণ পরে শিশ দেওয়া বন্ধ করিয়া শরৎচন্দ্র আপন মনে বলিল—“খুব জ্বর চিঠি দিয়েছি । চেষ্টা-চরিত্র ক’রে চিঠি খানা বেশ কবিত্বময় ক’রে দিয়েছি । এখন এইবার লছমী এলে, ওর সামনে বেশ গুচিয়ে-গাচিয়ে কবিত্ব-মাথা কথা বলতে পারি, তাহলেই মুখ রক্ষা হয় । বেশ কবিত্বময় কথা না হলে প্রেম জ্ঞাপন করা চলে না । অমনই নেহাৎ দরোয়া কথায় প্রেম জানালে লছমী, আমার বেরসিক ভাববে । হাঁ-হাঁ-বাবা ঐ যে, ঐ যে আসছে—ঠমকে ঠমকে, হেলতে, দুলাতে লছমী আসছে । না এসে ক’রবে কি ? আমার রূপ দেখে মোহিত না হয়ে যাবে কোথায় ? আহা আগিরে, তুই বেঁচে থাক ; কি রূপ নিয়েই জন্মেছিলি বাবা আমি ।” এই সকল কথার পর রুমাল লইয়া জামা, কাপড়, চাঁদর প্রভৃতি ঝাড়িতে লাগিল । তারপর পা দুটি উচু করিয়া, সেই রুমাল দিয়া বেশ ভাল করিয়া জুতা জোড়াটি মুছিয়া ফেলিল । কিন্তু তাহাতে মন সন্তুষ্ট হইল না বলিয়া, থুতু দিয়া রুমাল ভিজাইয়া ফের জুতা মুছিল । জুতা মোছার পর শেষ করিয়া, শরৎচন্দ্র হস্তস্থিত রূপা বাঁধান ছড়িটির মাথাটি রুমাল দিয়া মুছিল । ইহাতেও কিন্তু তাহার তৃপ্তি হইল না । সে রাস্তার উপর হইতে এক মুঠা লাল-কঁকরের গুড়া তুলিয়া লইয়া ছড়িটির রূপা-বাঁধান

সুল-ভাঙ্গা.

মাথাটির উপর খুব জোরে একবার ঘসিয়া দিল। এই সময় একটি অবগুণ্ঠনবতী রমণী—ঐ ঘাটের অতি নিকটবর্তী একটি লতাকুঞ্জের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। সে, 'যেখানটীতে দাঁড়াইল—ঐ লতাকুঞ্জের গাছের ছায়া পড়িয়া—সে স্থানটী অপেক্ষাকৃত একটু অন্ধকার। শরৎচন্দ্র বলিল—“ঐখানে, ঐখানে থাকো! প্রাণেশ্বরী—চারদিকে চাঁদের আলো, ঐখানটায় একটু কম আলো : ঐখানে থাকলে কেউ দেখতে পাবে না। আমি যাচ্ছি, এখনই যাচ্ছি, কোনও চিন্তা নেই।” সে এই সকল কথার পর মনে, মনে বলিল—“এইবার একটু কবিত্বমাখা প্রেমোচ্ছ্বাসের অভিনয় দেখাতে হবে।”

এখন শরতের পরিধানে একখানি শান্তিপুরের কাপড়, একটি সিল্কের জরিদার জামা ও একখানি বেনারসী জরিদার চাদর রহিয়াছে। শরৎচন্দ্র কাপড়ের কোঁচা খুলিয়া তাহা গালকোঁচা মারিয়া পরিল, গলা হইতে চাদর খানি খুলিয়া মাথায় পাগড়ি বাঁধিয়া ফেলিল এবং ছড়িটী বাম হস্তে নিচু করিয়া ধরিয়া—থাপ্ শুদ্ধ তরোয়াল যেমন ভাবে বুলান থাকে ঠিক সেইরূপ ভাবে ধরিয়া লইল। তারপর গম্বুকটী সম্মুখ দিকে হেলাইতে হেলাইতে এবং লম্বা, লম্বা পা কেলিতে কেলিতে সেই অবগুণ্ঠনবতীর নিকট গমন করিল। তাহার সম্মুখে গিয়াই—থাপ হইতে যে রূপ ভাবে তরোয়াল খোলে সেইরূপ ভাবে—তাহার দক্ষিণ হস্ত দিয়া বাম হস্তের মুঠার মধ্য হইতে ছড়িটী টানিয়া বাহির করিয়া সেই অবগুণ্ঠনবতীর চরণতলে রাখিল। তৎপরে দুই হস্ত দিয়া মাথার উপর হইতে সেই চাদরে বাঁধা পাগড়িটী নামাইয়া অবগুণ্ঠনবতীর পায়ের উপরে রাখিয়া, অভিনয়ের ভঙ্গীতে হাত মুখ নাড়িতে, নাড়িতে বলিল—“হে সেইয়ানী, তোমার কটাফরুপ

বন্দুকের গুলিতে আমার হৃদয়-দুর্গ বিধ্বস্ত। তোমার নিতম্ব-স্পন্দিত
গমন-রূপ গোলার আঘাতে আমার প্রাণ-রূপ বাষ্পপোত ক্ষত-বিক্ষত।
তোমার পীনপরোধর-রূপ বর্ষার খোঁচায় আমার মন-রূপ-রণকুশল-
সৈন্যপতি পটলোৎপাটন-প্রয়াসী। এতদিন পরে আজ আমি তোমার
নিব্বিক্ত পরাজিত। হে অপরূপ রূপসী, হে হৃদি-সরোবর-বিহারী সারসী,
হে মনকুঞ্জ-বিহারী বায়সী, হে নিমন্ত্রণ-বাড়ীর রসগোল্লা আর পায়সী
আমার এই কাষ্ঠ-নির্ম্মিত অসি আর এই রক্ত-বিহীন-উষ্মীশ, তোমার
পদতলে—আমার পরাজয়ের চিরস্বরূপ অর্পণ করলুম। হে রূপশালিনী
সৌন্দর্য্য-বেটিনী, মাপুখ্যাময়ী-মুখপুড়িনী আমি তোমার, তুমি আমার
হও।”

শরতের কথা শেষ হইলে সেই অবগুষ্ঠনবতী ধীরে ধীরে ললিত পদক্ষেপে
ঈষৎ অগ্রসর হইয়া ভূমি হইতে পাগড়িটা তুলিয়া শরতের মাথায় পরাইয়া
দিল এবং ছড়িটা তাহার হাতে তুলিয়া দিল।

শরৎচন্দ্র, পাগড়ি পরিবার সময় দুই হাত বৃকে রাখিয়া ও গ্রীবা বক্র
করিয়া মস্তক অবনত করিল এবং ছড়িটি হাতে পাইয়াই, অবগুষ্ঠনবতীকে
নাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। প্রণামান্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—“তা’হলে
তুমি আমার? বল, বল; চুপ ক’রে রইলে কেন?” এই বক্তব্যে সে,
অবগুষ্ঠনবতীর হস্ত ধারণ করিল। হাত ধরাতে, সে কোনও রকম
আপত্তি প্রকাশ করিল না দেখিয়া, শরৎ তাহার হাত খানি নিজের
বৃকের উপর চাপিয়া ধরিয়া বলিল—“আহা-হারে কি সুন্দর, কি কোমল
হাত, স্পর্শে ধাত ছাড়ে; দাঁত কড়মড় ক’রে চর্কন ক’রতে চায়—
আহা-হা যেন গোলাপী গাণ্ডেরী। হে সোঁইয়ানী বল তুমি আমার।

ভুল-ভাঙ্গা

বল, বল লজ্জা কি। হে শিক্ষিতা-মহিলা, আমি শুধু রূপবান-মহল নই আমিও খুব শিক্ষিত-মহল। বল তুমি আমার হবে।”

সেই অবগুষ্ঠনবতী, লজ্জানীলার মতন আঁকিয়া বাঁকিয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইল। শরতও তাহার সহিত সরিয়া গিয়া বলিল—“হবেনা, আমার না বলে পালান হবেনা। আমার কাছে তোমার লজ্জা কি? ছিঃ অমন করতে নেই। লোকে, শুনলে কি বলবে? বল, বল তুমি আমার হবে?”

অবগুষ্ঠনবতী খুব লজ্জা করিয়া ঘাড় নাড়িয়া ইঙ্গিতে জানাইল যে, “সে শরতের হইবে।” এখন আর শরতের আনন্দ ধরে না। সে আনন্দে গদগদ হইয়া বলিল—“তবে দাও কর্তিত-পক্ষ-পরী, তবে দাও প্রাণেশ্বরী একবার আলিঙ্গন আর তোমার চাঁদমুখের গুটি তিন চার চুষন। আকাশের ঐ চাঁদ সাক্ষী থাকুক, পুকুরের ঐ জল সাক্ষী থাকুক, বাড়ীর গায়ে ঐ নর্দমার নল সাক্ষী থাকুক, প্রেমিক-প্যাঁচারদল সাক্ষী থাকুক — আমাদের প্রথম কোর্টসিপ হোক।” এই কথা বলিয়া শরৎচন্দ্র সবেগে দুই হস্ত বিস্তার করিয়া অগ্রসর হইয়া সেই অবগুষ্ঠনবতীকে সজোরে আলিঙ্গন করিল। অবগুষ্ঠনবতীও, শরতের অপেক্ষা অধিক বেগে দুই হস্ত বিস্তার করিয়া মহা জোরের সহিত শরৎকে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিয়া চাপিতে লাগিল। শরৎও পূর্বাপেক্ষা অধিক জোরের সহিত অবগুষ্ঠনবতীকে জড়াইয়া ধরিল। অবগুষ্ঠনবতী এইবার প্রাণপণ জোরে শরৎকে জাপটাইয়া ধরিয়া, দুই দিকে দোলাইতে লাগিল। শরতের মাথার ভিতরটা বোঁ করিয়া ঘুরিয়া উঠিল। তাহার দমবন্ধ হইবার উপক্রম হইল। সে তখন আলিঙ্গন-মুক্ত হইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কোনমতে সক্ষম হইল না। অবগুষ্ঠনবতী আরও

ভুল-ভাঙ্গা

অধিক জোরে তাহাকে চাপিয়া ধরিল। শরৎচন্দ্র দমবন্ধ হইয়া য়ায়া য়ায়া আর কি। সে ইঁপাইতে, ইঁপাইতে বলিল—“এ তোমার কি বকম দমবন্ধকারী আর পঙ্কর-চূর্ণকারী” আলিঙ্গন! ও কাট্-খোটা-প্রায়সী ছাড়, ছাড়; আমি ইঁপিয়ে মলুম। কি মুন্সিল, তুমি যে দেখছি বিয়ের আগেই ইঁপানীর ব্যায়াম করিয়ে দিচ্ছ প্রিয়ে। ও হো—হো গেলুম। ছাড় প্রাণেশ্বরী ছাড়—নইলে আমার দোষ নেই, তুমি বিধবা হ’লে ব’লে। ও হো—ছাড়ো, ছা—ড়ো—ও—ও—ও—ও—ও—।”

উভয়ে খুব ধস্তাধস্তি চলিতে লাগিল। শরৎ আলিঙ্গন-মুক্ত হইবার নিমিত্ত যত চেষ্টা করিতে লাগিল, অবগুষ্ঠনবতী তাহাকে তত জোরে চাপিয়া ধরিতে লাগিল। শরতের দম বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল সে চক্ষে ধূঁয়া দেখিতে লাগিল। এইরূপ সময়ে সেই অবগুষ্ঠনবতী তাহাকে খুব জোরে একটি ল্যাং নারিল, ঝুঁক করিয়া একটি আওয়াজ করিয়া সে সটান লম্বা হইয়া মাটিতে শুইয়া পড়িল। অবগুষ্ঠনবতী, তাহার উদরের উপর—যেমন করিয়া ঘোড়ার চাপে সেইরূপ করিয়া— চাপিয়া বসিল এবং পাঁচ সাতবার দমক্ দিয়া নাচিয়া অবশেষে উঠিয়া দাঁড়াইল। শরৎচন্দ্র “উঃ—আঃ—বাবারে” বলিতে বলিতে উঠিয়া পড়িল এবং দুই, তিনবার টোঁক গিলিয়া প্রাণপণ চেষ্টায় ঈষৎ চিৎকার করিয়া বলিল—“কে তুই, সত্যি ক’রে বল কে তুই?”

অবগুষ্ঠনবতী টপ্ করিয়া অবগুষ্ঠন খুলিয়া ফেলিয়া দুইহাতে গোঁফে চাড়া দিতে, দিতে বলিল—“আমি তোমার গোকওলা প্রাণেশ্বরী, তোমার বড় সাধের গোলাপী-গাওরী—এস, এস প্রাণেশ্বর, চৰ্চণ ক’রবে এস।”

ভুল-ভাঙ্গা

শরৎ সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল যে, সেই অবগুষ্ঠনবতী লছমী নয়—
তাহার দুই চক্ষের বালাই স্বয়ং অযোধ্যা । সে মহা হতাশ হইয়া, অতীব
আপশোষের সহিত বলিল—“তোমার উদ্ধতন চতুর্দশ পুরুষের মধ্যে
কোনও ব্যাটা গোলাপী-গাণ্ডেরী নয় । তুমি বাবা শুকনো ছাতু, একদম
কাট । চৰ্ৰণ ক’রলে হবে কি—গলার আটকাবে ।”

অযোধ্যা, লছমীর সাড়ী ও ওড়না পরিয়া, এইরূপ ভাবে অবগুষ্ঠন দিয়া
আসিয়াছিল—তাহা বোধ হয় আপনাদের আর বলিয়া দিতে হইবে না ।
এইবার সাড়ী ও ওড়না খুলিয়া কেলিয়া নিজের কাপড় চোপড় ঠিক
করিয়া লইয়া সে, শরৎকে শাসাইয়া বলিল—“সাবধান, এই
বাজালী সাবধান । আজ এই সামান্ত রকম শাস্তি দিয়ে ছেড়ে
দিলুম, ভবিষ্যতে আর যদি কখনও এ রকম দুঃসাহসের কাজ কর, বামন
হয়ে যদি তাঁদের দিকে হাত বাড়ায় তাহলে এর চেয়ে এমন বেশী শাস্তি
দেব যে, যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন কিছুতেই ভুলতে পারবে না ।
এই কথা বলিয়া, অযোধ্যা সদর্পে চলিয়া গেল ।

শরৎচন্দ্র খানিগুণ অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল । তৎপরে অযোধ্যা
যে দিকে চলিয়া গেল সেই দিকে দুইটি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া বলিল—“তুই
আমার কলা ক’রবি । আমিই বরং তোকে এমন জব্ব ক’রব যে তুই
সারাজীবনটা কঁদে কঁদে বেড়াবি । ওরে অযোধ্যা, তুই আজকের
রাতটা মাত্র সুখ-স্বপ্নে বিভোর থাক ; কাল দুপুরের মধ্যেই আমি তোকে
সুখ-স্বপ্ন ভেঙ্গে দিচ্ছি । আমি স্বয়ং—এতে আর লজ্জা কি ? এতো
খুব সুখের বিষয়—আমি স্বয়ং, ভৈরবপ্রসাদকে—লছমীর সঙ্গে আমার
বিয়ে দেবার প্রস্তাব ক’রব । ভৈরবপ্রসাদ নিশ্চয়ই তাতে রাজী হবে—

,ভুল-ভাঙ্গা

সে যে রকম নব্য-তন্ত্র-প্রিয় লোক তাতে সে কখনই গরিবরাজী হবে না । তার ওপর লছমী যখন আমার হাতে, লছমী যখন আমার রূপমুগ্ধা তখন আমার জয় নিশ্চিত । আমারই, চিঠিখানা ওরকম ভাবে ফেলে দেওয়া অস্বাভাবিক হয়েছে ; কোনও লোকের হাত দিয়ে পাঠালেই ঠিক হোত । লছমী হয়ত সে সময় তার ঘরে ছেল না ; অযোধ্যা ব্যাটা হয়ত কোনও দরকারে ঐ সময় লছমীর ঘরে গেছিল ; তার পর চিঠিখানা দেখতে পেয়ে সেটা তুলে নিয়ে পোড়ে, লছমীর কাপড় আর ওড়না পোরে ঘোমটা দিয়ে এসে আমার ঠকিরে জ্বক ক'রে গেল । ওরে ও অযোধ্যা এর চেয়ে শতগুণে জ্বক তোমার ক'রছি দাঁড়াও । তুমি Oudhই হও আর Rohilkhandাই হও, আমার হাতে তোমার কিছুতেই নিস্তার নেই ।”

— — —

চতুর্বিংশতি প্বরিচ্ছেদ ।

অযোধ্যার নিকট প্রচণ্ড কৌংকানি খাইয়া, জামা, কাপড়, চাদর প্রভৃতি ছিঁড়িয়া, সর্ব্বাঙ্গে ও বিশেষ করিয়া মুখে লাল কঁাকরের গুঁড়া মাখিয়া, লাল-বাদরের মতন মৃত্তী করিয়া শরৎচন্দ্র—তাহার বাসের জন্য নির্দিষ্ট—সেই দ্বিতল বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল ।

শরতের পুরাতন চাকর দীন্না এবং তাহার প্রিয় সহচরদ্বয় তাহার আগমন প্রতীক্ষায়, নীচের তলার একটি ঘরে বসিয়াছিল । শরৎচন্দ্রকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া দীন্না একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিল এবং তাহার এরূপ কিস্কুৎ-কিমাকার অবস্থা দেখিয়া, অতীব বিস্মিত হইয়া বলিল—“এ কি বানু এরকম মৃত্তী করে কোথা থেকে এলেন ?”

শরৎচন্দ্র অতীব বিরক্ত হইয়া বলিল—“বেথা থেকেই আসি না, সে খোঁজে তোর কি দরকার । তোকে কি সব কাজের কৈফিয়ৎ দিতে হবে নাকি ? বাটা পাজী, ডাম সোয়াইন ।”

দীন্না বলিল—“বানু কোলে পিটে ক’রে মানুষ করেছি সেইজন্তে আপনার একটু কিছু হলেই আমার মনটা কেঁদে ওঠে । এই রকম ধুলো মেখে, জামা-কাপড় ছিঁড়ে কোথা থেকে এলেন ? কি হয়েছিল ?”

শরৎচন্দ্র, জামা কাপড় বদলাইতে, বদলাইতে বলিল—“ওরে আজ বড় কুস্তী লড়বার সাধ হয়েছিল তাই খোঁটারদের আখড়ায় কুস্তী ল’ড়তে গেছলুম । সেখানে খুব কুস্তী লড়েছিলুম কিনা, তাই এই সব ধুলো-ঝুলো লেগে গেছে ।”

মাধব সাগ্রহে বলিয়া উঠিল—“কোথায়—কুস্তীর আঁপুড়াটা কোথায়? আমায় সেখানে নিয়ে যাবেন আগিও কুস্তী ল’ড়ব। কে, কে সেখানে লড়ে?”

শরৎ অস্বাভাবিকভাবে বলিল—“নেখানে অযোধ্যা লড়ে, ভৈরবপ্রসাদ লড়ে আরও অনেকে লড়ে তোমরা সেখানে যেতে চাওতো আমি নিয়ে যেতে পারি। কিন্তু আমি সেখানে আর যাব না। কারণ আজ ওদের সকলকেই আমি মহা কুস্তী লড়ে হারিয়ে দিয়েছি সেইজন্তে ওরা-কেউই আমার সঙ্গে আর লড়বে না ব’লেছে।

মাধব বলিল—“আপনি যদি না যান, তাহলে আমরা যাব না। কিন্তু ওরা কি ভীক—আপনি হারিয়ে দিয়েছেন ব’লে ওরা আর আপনার সঙ্গে ল’ড়বে না—হিঃ, হিঃ। আচ্ছা, আপনি কি সকলকেই হারিয়ে দিলেন?”

শরৎচন্দ্র, দুই তিনটা ঢোঁক গিলিয়া বলিল—“নাঃ সকলের সঙ্গে আমি ল’ড়িনি। আমি প্রথমে ভৈরবপ্রসাদের সঙ্গে ল’ড়লুম। ভৈরবপ্রসাদের সঙ্গে কুস্তী আরম্ভ হ’তে প্রথমেই আমি তাকে এমন এক ল্যাং মেরে দিলুম যে, সে অননই দড়ান ক’রে চিৎ হ’য়ে প’ড়ে ছটকট করতে লাগল। তারপর অযোধ্যা এল অযোধ্যা নেমেই আমার আঁচমকা জাপটে ধরলে। মনে ক’রলে যে ওই রকম আঁচমকা জাপটে ধরলেই আমার কাবু ক’রতে পারবে। আমি কিন্তু ওর চেয়ে ছসিয়ার আমিও ওকে ঠেসে জাপটে ধ’রে কোসে দুয়ুংস্তর এক প্যাচ মেরে দিলুম; আর অযোধ্যা অমনি বাপ ব’লে একটি চিৎকার ক’রে চিৎ হয়ে মাটিতে প’ড়ল। তারপর কিন্তু যে লোমহর্ষণ ব্যাশার হল সে আর ব’লে কাজ নেই।”

ভুল-ভাঙ্গা,

হরিচরণ ও মাধব বলিল—“বলুন, বলুন, সে লোমঘর্ষণ ব্যাপাৰটা কি রকম হ’ল বলুন।”

শরৎচন্দ্র বলিল—“তারপর, ওদের ভেতর সব চেয়ে বেশী পাগোয়ান আর ওদের কুস্তী-লড়ানর-ওস্তাদ যে, সেই লোকটা এল ল’ড়তে। এই ওস্তাদটার সঙ্গে ল’ড়তে আমার বিশেষ বেগ পেতে হ’য়েছিল। ব্যাটা যেমন সগু তেমনি পাঁচ-জাননেওয়ালা। এই ওস্তাদটা ল’ড়তে ল’ড়তে আমার কাবু করে আর কি—ঠিক এমনি সময় আমি আর অন্য কোনও উপায় না দেখে, তার গালে ঠেসে মারলুম এক চড়—বল্লে না পিতৃহ হবে—আমার সেই বিরাশিকা ওজনের চড়টি খেয়ে, সে “হায়-হায়” ক’রতে ক’রতে উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। উপুড় হয়ে পড়লে তো আর আমার জিং হবে না—সে যতক্ষণ না চিং হবে ততক্ষণ আমার জিং হবে না। এইজন্তে আমি আবার একটি প্রচণ্ড খাপ্পড় ব্যাটার গালে মারলুম। আমার এই দ্বিতীয় চড়টি খেয়ে, ব্যাটা শূণ্ণের ওপর উঠে চার পাঁচবার ওলট পালট খেতে খেতে একেবারে ধপাস করে মাটিতে চিং হ’য়ে পড়ল আর কাটা ছাগলের মতন ছট্‌কট্‌ ক’রতে লাগল। এই ব্যাপার না দেখে সেখানে যত লোক ছিল সকলেই ‘চড়-চড়’ ক’রে ক্ল্যাপ দিতে লাগল আর শত মুখে আমার প্রশংসা করতে লাগল। কিন্তু সকলে মিলে এক জোট্‌ হয়ে ধললে যে—“আর আমার সঙ্গে কোনও দিন লড়বে না—এটা ওদের বড় unsportsman like কাজ হল।”

হরিচরণ ও মাধব সম্বরে ও মুক্তকণ্ঠে শরতের বাহাদুরীর প্রশংসা করিতে লাগিল। দীর্ঘ কিন্তু কোনও রকম প্রশংসা না করিয়া বলিল—“তা বাবু আপনি, যখন কুস্তী লড়েছিলেন তখন খালি গারে তো লড়েছিলেন।”

শরৎচন্দ্র—বিশেষজ্ঞের মতন তাব দেখাইয়া বলিল—“নিশ্চয়ই। খালি গারে নরত কি জামা গারে দিবে কুস্তী লড়া বারয়ে ব্যাটা যুথু’।”

দীক্ষু বলিল—“তবে আপনার জামা কাপড়ের ওপর ধুলো কাদা লাগল কি ক’রে?”

শরৎ দেখিল যে, দীক্ষুর জেরার চোটে তাহার সমস্ত মিথ্যাকথা ধরা পড়িয়া যায়। তাই সে মহা বিরক্ত হইয়া বলিল—“তোমার গুটির শ্রদ্ধ ক’রে আমার জামা কাপড়ে ধুলো লেগেছে ব্র্যাটা পাজী।”

দীক্ষু বলিল—“তাই বলুন যে, কুস্তী ক’রে আপনার এ দশা হয়নি; আমার গুটির শ্রদ্ধ করে হয়েছে।”

শরৎ প্রকাশ্যে আর কিছু না বলিয়া আপন মনে বিড়বিড় করিয়া দীক্ষুকে গালি দিতে, দিতে আপনার শয়নকক্ষে বাইয়া শুইয়া পড়িল। মনের দুঃখে সে, রাত্রে আর কিছু খাইল না।

মোক্ষদানন্দরী শরতের আগমন ও ভোজন প্রতীক্ষায় এত রাত্রি অবধি অতি কষ্টে বসিয়াছিলেন। পুত্র কিছু খাইবে না শুনিয়া—খাইবার নিমিত্ত পুত্রকে অনেক অনুরোধ করিয়াও সকলকাম না হইয়া নিজেও উপবাসী রহিলেন। সেদিন দশমী তিথি, পরদিন একাদশীর নিজের উপবাস। সেইজন্য তাঁহাকে অন্ততঃপক্ষে সামান্ত কিছু খাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া শরতের মাসীমাতাঘর অনেক পিড়াপিড়ী করিলেন। কিন্তু পুত্র যখন উপবাসী থাকিবে তখন তাঁহার পেটটাই কি বড় হইল—এই কথা বলিয়া মোক্ষদানন্দরী ভগ্নীম্বরকে নিরস্ত করিলেন। এই সকল কারণে তাঁহার ভগ্নীম্বরও কিছু খাইলনা। তিনটি বিধবা রমণী—

ভুল-ভাগা

দেবদর্শনাভিলাষে সারাদিন ধরিয়া নানা দেবতার মন্দির পরিভ্রমণ করিয়া শ্রম কাতর ও ক্ষুধা তৃষ্ণার একান্ত ব্যাকুলা ছিলেন—কিন্তু এমনই তাঁহাদের শিক্ষিত পুত্রের মহিমা যে, সেই অবস্থায় তাঁহারা উপবাসী রহিলেন। তাহার উপর পরদিন একাদশীর জন্ত তাঁহাদিগকে নিজেরা উপবাস করিতে হইবে। শিক্ষিত ও সভ্য পুত্র এ সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও বেশ নিশ্চিন্ত ভাবে শুইয়া পড়িল।

পরদিন প্রাতঃকালে শয্যাভ্যাগ করিয়াই শরৎচন্দ্র নীচে আসিয়া সর্বাগ্রে—একগুণা মুগার ডিমের পোঁচ, ছয় খানি টোষ্ট্ করিয়া রুটি চারখানি কাশীর বিখ্যাত চম্‌চম্ ও আড়াই কাপ চা খাইয়া তবে প্রাতঃ-কৃষ্ণাদি সমাপন করিল। মোক্ষদামুন্দরী ভগ্নীদ্বয়ের সহিত বাবা বিশ্বনাথ ও মা অন্নপূর্ণার দর্শনে বাহির হইয়া গেলেন।

শরৎচন্দ্র সংবাদপত্র পাঠ করিতে, করিতে সিগারেট ছুঁকিতে লাগিল। কিন্তু অল্পকণ পরে আর কাগজ পড়ায় মন বসাইতে পারিল না। “কতক্ষণে দুপুর হইবে এবং সে, দুপুরবেলায় ভৈরবপ্রসাদের নিকটে যাইয়া কি কি কথা বলিয়া লছমীকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিবে ও ভৈরব প্রসাদ সম্মতি দিলে, সে কি ভাবে লছমীকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিয়া অযোধ্যার সামনে দিয়া-বাগানে বেড়াইবে এবং তাহার এ প্রস্তাবে ভৈরবপ্রসাদ তো সন্মত হইবেই কিন্তু যদি তিনি প্রথমটার একটু কিন্তু-মিস্ত্র করেন তাহা হইলে লছমী নিশ্চয়ই স্বতঃপ্রবৃত্তা হইয়া তাঁহার সম্মুখে জামু পাতিয়া বসিবে এবং “সে” শরৎকে বড় ভালবাসে ও শরৎ ভিন্ন অন্য কাহাকেও বিবাহ করিবে না—এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া ছুটিয়া আসিয়া তাহার কণ্ঠলগ্না হইবে” ইত্যাদি, ইত্যাদি নানারূপ চিন্তা শরৎচন্দ্রের

মনে উদিত হইতে লাগিল। সে ছটফট করিতে করিতে বেলা নয়টা অবধি কাটাইয়া, তাহার সুসজ্জিত বাথরুমে গমন করিতে গেল। সাত আট ছোপ সাবান মাখিয়া দেড়ঘণ্টা ধরিয়া গমন করিয়া সে অতি ব্যস্ত ভাবে আহ্নার করিতে গেল। কোনও রকমে কিছু নাকে মুখে ওঁজিয়া আহ্নার সমাপন করিয়া শরতচন্দ্র পুনরায় স্নানের ঘরে গিয়া তাহার মুখে ও হাত দুইটির করুই অবধি দুই ছোপ সাবান মাখিল। তৎপরে সুসজ্জিত ড্রেসিং রুমে প্রবেশ করিয়া প্রায় দেড়ঘণ্টা—পাউডার মাখা হেজলিন-স্নো মাখা কসমেটিক মাখাইয়া পাতা কাটিয়া টেরী কাটা প্রভৃতি অঙ্গরাগ ব্যাপারে কাটাইয়া সে, তাহার সর্বাপেক্ষা ভাল জরিদার পাঞ্জাবী, চাদর, কাপড় প্রভৃতি আলমারী-হইতে বাহির করিয়া পরিল। তৎপরে দুই শিশি এসেন্স বাত্বির করিয়া তাহার দেড় শিশি আন্দাজ এসেন্স ক্রমাল, জামা ও চাদরে মাখিল এবং আধ শিশি এসেন্স কাপড়ে মাখিল। এই ভাবে সমস্ত নিত্যকর্ম সমাপন করিয়া তাহার বড় প্রিয় “সিগ্গটিপ্‌টড্‌ আবদাল্লা সিগারেটের” টিনের ভিতর হইতে কুড়িটি সিগারেট বাহির করিয়া “সুবর্ণ নিশ্চিত সুদৃশ্য সিগারেট-কেসে” ভরিল এবং একটি সিগারেট—মরক্কো চর্মনির্মিত-আধারস্থ দিয়াশাগাই দ্বারা ধরাইয়া লইয়া গুণ গুণ করে গান গাহিতে গাহিতে ভৈরবপ্রসাদের অট্টালিকার ভিতর প্রবেশ করিল।

মধ্যাহ্নে ভৈরবপ্রসাদ ড্রয়িংরুমে তাকিয়া ঠাসান দুিয়া অর্ধ-শায়িতভাবে বসিয়া তাঁহার বিশাল উদরে হাত বুলাইতেছেন এবং একটি নূতন গড়গড়ায় তামাক খাইতেছেন। তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া অযোধ্যা সংবাদ পত্র পাঠ করিয়া শুনাইতেছে। লছমী নিকটস্থ একখানি চেয়ারে বসিয়া তাবুল চর্কন করিতে, করিতে উল বুনিতোছে।

ভুল-ভাঙ্গা

এমন সময় মুঁহুহু হাসিতে হাসিতে, শরৎচন্দ্র তথায় উপস্থিত হইল এবং আজ আর প্রতিদিনের মতন পাঁশ্চাত্য কারদায় অভিবাদন না করিয়া তৈরবপ্রসাদের নিকটে বাইরা তাহার পদধূলী গ্রহণ করিয়া মুখে ও মাথায় ঠেকাইল এবং তৎপরে ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিল। তারপর লছমীর পার্শ্বে একখানি চেয়ার টানিয়া আনিয়া, তাহার গা ঘেসিয়া বসিয়া পড়িল।

শরৎচন্দ্র ঐরূপ ভাবে পার্শ্বে বসাতে লছমী ও অযোধ্যার চোখে-চোখে কি বেতার-টেলিগ্রাম হইয়া গেল। লছমী সেই চেয়ার হইতে উঠিয়া অগ্ন্যস্থানে বসিতে বাইবার উপক্রম করাতে শরৎ, তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল—“পালাচ্চ কেন, পালাচ্চ কেন? আমার দেখে আবার লজ্জা কি? দুদিন বাদে যে আমার না দেখে একদণ্ডও থাকতে পারবে না তখন লজ্জা কোথায় থাকবে।

সহান্য মুখে তৈরবপ্রসাদ বলিলেন—“আরে বেটি শরতের ঠাণ্ডা আছে তোমার আবার হঠাৎ লজ্জা কেনরে? ওতো আমার, ছেলের মতন, তোমার ভাই যে শরৎ।”

শরৎচন্দ্র লজ্জা জিভ বাহির করিয়া বলিল—“ছিঃ, ছিঃ ওকথা ব’লবেন না, ওকথা ব’লবেন না—আমাকে লছমীর ভাই ব’লবেন না, বরঞ্চ ওর ভাসুরের ভাই বলুন।”

অযোধ্যা বিরক্তভাবে বলিল—“এডিটোরিয়াল কলমটা প’ড়েনি—আমার একবার সহরের দিকে যেতে হবে, একটু তাড়া রয়েছে।”

তৈরবপ্রসাদ বলিলেন—“হ্যাঁ, হ্যাঁ—পড়’ পড়’।”

শরৎ বলিল—“কাগজ-পড়া পরে শুনবেন। আগে আমার একটা বড় দয়াকরী কথা আছে শুনুন।”

ভৈরবপ্রসাদ বলিলেন—“বল, বল—কি কথা বল ।”

ছই, তিনটি টোক গিলিয়া শরৎ বলিল—“এই কথাটা হতে কেয়া, এই, এই হ্যা—হামি আপকো পাস একঠো শুভ ও আনন্দজনক প্রস্তাব ক’রতে আরা হার ।”

ভৈরবপ্রসাদ বলিলেন—“কি প্রস্তাব করতে চাও কর ।”

শরৎচন্দ্র বলিল—“অতি শুভ, অতি মঙ্গলময়, অতি আনন্দজনক প্রস্তাব । আপকো তো লেকড়া-টেড়কা হ’ল না—এ প্রস্তাবে তবু যাহোক আপনার বংশরক্ষার একটা ব্যবস্থা হবে । আমি, আপকো লেড়কীকে সাদী ক’রতে চাই । আপ হামকো সাথ লছমীকো বিয়ে দিজিয়ে ।”

ভৈরবপ্রসাদ বিশ্বয়ের আবেগে প্রথমটার কোনও কথা বলিতে পারিলেন না । তিনি শরতের মুখের দিকে কটমট করিয়া চাহিয়া রহিলেন । তৎপরে গম্ভীর ভাবে বলিলেন—“আরে শোরোৎবাবু তুম্ কেয়া পাগলা হয় ? এরসা বাৎ কতি হোনে সেকতা ? বাঙ্গালীকা সাথ হামারা লেড়কীকা সাদী হোগা ।”

শরৎচন্দ্র বিরক্তি প্রকাশ করিয়া, ভৈরবপ্রসাদের মুখের কাছে, ছই হাত নাড়িতে নাড়িতে বলিল—“আরে হাম বাঙ্গালী আউর আপু খোটা হোনেসে কতি কিগো জী ? আপকা লেড়কী—হামারা সুপুরুষ রূপে মোহিত হোরে হামারা প্রেমে পড় গিয়া । প্রেমকা পান কুছ আটকাতা কি ? আর, তহুপরি আরো দেখো জী ভৈরবপ্রসাদ—হামলোককো এই সাদীসে বো বর্ণশঙ্কর সন্তান উৎপাদিত হোগা, তার মতন বলিষ্ঠ, সুস্থ, সবল সন্তান আর কতি কোথাও হয় নেই । সে সন্তান পৃথিবী কর

ভুল-ভাঁজ

করতে পারিগা? আপ তখন পৃথিবীপতিকা-মাতামহ বোলকে জগৎময় প্রসিদ্ধি লাভ ক'রতে সক্ষম হোয়েগা।”

ভৈরবপ্রসাদ আর ধৈর্যধারণ করিতে না পারিয়া সক্রোধে দণ্ডারমান হইয়া বলিলেন—“খবরদার, এসসা বাৎ অউর মৎ বোলনা। নেহিতো আভি খারাবী হো যাগ।।”

শরৎচন্দ্রও একটু চীৎকার করিয়া বলিল—“তাহলে লছমীর সঙ্গে হামারা বিয়ে নেহি দেগাতো? আচ্ছা বেশ। কিন্তু লছমী আমার প্রেমে প'ড়ে গিয়া, হামাকে ছেড়ে অন্য লোককা সাথ লছমীর বিয়ে দেনেসে, জগৎজুড়ে লোকে যখন লছমীকে দ্বিচারিণী-ফিচারিণী বোলকে নিন্দে করিগা—তখন কিন্তু আমার কোনও দোষ নেই।

ভৈরবপ্রসাদ ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন—“নিকালো, নিকালো, হামারা কোঠিসে আভি নিকালো।”

শরৎচন্দ্র লছমীর দিকে কিরিয়া বলিল—“লছমী প্রাণেশ্বরী তোমার বাপ ক্যাটাচ্ছেলের আক্কেল দেখ। তোমার স্বার্থপর বাপ, তোমার অধের দিকে চেয়ে দেখলে না আর তোমার যে প্রাণেশ্বর, তাকে ঐ সব কটু কথা ব'ললে। তুমি অমন পানী, তাপী, বদ-আলাপী, কথার-খেলাপী, বাপের কাছে আর এক মিনিটও থেক না। আমি তোমার নিয়ে উধাও হ'য়ে বাই চল। এস, আমার হাত ধর।” এই কথা বলিয়া লছমীর দিকে সে অগ্রসর হইতেই ভৈরবপ্রসাদ সম্মুখে দাঁড়াইয়া বাধা দিলেন। শরৎ খাকা দিয়া তাঁহাকে সরাইয়া অগ্রগমনে উদ্বৃত্ত হইলে তিনি শরৎের দুই হাত চাপিয়া ধরিলেন। তখন উভয়ে একটা ঠেলাঠেলি পড়িয়া গেল এবং একটা অর্দ্ধ-মারামারি-গোছের ব্যাপার হইতে লাগিল।

অযোধ্যা এতক্ষণ নীরব ছিল, সে এই সময় সবোশে আসিয়া শরতের গলা টিপিয়া ধরিয়া গ্রহণ করিতে উত্তত হইল । কিন্তু ভৈরবপ্রসাদ বাধা দিয়া বলিলেন—“মেরনা, মেরনা, বা হবার যথেষ্ট হয়েছে—আর ছোটলোকমীতে অগ্রসর হবার দরকার নেই । এটা ভদ্রলোকের বাড়ী যতদূর হ’ল তাই যথেষ্ট । এরকম ব্যাপার ডাল্কাগুণ্ডীতে হওয়া স্বাভাবিক ও শোভনীয় । শরৎ তুমি ভদ্রলোকের ছেলে—আমরাও তাই ; আমাদের ভেতর এ রকম ব্যাপার একেবারে বাহ্যনীয় ও শোভনীয় নয় । নাও ঠাণ্ডা হয়ে ব’সে কথা কও ।”

শরৎ বলিল—“লছমীকে আমার দিন । ওকে না পেলে আমি কিছুতেই বাঁচব’ না । ওকে দেখে যত না মুগ্ধ হ’য়েছি—ওর সঙ্গে আলাপ ক’রে, ওর চাল-চলনে আমি তার চেয়ে লক্ষ গুণে মুগ্ধ হ’য়েছি, ওর পায়ে প্রাণ স’পেছি ।”

ভৈরবপ্রসাদ বলিলেন—“এ কিছুতেই হোতে পারে না । তুমি এ রকম ছুরাশাকে মনে স্থান দিলে কেন ?”

শরৎ বলিল—“আমার পক্ষে এটা কিছুতেই ছুরাশা নয় । আমি উদ্বাস্তান, শিক্ষিত, ধনী । এক ব’লতে পারেন যে, আমি অশ্রু জাত । তা আপনার মতন কুসংস্কারবর্জিত, সত্যতালোক-প্রাপ্ত, নব শিক্ষায় শিক্ষিত, নব্যচালে জীবনযাপনকারী লোকের মুখে এ কথা শোভা পায় না ।”

ভৈরবপ্রসাদ বলিলেন—“ওসব আমি কিছু জানি না । তোমার সঙ্গে লছমীর বিয়ে দোষ না । বার-ভার সঙ্গে লছমীর বিয়ে দিতে হবে—কেন ?”

ভুল-ভাল

শরৎ বলিল—“আপনি যদি বার-বার সঙ্গে লছমীর বিয়ে না মেবেন তাহলে বার-বার সঙ্গে তাকে অবাধে মিশতে দিচ্ছেলেন কেন? বার বার প্রশ্ন কি প্রশ্ন নয়? সে প্রশ্নে কি শ্রম, ভালবাসা, সৌন্দর্য্য প্রীতি নেই? সে প্রশ্নটা কি অসাড়, নিষ্পন্ন, সুখ-দুঃখ-জ্ঞান-রহিত জড়? নারী আর পুরুষ—বিধাতার বিধানে উত্তরের বা সম্বন্ধ, তাতে এ রকম বয়সে উত্তরকে এক সঙ্গে মিশতে দিলে বা হয়, এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। ছুজনেই ছুজনকে ভালবেসেছি।”

ভৈরবপ্রসাদ বলিলেন—“ভুল, ভুল, তোমার মহাভুল হয়েছে। কে তোমাকে বলে যে, লছমী তোমার ভালবেসেছে!”

শরৎ বলিল—“নিশ্চয়ই ভালবেসেছে। লছমীর প্রতি ভাবে, ভগ্নীতে, কথাবার্তার, মুহূর্তসিঁতে—আমায় যে, সে ভালবেসেছে—একথা প্রকাশ পেয়েছে। কি লছমী বল না।”

লছমী দৃঢ়স্বরে বলিল—“আমি কোনও দিন এমন কিছু ভাব দেখাইনি বা এমন কোনও কথা বলিনি যাতে আমি—শরৎবাবুকে ভালবাসি—একথা প্রকাশ পায়। আমি ভক্ততা ও সত্যতার চাল রক্ষার জন্যে বতটুকু করা উচিত ততটুকু ক’রেছি।”

শরৎচন্দ্র বলিল—“কেন মিছে কথা ব’লছ? ধর্ম্ম সাক্ষী ক’রে সত্য কথা বল, তুমি আমার রূপে মোহিত হওনি।”

লছমী বলিল—“এ প্রশ্ন ভক্ততার-সীমা অতিক্রম ক’রলেও, বর্তমান ক্ষেত্রে উচিত ব’লে ব’লছি যে, আপনার রূপ দেখে মোহিত হওয়া, দূরে থাক—আমার প্রশ্নে স্বপ্ন! হয়েছে। আমি শুধু শুধু আপনাকে ভাল-

হাসতে বাব কেন ? আপনাকে শিক্ষিত হেনে, ভুললোক 'হেনে আপাপ
ক'রেছিলুম। আপাপ ক'রে বুঝলুম যে একটা বানরে আর আপনাতে
বিশেষ প্রভেদ নেই।”

ভৈরবপ্রসাদ বলিলেন—“ভুল, ভুল, ভুল বুঝেছিলে শরৎচন্দ্র। লছমী
শিকার খাতিরে, নব-সত্যতার চালের খাতিরে তোমার সঙ্গে অসহোচে
আলাপ ক'রেছিল। তুমি সেটাকে ভালবাসা মনে ক'রে নিয়ে বড়ই
নির্বোধের মতন কাজ ক'রেছ।”

শরৎ বলিল—“বাঃ বাঃ বড় সুন্দর কথা। ব্যাঙের ওপর ঢালা
মেয়ে মানুষ খেলা করে আর তার সেই খেলার কিন্তু ব্যাঙের প্রাণ যায়।
আপনার মেয়ে' নব-সত্যতার-চালের খাতির রাখে আর তাতে কিন্তু
অন্ত লোকের প্রাণ যায়। লছমীর না হয় ঐ একজন প্রেমপাত্র র'য়েছে
আর তার সঙ্গে লছমী না হয় অনেক মজা লুটেছে—তাই আপনারা সবাই
খুব বড়াই ক'রছেন। কিন্তু আপনার মেয়ের সঙ্গে যাত্রা অবোধে মেশে
তার। সবাই কিছু বুদ্ধ নয় বা তাদের সকলেরই কিছু প্রেমপাত্রী বুনই বা
তার। সবাই কিছু প্রেমের মজা লোটেনি। এই যে আমি—আমি বুদ্ধ
নই, বিবাহিত নই, জড় নই ; আমার এখন নতুন জীবন, প্রথম যৌবন—
এ রকম ক্ষেত্রে, জীবনের এই সর্বাপেক্ষা সঙ্কটময় সময়ে, একজন নব
যুবতী—ঠিক আমার মনের মতন, আমার কল্পনার-জীবন্তমূর্ত্তির মতন
একজন নব-যুবতী যদি আমার জীবনের পথে এসে দাঁড়ায়, আর পারি-
পার্শ্বিক চাল-চলন দেখে মনে হয় যে, তাকে লাভ করা যাবে, সে রকম
ক্ষেত্রে তাকে পাবার আশা করা কিছু অশ্রাব্য নয়।”

ভৈরবপ্রসাদ বলিলেন—“তাইত, তাইত—”

ভুল-ভাজা

শরৎ বলিল—“আমি লছমীকে চাই-ই চাই । এর জন্তে যা হয় হবে । লছমী, লছমী তোমার ঐ সোনার অঙ্গের আলিঙ্গন একবার দাও, তোমার ঐ মধুর মুখের একটি চুম্বন দাও—তোমার বাপের এই অসঙ্গত-জাত্যাভিমান ঘুচে থাক, আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে দিক ।” এই বলিয়া সে সবেগে লছমীর দিকে ধাবিত হইল । ভৈরবপ্রসাদ বাধা দিতে গেলেন কিন্তু শরৎ সজোরে এক ধাক্কা দিয়া তাঁহাকে ফেলিয়া দিয়া লছমীর পানে ছুটিল । কিন্তু অযোধ্যা তাহাকে জাপটাইয়া ধরিল । ধস্তাধস্তি করিতে, করিতে শরৎ বলিল—“আমায় ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, আমি ঐ নারী-রত্নকে চাই । আমি শুকে অন্ততঃ একবার আলিঙ্গন করব, ওর মধুর মুখে অন্ততঃ একটি চুম্বন দোব । এর জন্তে আমার যা হয় হবে ।” দুজনে খুব ধস্তাধস্তি করিতে লাগিল । শরৎ মরিয়া হইয়া অযোধ্যাকে, প্রাণপণ বলে একটি ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিয়া লছমীকে ধাবিতে ছুটিল । লছমী ভয়ে চিৎকার করিয়া উঠিল । শরৎ দুই হস্ত বিস্তার করিয়া বেই লছমীকে আলিঙ্গন করিতে বাইবে ঠিক সেই মুহূর্ত্তে অযোধ্যা আসিয়া, বজ্রমুষ্টিতে তাহার গলা টিপিয়া ধরিল এবং উভয়ে মিলিয়া আবার ধস্তাধস্তি করিতে লাগিল । কিছুক্ষণ পর অযোধ্যা তাহাকে হিড়হিড় করিয়া টানিয়া বাহিরে লইয়া বাইতে লাগিল ।

ভৈরবপ্রসাদ কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন—“নিয়ে যাও, নিয়ে যাও, আর এখনই ও রকম ভয়ানক লোককে আমার বাড়ী থেকে বেব ক’রে দাও । ওদের যেখানে ইচ্ছে হয় থাকুকগে ।”

সজোরে শরৎকে টানিতে, ঠানিতে বাহিরে লইয়া গিয়া অযোধ্যা তাহার নিকট দাঁড়াইয়া রহিল এবং দরওয়ানকে গাড়ী আনিতে আদেশ

করিল। কিছুক্ষণ পরে আটখানি গরুর গাড়ী ও দুইখানি ঘোড়ার গাড়ী আসিলে—সকলে মিলিয়া তাড়াতাড়ি করিয়া তাহাতে শরৎের সমস্ত মালপত্র বোঝাই করিয়া দিল। এতগুলি গরুর গাড়ী অ এই যে, বিশেষে গিয়া পাছে বাবুমানীর কিছু কমী হয় এইজন্য শরৎচন্দ্র কলিকাতা হইতে আসিবার সময়—অনেক কাপড়-চোপড়, পোষাক প্রভৃতি ও গাদা, গাদা এসেন্স, লোসান, ব্রিলেণ্টাইন, পাউডার, ক্রিম, শ্রো, বিউটিস্-চার্ম, নানারূপ কাটগ্রাস-নির্মিত-আধার ড্রেসিং টেবিল, বড় আরনা, আয়নাযুক্ত আলমারী, হাট ষ্ট্যাণ্ড, আমব্রেল ষ্ট্যাণ্ড প্রভৃতি বহু-বহুবিধ আড়ম্বরময় বিলাসজ্জ্বা সঙ্গে আনিয়াছিল। ভৈরব প্রসাদের নিকট হইতে শরৎচন্দ্র, থাকিবার জন্ত সে স্বতন্ত্র বাড়ীটি পাঠিয়াছিল সেই বাড়ীটির তিনটি ঘর সে, নিজের মনের মতন করিয়া ঐ সকল জ্বা দ্বারা—পৃথক ভাবে ড্রেসিং রুম, বাথ-রুম, বেড-রুম প্রভৃতি সাজাইয়া ছিল। এই সমস্ত জ্বা গুছাইয়া ইহারা যখন ভৈরব প্রসাদের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল তখন অপরাহ্নকাল উত্তীর্ণপ্রায়। এই সমস্ত ব্যাপারে মোক্ষদাসুন্দরী মরমে মরিয়া গেলেন। “এই দণ্ডে কাশী ভাগ করিয়া বাইবার জন্ত” মোক্ষদাসুন্দরী অনেক করিয়া পুত্রকে অনুরোধ করিলেন। পুত্র বলিল যে—“না, আর দিন কতক থেকে এ ব্যাটাদের জন্ত ক’রে দিবে তবে কাশী ছাড়ব।”

“কিছু দূরে একটি ভাল বাগান-বাড়ী, তাড়ার জন্ত খালি আছে” এই সংবাদ গাড়োয়ানদের মুখে শুনিয়া, শরৎচন্দ্র সদলবলে সেখানে দাঁড়াইয়া, সেই বাগান-বাড়ীটি ভাড়া লইল এবং সমস্ত মালপত্র তথায় উঠাইয়া নবোৎসাহে যরসাজাইতে আরম্ভ করিয়া দিল।

হুল-ভাঙ্গা

শরৎচন্দ্রদের বিদায় করিয়া দিবার পর, ভৈরবপ্রসাদের নিকটে আসিয়া অযোধ্যা বলিল—“তাদের সব তাড়িয়ে দিবে এলুম।”

ভৈরবপ্রসাদ বলিলেন—“যাক বাচলুম। আমি এতকণ অতি ভয়ে, ভয়ে সময় কাটাচ্ছিলুম আর যে বিশ্বনাথকে বহুদিন ভুলে গেছলুম সেই বাবা বিশ্বনাথকে প্রাণপণে ডেকে বলছিলুম যে, এই কেলেকারীর ব্যাপারটা যেন বাজারে না বেরোয়। ওঃ ব্যাপারটা মনে হ’লে এখনও আমার বুকের ভেতর সেই রকম ‘এইসি-তেইসি’ ক’রে ওঠে আর প্রাণটার “আরে মায়ীরে” ব’লে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করে। যা হবার হ’য়ে গেছে; আর নয়, আর নয়। আমি এই সামনের লগ্নেই তোমাদের দুজনের বিয়ে দোব কিন্তু আজই তোমাদের দুজনের মিলন করিয়ে দোব আর এই সভ্যতার চালে দুশো সেলাম ঠুকে, আগে যেমন ছিলুম ঠিক তেমনি হব’। তোমরা প্রস্তুত হ’য়ে এগিয়ে এস; আমি এখনই তোমাদের দুজনকে হাতে, হাতে সঁপে দোব।” তবে আর খিচুড়ী চালে নয়। অগ্নি, নারায়ণ আর ব্রাহ্মণ সাক্ষী রেখে দুজনের মিলন করিয়ে দোব। পাছে অসভ্য ব’লে বদনাম বেরিয়ে যায় সেইজন্তে আমার বাড়ীতে ওসব পাঠ রাখিনি। অথচ আজ বিশেষ দুরকার ব’লে আমি এতকণ অনেক চেষ্টা আর খোশামোদ ক’রে, এই দেখ, ওপাড়া থেকে শালগ্রামশীলা, গজাজল, কুনের মালা আনিয়া ঐ টেবিলের ওপর রাখিয়েছি আর ঐ যে চৈতন-চুটকৌণা লোকটি ব’সে রয়েছেন, উনি একজন বামুন-পণ্ডিত।” এই কথা বলিয়া নিকটে উপবিষ্টা লছমীর হাত ধরিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—“কই আগুন কই? সব জিনিষ এল আর আগুন কই?” “কই আগনিত’

আশুণ আনতে বলেননি—এই কথা ঐ বামুন-পণ্ডিতটি বলাতে, ভৈরবপ্রসাদ বলিলেন—“না, না তা হবেনা ; অগ্নি চাই। আমি আর কাঁচা কাজ করব না। খিচুড়ী চালে আর চলবনা বলেই না আমি আজই অগ্নি-নারায়ণ-ব্রাহ্মণ সাক্ষী রেখে লছমীকে যথাশাস্ত্র সংপে দিতে চাই।” এইরূপ অসময়ে এবং এত তাড়াতাড়ি এখন কোথা হইতে খানিকটা আশুণ পাওয়া যায় ? এই লইয়া দুই একটা তর্কাতর্কি হইবার পর, ভৈরব প্রসাদ একখানি চেয়ার লইয়া, কাঠের টেবিলের উপর তুলিয়া খুব জোরে চেয়ারের পায়া ধরিয়া তাহা টেবিলের উপর ঘসিতে, ঘসিতে বলিলেন—“একটু অপেক্ষা কর, আমি এখনই আশুণ জ্বলে দিচ্ছি। এই চেয়ারটা আর একটু ক্ষণ টেবিলের ওপর ঘসিলেই এখনই আশুণ জ্বলে উঠে এই চেয়ার টেবিল দুইই ধোরে যাবে আর তাতে যে আশুণ হবে সে আশুণ অনেকক্ষণ থাকবে—ততক্ষণে আমার সম্প্রদান করা হয়ে যাবে শ্রাকড়া কি কাগজ জ্বাললে যেমন টপ্ করে আশুণ নিতে যাবে, এতে আর তেমন হবেনা।” এই বলিয়া তিনি আরও জোরে, জোরে চেয়ারটি টেবিলের উপর ঘসিতে লাগিলেন। বামুন-পণ্ডিতটি অবাক হইয়া কিছুক্ষণ বাবৎ এই অদ্ভুত ব্যাপার নীরিক্ষণ করিয়া তৎপরে বলিল—“আরে বাবুসাহেব এ কি ছেলে মানুষী ক’রছেন। অন্য উপায়ে বরং আশুণ জ্বালবার ব্যবস্থা করুন। এ রকম ক’রলে, কি আশুণ জ্বলবে ? ”

ভৈরব প্রসাদ বলিলেন—“ওর বাপ যে, সে জ্বলবে ; ওতো ছেলে-মানুষ। তুমি বাপু কেবল টিকি নাড়তে আর আলোচাল করার পুঁটলী বাধতে জান। তুমি এসব সারেকের ব্যাপার কি বুঝবে। আমি সভ্য-

জল-ভাঙ্গা

মানুষ, আমি ওগু মিষ্ট্রী জানি। দেখনা এখনই এই ছোটো ঘ'মে আগুন জালিয়ে ফেলব। ও ছোটোতো কাঠ—তুমি আমায় এক বালতী জল এনে দাও, আমি হাতে ক'রে সেই জলটা খানিকক্ষণ ঘ'সব আর অমনি আগুন জলে উঠে সেই জলটা ধু, ধু ক'রে জলতে থাকবে, খানিক বাদে দেখবে যে বালতীটা শুক্কু জলছে।” এই কথা বলিয়া ভৈরবপ্রসাদ, নবীন উদ্যমে চেয়ার-টেবিলে আরও খানিকক্ষণ ঘসাঘসি করিয়া অবশেষে হাঁপাইতে, হাঁপাইতে বলিলেন—“নাঃ, এটা জলবেনা দেখছি। হেসনা, হেসনা, কারণটা শোন। এই চেয়ারটার যত লোক বসে আর এই গরমে ঘামতে থাকে—তাদের সেই ঘামের চোটে চেয়ারটার সমস্ত কাঠ ভিজ্ঞে আছে, তাই জ'লল না।”

বামুন-পণ্ডিতটি বলিল—“সেকি বাবুসাহেব, আপনি এই বলেন যে, ঘ'মে ঘ'মে জলে শুক্কু আগুন জালিয়ে দিতে পারেন।”

ভৈরব প্রসাদ বলিলেন—“তাঁতো বলেইছি। কিন্তু ভিজ্ঞে-কাঠে আর জ্বল কত তুফাৎ তা কি জানহে অসভ্য? আগে সভ্য হও তবে এ সব বুঝতে পারবে। ভিজ্ঞে-কাঠ কিছুতেই জলেনা কিন্তু জল টপ ক'রে জলে যার কারণ জলের ভেতর স্বভাবতঃই আগুন আছে। প্রমাণ স্বরূপ এক টুকরো বরফ এনে দেখ—দেখবে যে তাতে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। ধোঁয়া দেখলেই বুঝবে যে তাতে আগুন আছে কারণ ধুমই অগ্নির আবির্ভাব ঘোষণা করে।” এইরূপ বহুবিধ তর্কের পর অবশেষে এই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের পরামর্শে জনৈক মুছরী একটি চক্কীর দাতী জালিয়া আনিল। তখন ভৈরবপ্রসাদ গঙ্গা জলের বটি হইতে একটু গঙ্গাজল লইয়া নিজের ও অনাত্ম সকলের মাথায় ছিটাইয়া দিয়া বলিলেন—

“লছমী, অযোধ্যা তোমরা এই অগ্নি, নারায়ণ, আর ব্রাহ্মণ সাক্ষী রেখে দুজনে দুজনের গলায় মালা দাও।”

লছমী ও অযোধ্যা দুইগাছি মালা লইয়া পরস্পরের গলায় পরাইয়া দিল। তখন ভৈরব প্রসাদ দুই হস্তে লছমী ও অযোধ্যার হাত ধরিয়া বলিলেন—“ওগো, আমার আদেশে এতদিন ধোরে তোমরা দুজনে দুজনকে যে ভাই-ভগ্নীর মতন দেখতে, আমাব এখনকার এই Further-আদেশে তোমরা এখন থেকে সেই ভাই ভগ্নীর সম্বন্ধচ্যুত হ'লে, আজ থেকে তোমরা পরস্পরে স্বামী-স্ত্রীর মতন ব্যবহার ক'রবে। শোন লছমী, শোন অযোধ্যা শোন মুহুরী, ওহ ও ব্রাহ্মণ ভূমিও শোন—বিদেশী-চালের কুতূকে প'ড়ে কণ্ঠার শরীর নষ্টের ভয়ে উপযুক্ত সময়ে তার বিয়ে না দিয়ে তাকে অধিক রস অধি আইবুড়ে রেখে আর ধার-তার সঙ্গে তাকে মিশ'ত দিয়ে আদি ভুল-ভুল-মহাভুল ক'রেছিলুম; আমার জাত, কুল, মান, বংশের-পবিত্রতা সব নষ্ট ক'রতে ব'সেছিলুম। সামনে যে লগ্ন পাব সেই লগ্নেই যথাশাস্ত্র এদের বিয়ে দোব। এখন এস অযোধ্যা—এই নারায়ণ, অগ্নি আর ব্রাহ্মণ সাক্ষী রেখে তোমার হাতে লছমীকে সঁপে দিলুম। দেখো অযোধ্যা তোমার ঘরকে যেন অধিক কোর না।

অযোধ্যা ও লছমী ভূমীষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল; তিনি দুই হস্ত হাহাদের মাথায় ঠেকাইয়া আশীর্বাদ করিলেন। ঠিক এই সময়ে—উলু—উলু—লু—লু—বলিয়া দুই চারিবার হলুধ্বনি করিয়া সেই বামুন—পণ্ডিতটি বলিল—“সবতো এক রকম হ'ল, কিন্তু একটি জিনিসের অভাব রয়ে গেল। অগ্নির অভাব হচ্ছিল—তাতো চক্কী বাতী জ্বলে সে অভাব

ভুল-ভাল

পূর্ণ করে নোয়া গেল, আমি নিজে হালধনিও করে দিলাম কিন্তু শঙ্খধনি তো করা হ'ল না।

ভৈরবপ্রসাদ বলিলেন—“তাইত বড়ই ভুল হয়ে গেছেতো। একটা শাঁকের ব্যবহৃতো করা হয়নি অথচ শাঁক না হ'লে যে একটা মহা খুঁৎ থেকে যাবে।”

বামুন-পণ্ডিতটি বলিল—“হ্যাঁ শঙ্খধনি না হ'লে বড়ই খুঁৎ থেকে যাবে। আপনি যখন পাকা কাজ চান তখন এই সম্প্রদান-কার্যে শঙ্খধনি করা চাই-ই চাই। বাড়ীর ভেতর থেকে তাড়াতাড়ি একটা শাঁক আনতে ব'লে দিননা—আমি এখনই বাজিরে দিচ্ছি।”

ভৈরবপ্রসাদ বলিলেন—“আমার বাড়ীতে ওসব পাঠ অনেক দিন উঠে গেছে। আমি যখন প্রথম সভা হই তখন, ও শাঁক-ফাঁক সব পূজোর জিনিস, একটা মন্দিরের পূজারীর কাছে ঝেড়ে দিয়েছিলুম। আমার বাড়ীতে ওসব কিছুই নেই। কিন্তু এদিকে যখন আবার শঙ্খধনি না হ'লে মহা খুঁৎ থেকে যাবে তখন আমি এর একটা উপায় করে দিচ্ছি এই কথা বলিয়া ভৈরবপ্রসাদ, তাঁহার বিশাল গাল দুটি ফুলাইয়া পুঁ—পুঁ—পুঁ—উ—উ—উ করিয়া শঙ্খের অনুরূপ শব্দ করিতে লাগিলেন। বামুন-পণ্ডিতটি কিছুক্ষণ পরে বলিল—“হয়েছে, আর শাঁক বাজাতে হবেনা—ধামুন ধামুন।” আর ধামুন—কাহারও কোনও কথায় কান না দিয়া, ভৈরবপ্রসাদ মুখের কাছে দুই হাত তুলিয়া, বড় বড় গাল ফুলাইয়া পুঁ—পুঁ—পুঁ—উ—উ শব্দ করিয়া আপনার থেয়ালে শাঁক বাজাইতে লাগিলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ ।

ভৈরব প্রসাদের বাটি হইতে বিতাড়িত হইবার পাঁচ দিন পরে এক দিন অপরাহ্নকালে, শরৎচন্দ্র অতি ব্যস্তভাবে ড্রেসিং-রুমে চুকিল। এত অপমান হইয়াও পরতের মানসিক বা বাহ্যিক কোনও পরিবর্তন হয় নাই। এই নূতন বাটিতে আসিয়া সেইরূপ ভাবে ড্রয়িং-রুম, বাথ-রুম ড্রেসিং-রুম প্রভৃতি সাজান হইয়াছে : ড্রেসিং-রুমে সেইরূপ চারিদিকে নানা রকমের সুদৃশ্য আসবাব এবং তাহার উপরে রাশি রাশি, এসেন্স, শ্যাম্পেন, ক্রিম প্রভৃতি বিলাস-দ্রব্য থরে, থরে সজ্জিত শরৎচন্দ্রের সেই উৎকট বিলাসিতা, কৃত্রিম-রূপের ভ্রূ একাগ্র সাধনা মাই পূর্ববৎ বজায় আছে।

আগেকার মতন সেই রকম ভাবে অঙ্গরাগ ও প্রসাধন কার্য শেষ করিয়া শরৎচন্দ্র ছড়ি ঘুরাইতে, ঘুরাইতে বাটি হইতে বাহির হইয়া গেল। কিয়ৎদূর গমন করিয়া একটি দ্বিতল-বাটির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। এই বাটির দ্বিতলস্থ জানালার ধারে একটি সুন্দরী যুবতী দাঁড়াইয়াছিল এবং একমনে একখানি উপন্যাস পড়িতেছিল। শরৎচন্দ্র উপর দিকে চাহিয়া খুব জোরে গলা খাঁকরানী দিয়া বার দুই কাসিল। তাহার কাসির শব্দে আকৃষ্ট হইয়া যুবতীটি মুখ তুলিয়া চাহিয়া শরতকে দেখিতে পাইয়া—“ওমাঃ সেই লোকটা”—এই কথা অক্ষুটস্বরে বলিয়া একটু হাসিয়া ফেলিল। শরৎচন্দ্র আহ্লাদে আটখানা হইয়া একরূপ ভাবে মুখ-

ভুল-ভাগ্য

ভগ্নী ও দস্ত বিক্রয় করিয়া হাসিল যে, তাহা দেখিয়া যুবতীটি মুখে কাপড় চাপা দিয়া হাসিতে, হাসিতে বসিয়া পড়িল।

আগেকার ব্যাপারটা এই, যে:—এই সুন্দরী যুবতীটি প্রতিদিন বৈকালে এই জানালাটির ধারে দাঁড়াইয়া হাওয়া খাইতে, খাইতে উপভাস পড়ে। যুবতীটি এই সময় জানালায় দাঁড়াইয়া কেবল যে হাওয়া খায় তা নয়, সঙ্গে, সঙ্গে পান-জরদা খায় এবং উপভাস পড়িতে, পড়িতে বহুশ্রম সাগরে ভাসমান হইয়া অন্তমনস্ক ভাবে মধো, মধো যখন পথচারী পথিকের মাথায় পানের পিক্ ক্যালে তখন গালাগালি খায়। “জীলোকের ক্ষুধা অধিক”—এই প্রবাদ বাক্যটি বোধ হয় বড় ঠিক। কারণ এত খাইয়াও এই যুবতীটির পেট ভরে না তাই উপভাস পড়িতে, পড়িতে মধো; মধো মাথা তুলিয়া আড়নম্বনে কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া নিরীহ পথিক ব্যাচারীর মাথাও খায়।

শরৎচন্দ্র নূতন বাটিতে উঠিয়া আসিয়া প্রথম যেদিন রাস্তায় বাতির হয় যেদিন এই যুবতীটিকে এই জানালায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার পানে চাহিতে, চাহিতে পথ চলিতে থাকে। শরৎচন্দ্রকে এই রূপ ভাবে চাহিতে দেখিয়া, স্বাভাবিক কোতূহল বশে যুবতীটিও শরতের দিকে চাহিয়া দেখে। তৎপরে শরৎচন্দ্র যখন যুবতীটির জানালার নীচে আসিয়া পড়ে তখন তাহার সেই ‘ঘনভাবে পাউডার মাথা মুখ’ ও রমণী সুলভ সিন্ধুকটা ও অঙ্গরাগাদির ব্যাপার দেখিয়া যুবতীটির বড়ই হাসি পায়। তাহার চক্ষে এই সম্পূর্ণ নূতন ও বিপরীত ব্যাপারের দৃশ্য দেখিয়া যুবতীটি মুখ মুচকাইয়া হাসিতে থাকে। তারপর শরৎচন্দ্র প্রতিদিন যখনই এইস্থান দিয়া যাইত, তাহার রকম-নকম দেখিয়া যুবতীটি তখনই

হাসিত। যুবতীটির স্বাভাবিক চঞ্চল নয়ন ও এইরূপ ভাবের হাস্য দেখিয়া শরৎচন্দ্র মনে করিত যে, তাহার রূপ দেখিয়া যুবতীটি মজিয়াছে তাই এইরূপ ভাবে নজর। মারিয়া ও হাসিয়া প্রেম জ্ঞাপন করিতেছে। শরৎচন্দ্র এইরূপ মনে করিলেও কিন্তু প্রথমটায় একেবারে চুপ করিয়া গেল। শরৎচন্দ্র মনে, মনে ভাবিল যে—“এ মেয়েমানুষটার ভাব-ভঙ্গী দেখে বোধ হয় যে, আমার রূপে মোহিত হয়েছে। কিন্তু একে ফট করে আমোল দোঁরা হবেনা। আগে তিনদিন ওকে পরীক্ষা ক'রব তারপর আমোল দোঁব। এই তিন দিন ধরে আমি, ওকে উপেক্ষা করে যাব তবুও যদি ওর এই ভাব বজায় থাকে তাহলে ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হবে। আচ্ছা এত পরীক্ষারই বা দরকার কি। ওর ভাব দেখেত' স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, আমার চেহারা দেখে মোহিত হ'য়ে প্রেমে পড়ে গেছে। কাজেই পরীক্ষার আর দরকার নেই। তার ওর আরও এক কথা এই যে, মেয়েমানুষটা যদি আমার প্রেমে পড়ে থাকে তাহলে পরীক্ষার হিসেবে এই তিনদিন আমি যখন ওকে উপেক্ষা ক'রে যাব তখন ব্যাচারী মনে বড়ই কষ্ট পাবে। তা পাকগে, পরীক্ষা না ক'রে কোনও কাজ করা হবেনা। হৃদয় পাষাণে বেঁধে এ তিনদিন ওকে পরীক্ষা ক'রতেই হবে। যদিই এজন্যে ব্যাচারীর মনে কষ্ট হয় তাবলে মাত্র তিনদিনের মধ্যে কিছু মারা যাবে না।”

এইরূপ চিন্তা মনোমধ্যে উদ্ভিত হইয়া ছল বলিয়াই শরৎচন্দ্র তখনকার মতন নীরব ছিল। তারপর তিনদিন যাবৎ এই যুবতীটির সম্মুখ দিয়া শরৎচন্দ্র আনাগোনা করিতে লাগিল। “যুবতীটি তাহাকে চায় অথচ সে যুবতীটাকে চায়না,”—এইরূপ ভাব দেখাইয়া, গর্বজরে হেঁটীতে

ভুল ভাঙ্গা

হাসিতে শরৎচন্দ্র রাস্তা দিয়া যায় আর তাহার ঐ ভাব দেখিয়া যুবতীটি হাসিতে থাকে। তিনদিনের দিন যুবতীর সম্মুখ দিয়া চলিয়া শরৎ নিজের বাট কিরিতেছিল এবং মনে, মনে খলিতেছিল যে—“হ্যাঁ। যথার্থই প্রেম বটে। এই তিনদিন বেশ কঠোর ভাবে পরীক্ষা ক’রে দেখেছি, দেখে বুঝেছি যে, মেয়েমানুষটা যথার্থই আমার প্রেমে পড়েছে। এ তিনদিনে প্রেম কমে যাওয়া দূরে থাক উত্তরোত্তর বেড়েছে। আর ওকে নিরাশ করা উচিত নয়। কালই ওর প্রেম তৃষ্ণা মেটাবো। কিন্তু ভবিষ্যতের জন্তে আমার বিশেষ করে সাবধান হ’তে হবে। আর এ রকম ক’বে যখন-তখন রাস্তায় বেরোবনা। যে-ই আমাকে দেখবে সে-ই যদি আমার ওপর মজা যায় তা হ’লেত আমার সামান্য দোয়া দায় হবে। হয়ত পটু ক’রে মরেই যাব। নাঃ, এ রকম ক’রে আর দিনের আলোতে রাস্তায় বেরোবনা। যদিই বেরোই তাহলে ক’লকাতার যেমন সদা-সর্বদা গাড়ী করে বেরতুম তেমনি বেরোবো।”

এইত গেল পূর্বকথা। তার পর চতুর্থ দিন অপরাহ্নে শরৎচন্দ্র খুব সাজ-গোজ করিয়া যুবতীর জানালার নীচে আসিয়া দাঁড়াইয়া গলা খাঁকরানী দিল এবং যুবতীর হাতের পর সে একরূপ ভাবে মুখ ও অঙ্গভঙ্গী করিল যে তাহাতে যুবতীটি মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে, হাসিতে জানালার ভিতর দিকে বসিয়া পড়িল—এই কথা অবধি মনে আছেত ?

যুবতীকে ঐভাবে বসিয়া পড়িতে দেখিয়া ঘরের ভিতর যে লোকদুইটি বসিয়াছিল তাহাদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি—একরূপ উচ্চ-হাতের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে, যুবতী বলিল—“দ্যাখ সেই যে একটা লোকের কথা

ভুল-ভাঙ্গা

তোমার বলেছিলুম সেই লোকটা আজ জানালার নীচে এসে দাঁড়িয়েছে আর আমার দিকে চেয়ে হাসছে আর চোখ-মারছে।”

এই লোক দুইটির মধ্যে প্রথম লোকটি এই বাড়ির মালিক। লোকটি মাডোয়ারের অধিবাসী। কোনও অজ্ঞাত কারণে দেশ ছাড়িয়া এই কাশীতে কয়েক বৎসর যাবৎ বাস করিতেছে। এই যুবতীটিকে কোনও স্থান হইতে কুসংস্কারের অন্ধকার হইতে আলোকে আনিয়াছে এবং উভয়ে স্বামী স্বরূপে মতন দেশ ভ্রমভাবে বাস করিতেছে। ইহাদের কেহা তরঙ্গ চাল-চলন সকলের মনে একটা নিঃসন্দেহের ভাব আনিয়া দিয়াছে সেইজন্য ইহাদের পূর্ব-পরিচয়ের জন্য কেহ বাস্তব নয়। লোকটা বেশ ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষা জানে, এবং নানা প্রকার কার্যের দালালী করে ও সময় অসময়ে জাল-জুয়াচুরী করিয়া বেশ দু’পয়সার সংস্থান করিয়াছে। দ্বিতীয় লোকটি তাহার বন্ধু কাশীতে অধিবাসী এবং তাহার অনেক কার্যের সহায়ক। প্রথম লোকটিকে আমরা অতঃপর ‘গৃহস্বামী’ বলিয়া অভিহিত করিব।

এই ঘরের মধ্যস্থলে একখানি সুসজ্জিত পালঙ্ক আছে। সেই পালঙ্কের উপর বসিয়া গৃহস্বামী বন্ধুর সজ্জিত জুয়া খেলিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে মদ্যপান করিতেছে। যুবতীর কণায় দ্বিতীয় লোকটি বলিল—
“যেতে দাও, যেতে দাও, গোলমাল ক’রনা।

গৃহস্বামী বাধা দিয়া বলিল—“নাঃ নাঃ দাঁড়াও, দেখি লোকটা কে ? এই কথা বলিয়া গুড়ি মারিয়া জানালার নীচের দিকে ঘাইয়া, একটি খড়খড়ি একটু মাত্র তুলিয়া শরৎকে দেখিল। তৎপরে সরিয়া আসিয়া যুবতীকে বলিল—“আখ, তুমি ঐ লোকটাকে ডাক—তারপর ওকে বেশ ক’রে প্রেম জানাও। আমরা এখান থেকে চলে যাই।”

ভুল-ভাগা

যুবতী বলিল—“না, না ওসব হবে না। আমার কি সেই রকম পেলে নাকি ? এতদিনেও কি আমার বিশ্বাস হ'ল না ? আর তুমিও কি শেষে ভেড়ুয়া হবে নাকি ?

গৃহস্থানী বলিল—“ওরে রেখে দে তোর ওসব কথা। যা বলি শোন।” এই বলিয়া যুবতীর কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া, তাড়াতাড়ি করিয়া কি কথা বলিয়া তৎপরে প্রকাশ্যে ব'লিল—“বুঝি ? এতে বেশ মোটা টাকা রোজগার হবে। লোকটাকে দেখে খুব বড়লোকের ছেলে ব'লে বোধ হচ্ছে। আর বাবু তুইতো কিছু সতীলক্ষী নোসরে। এ বয়সে অনেক কাণ্ড তো করেচিস। এ পাড়ার লোকেরা না হয় তোকে, আমার শিক্ষিতা-মাগ বলে জানে। কিন্তু তুই যা তাতে আমি জানি আর তুইও জানিস।” এই কথা বলিয়া সে মদের দোতল, গেলাস, তাস, খুচরা টাকা-কড়ি প্রভৃতি লইয়া সবকু পার্শ্বের ঘরে চ'লিয়া গেল।

যুবতীটি তখন পালঙ্কের উপরিস্থিত বিছানাটি হাক দিয়া একটু ঝাড়িয়া ফেলিল এবং অঙ্গ হইতে জামাটি খুলিয়া ফেলিয়া জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল।

শরৎচন্দ্র এতক্ষণ এ'দিক ও'দিক পায়চারী করিয়া ছুই একবার কামিল তারপর খুব জোরে একবার শিশু দিয়া ক্ষণপরে আবার সেই শিশু দিতে বাইবে সেই সময়ে যুবতীটি জানালার আসন দেখিয়া—আনন্দে বহুশ পাটি দস্ত বাহির করিয়া ফেলিল। যুবতীটি চঞ্চল নয়নে, বিদ্যুৎ চমকের মতন একটি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া একটু মুচকি-হাসি হাসিল। তারপর হাত নাড়িয়া, শরৎকে ডাকিল।

শরৎ বলিল—“আমার, আমার ডাকছ নাকি ? কি দরকার তোমার।”

ভুল-ভাগা

আবার, আবার সেই মধুর হাসিমা যুবতী বলিল—“কেন ? কেন তাকি বুঝতে পারছনা নিষ্ঠুর । কদিন ধ’রে আমার মন কেড়ে নিয়ে নিষ্ঠুরের মতন পালিয়ে, পালিয়ে বেড়াচ্ছ । আজ যদিও বা দয়া করে দেখা দিলে তবুও ছলনা ক’রে আমার মন অবলা ললনাকে কষ্ট দিচ্ছ প্রাণনাথ ।”

শরৎচন্দ্র মনে মনে বলিল—“ওরে কোথায় গাড়ী, ঘোড়া, মটরকার, দমকল আছিদ, শাগ্’গর এসে আমার চাপা দেবে—আমি এই স্নেহের সাগরে ভাসতে ভাসতে মরি । ওহো বলে কি ? “প্রাণনাথ” “প্রাণনাথ” । ওহে একি শুনিরে ।”

যুবতী বলিল—“কি ভাবছেন ? আমার ওপর কি আপনার ঘৃণা হচ্ছে নাকি ?”

চির প্ৰত্যাশিত, জীবনের মহাকাম্য মধুময় কথাগুলি আজ জীবনে এই প্রথম শুনিয়া শরৎচন্দ্র হৃথ-সাগরের প্রবল তরঙ্গে নাকানী-চোদানী খাইয়া প্রায় আহুজ্ঞানশূন্য হইয়াছিল । এক্ষণে যুবতীর কথায় তাহার সাড়্ হইল, সে বলিল—“কি, কি বলছ স্নেহরো ?”

যুবতী আবার একটি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিল—“বলছি যে আমায় লজ্জাহীনা ব’লে, আপনার ঘৃণা হচ্ছে নাকি ?”

শরৎচন্দ্র বলিল—“ঘৃণা ? তোমাকে ঘৃণা ? তুমি কি আমার প্রাণন সেকলে, অসভ্য বাপ মা-না-গুরুঠাকুর যে তোমায় ঘৃণা ক’রবে । তুমি আমার নরনের মণি, সোণার খনি, আঁধার রাতের চাঁদ, হস্তর নদীর বাধ, প্রেম-পাখীর ফাঁদ ; আমার ঘরের লক্ষী, দাঁড়ের পক্ষী, পাহারায় রক্ষী, খাবারে সোনার খালা, খরচে টাকার ছালা, তেঁটায় কলের

ভুল-ভাগ্য

জালা, আত্মীয়ে, বড়-কুটুম-শালা, আর—আর যুগল মিলনে বদলের মালা ।”

যুবতী বলিল—“আমি অবলা, সরলা, কুলবালা—আপনার অন্ত বড় নোনার কবিত্বের ঠালা। আমি সহ্য ক’রতে পারব না। এর চেয়ে আপনার বিরহ আমি আর সহ্য ক’রতে পারছি না। আহুন প্রেমিকবর আহুন ।”

শরৎচন্দ্র বলিল—“ভাই সুনন্দী, বাড়ীর ভেতর গিয়ে কাজ নেই। আমি বরং একথানা গাড়ী ডেকে আনি; চল দেশ ক্ষুণ্ণ ক’রতে ক’রতে বেড়িয়ে আসা থাক ।”

যুবতী বলিল—“আবার সেই নিষ্ঠুরতা? না আপনি বাড়ীতে আহুন। এখানে কেউ নেই; দুঃখিনী, চির-দুঃখিনী। আমি একলাই রয়েছি। আমার এক বৃদ্ধ স্বামী আছে—সহরের ভেতর তার দোকান। সে সেই রাত দশটারপর এখানে আসবে ।”

শরৎচন্দ্র মনের আনন্দে তাহার সেই কোদালে-দন্ত বিকাশ করিয়া বলিল—“বৃদ্ধস্বামী? স্বামী বৃদ্ধস্বামী? তা এতক্ষণ বলনি কেন? এস. এস. প্রিয়ে তুমি নেমে এস, আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি ।”

যুবতাঁটি নীচে নামিয়া আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল, শরৎ ভিতরে ঢুকিল। যুবতীটির পিছু পিছু শরৎচন্দ্র উপরের সেই ঘরে বাইল। ঘরে ঢুকিয়াই, ঘরের মধ্যস্থলস্থিত পালঙ্কের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া যুবতী, শরৎকে বলিল—“আপনি এই পালঙ্কের ওপর উপবেশন করুন ।”

শরৎচন্দ্রের প্রাণে আজ ক্ষুণ্ণির সপ্ত-সমুদ্র প্রবাহিত হইতেছে, ডাবের লহর খেলিতেছে। যুবতীটি যেই তাহাকে বলিল যে—“আপনি

তুল-ভাঙ্গা

এই পালঙ্কের ওপর উপবেশন করুন—শরৎচন্দ্র অস্বাভাবিক ভাবে গদগদ হইয়া, আত্মাভাবিত ভাবে উগমগ হইয়া, ফিলিংয়ের চোটে কড়কড় করিয়া বলিল—“না আমি তোমার দেখব, এইখান থেকে দেখব—

ভেবে দ্বিধা মন কত তোরে নাচায় নরন ।

ছিলি উপেক্ষিত সামান্য এক নাবালিকা পাশে

এবে হ'ল দাসী স'বালিকা এ সুন্দরী রূপসী ।

• গত সেই দিনে অধৈর্য প্রাণে কার পরিণয় প্রস্তাব

পেরেছিলি যেই অত্যাচাব,

তার পুরস্কার—এ সুন্দরী আজ দাসী হে তোমার ।

ভান মন কত বন্ধু তোমার নরন ।

তোমারে ইহায়ে—মাথায় যখন

নাড়া চক্ষু হ'তে শীঘ্র লইয়া অগ্নন ।”

যুবতী বলিল—“খুব হয়েছে, খুব হয়েছে । এখন আসুন, এসে বসুন ।”

শরৎচন্দ্র বলিল—“দাঁড়াও, আরও একটু কাণ্ড আছে শোন, এইদিকে শোন—দুখ আমি তোমার অলঙ্কার থেকে দুটো কাঁটা চাইনা বটে কিন্তু তোমার ঐ পদ্মপলংশ, রত্নবিলাস, মদনের পাশ তুল্য নয়ন হতে একটু কাজল আমার দাঁও । দাঁও, দাঁও ।” যুবতী চক্ষু হইতে একটু কাজল বাহির করিয়া শরতের হাতে দিলে পর শরৎ, তাহার মুখের কাছে হাত নাড়িতে, নাড়িতে বলিল—“যাও প্রিয়ে, তোমার স্বামীকে বলগে যাও যে, তাঁর একটি উপযুক্ত জুড়ীদার জুটেছে ।” এই কথা বলিয়া যুবতীর চক্ষু হইতে গৃহীত কাজল মাথা অঙ্গুলি দুইটি উর্ধ্বে তুলিয়া, ভাবাবেগে বলিল—

ভুল-ভাগী

‘মন’ এখনও আঁধারে অনাদর কর ?

বন্ধু তোর—শীঘ্র কর মাথায়ের রঞ্জন

নারী চক্ষু হ’তে তুই পেলি যে অঞ্জন ।

নহে খঞ্জন-গঞ্জন তোর এ দুটি নয়ন

পক্ষ বিস্তারি কবে করিবেরে পলায়ন ।

(অঙ্গুণীস্থ কাজল চক্ষে লাগাইয়া)

অঞ্জন (ওহোঃ) অঞ্জন পর যুগল নয়ন

চল ঠোট অধর সূদা করিতে গ্রহণ ।

এই সকল বলিবার পরই শরৎচন্দ্র দুই চক্ষে অঙ্গুণী দিয়া, ঘন ঘন ওষ্ঠাধর নাড়িতে লাগিল এবং চুমকুড়ী দিতে লাগিল ।

শরৎচন্দ্রের এই রকম ব্যাপারে যুবতীটি মনে মনে বড়ই আশোদ পাইল । সে হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল । তৎপরে শরতের হাত ধরিয়া টানিয়া পালঙ্কের উপর বসাইল এবং নিজেও তাহার পার্শ্বে বসিল । যুবতীটি গা ঘেসিয়া বসাতে, শরৎচন্দ্র আনন্দের চোটে বাসিয়া-বসিয়াই নৃত্য করিয়া উঠিল । দুইজনে পাশপাশি বসিয়া অলঙ্কণ আরব রহিল । ‘প্রথমে কি কথা বলা উচিত’—শরৎচন্দ্র তাহাই ভাবিতেছে এমন সময়ে যুবতীটি শরতের বুকের ওপর ঝাঁপাইয়া পড়িল । যুবতীটি হঠাৎ তাহার বুকের ওপর ঝাঁপাইয়া পড়াতে শরৎচন্দ্র ওক্ করিয়া উঠিল এবং “ওরে বাবা বড্ড লেগেছেরে” এই কথা বলিতে না বলিতেই, যুবতীটি তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া মুখের কাছে মুখ আনিয়া বলিল— “আগেকের আমায় চিরদিন মনে থাকবেত, না এই একদিনের দেখাতেই শেষ ।”

যুবতীর উষ্ণ নিশ্বাসে শরতের মুখমণ্ডল ঝলসাইয়া বাইবার মতন হইল। শরতের সমস্ত অঙ্গ ঘামিয়া উঠিল, তাহার কাণের ভিতর ভেঁ, ভেঁ করিয়া জাহাজের বাঁশী বাজিয়া উঠিল। শরৎচন্দ্র এখন যে কি করিবে তাহা ভাবিয়া পাইল না কিন্তু জাহাজ হাত দুইটি আপনা হইতেই যুবতীর অঙ্গে জড়াইয়া গেল এবং লোহা যেমন সজোরে চুষকের উপর ঝাটয়া পড়ে—তাহার ওষ্ঠাধর তেমনি ভাবে যুবতার ওষ্ঠাধরে ঝাইয়া সংলগ্ন হইল। ইহার পর উজ্জল মধুরে মিশ্রণ— অর্থাৎ শরতের চুষনের বিনিময়ে যুবতীটি, শরতকে আরও জোরে জড়াইয়া ধরিয়া দুই তিনটি চুষন দিল। শরৎ স্বর্গ-সুখ অনুভব করিতে লাগিল, তাহার বোধ হইতে লাগিল যে, সে যেন স্বর্গে যাইতেছে। তাই সে চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—“ওরে কে আছিস? আমি ভে স্বর্গে চললুম—তোরা কেউ হস্তিচরণ আর মাধবকে বলিস যে, আমার চামড়ার-বাক্সর ভেতর সাত হাজার টাকা আছে, তার ভেতর ছ’হাজার টাকা যেন তারা নেয় আর—।” ঠাকীটুকু আরও বলা হইল না। কারণ যুবতীটি তাকে এই সময় আবার দুই, চারিটি চুষন দিল। ইহাতে শরতের মুখের কথা বন্ধ হইয়া গেলই, উপরন্তু সে আর চোখে দেখিতে পাইল না এবং তাহার নিশ্বাস খুব জোরে ও ঘন ঘন পড়িতে লাগিল; দেখিয়া বোধ হয় যেন তাহার নাভিখাদ ঊপস্থিত হইয়াছে। তারপর—যুবতীটির চুষনের বিনিময়ে খুদ গাঢ় দুই, তিনটি চুষন দিয়া শরৎচন্দ্র পুনরায় বেষ্ট তাহাকে চুষন করিতে বাইবে অমনি পশ্চাৎ হইতে বজ্রগম্ভীর স্বরে কে হাঁকিল—“সামাল ব্যাটা, সামাল।”

ভুল-ভাঙ্গা

এই বজ্রগন্তীর স্বরে শরৎচন্দ্র চমকিয়া উঠিয়া পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখে যে—একটি বলিষ্ঠ লোক একখানি উন্মুক্ত ছোরা হাতে প্রবেশ করিয়াছে এবং ধীরে ধীরে তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। এই দৃশ্যে মহাভীত হইয়া শরৎচন্দ্র কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া পিছন দিকে সাত হাত সরিয়া গেল। এই আগন্তুক যে গৃহস্বামী তাহা বোধ হয় আর বলিতে হইবে না। শরৎকে পিছাইয়া যাইতে দেখিয়া গৃহস্বামী ছোরাখানি কোমরে ঝুঁজিয়া রাখিয়া, দুই হাত বুকের ওপর তুলিয়া, কটমট করে শরতের দিকে চাহিয়া রহিল। শরৎচন্দ্র প্রাণপণে ভীত ভাবকে চাপিয়া কৃত্রিম রোথ দেখাইয়া বলিল—“এই কে তুই, এখানে এসে গোলমাল করচিস ? বেরো ব্যাটা এখুনি—”

গৃহস্বামী দর্শন স্বরে বলিল—“চুপ ক’রে ওইখানে দাঁড়িয়ে থাক। যদি এক পং এগোবি তো মজা দেখতে পাবি।”

শরৎচন্দ্র পুরোপেক্ষা অধিক রোথ দেখাইয়া বলিল—“না দাঁড়াব না, তুই কি করবি ?”

কোমর হইতে ছোরাখানি চকিতে বাহির করিয়া গৃহস্বামী বলিল—“যদি ভাল চাসতো সরে গিয়ে দাঁড়া; নইলে এই ছোরা তোমার বুকে মারবে।”

শরৎচন্দ্র পাঁচ হাত পিছাইয়া গিয়া বলিল—“তাইতঃ এত’ বড় মুন্সিলে পড়া-গেল দেখি।”

গৃহস্বামী বলিল—“এই তুই আমার ঘরে অনধিকার প্রবেশ করেছিস আর আমার স্ত্রীর ইজ্জৎ নষ্ট ক’রেচিস, তোকে সহজে ছাড়ব ?”

শরৎ বলিল—“এই মেয়েমানুষটি তোমার স্ত্রী ? স্যাঁ ? তা তাই ওসমান

আমার কোন দোষ নেই—আমার রূপে মোহিত হ'য়ে আমাকে ডেকে এনেছে ? বিশ্বাস না কর, ওই আয়েষা বেটিকেই জিজ্ঞেস ক'রে দেখ ।”

গৃহস্থামী বলিল—“চোপরাও ব্যাটা মিথ্যাবাদী । তোর এই কদাকার চেহারা, তোর এই বাদরের মতন মুখ, তাই দেখে আমার গী মোহিত হয়েছেরে ব্যাটা ?

শরৎ বিশেষ বকম দমিরা গেল । তবুও আন্তর-সাহস অবলম্বন করিয়া বলিল—“আমার কথা বিশ্বাস না করবি ত'হা আমার ব'য়ে গেল । আমার পাড়ার লোকেও সবাই জানে যে, আমি জীবনে কখনও মিথ্যে কথা বলিনা—বুঝি ? এ কথাও যদি বিশ্বাস না কর'ত' ক'লকাতায় কখনও যদি আসত', আমার পাড়ায় গিয়ে তাদের জিজ্ঞেস করিস—তাহলে তখন আমার কথা বুঝতে পারবি । এখন মর্—ম'রে দাড়া—আমি চ'লে যাই !”

গৃহস্থামী রোষভরে বলিল—“তোকে চলে যেতে দোব কিরে ব্যাটা—তুই এখন আমার বন্দী ।”

শরৎচন্দ্র বিরক্তিভরে সুবতীকে সম্বোধন করিয়া বলিল—“ও মেয়েমানুষ, ও 'ডেকে-আনা-প্রিয়ে' টপ্ ক'রে বলে ফেল যে, 'এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর'—এই কাটখোঁট্টা, বেরসিক ওসমান ব্যাটা ঠাণ্ড হোক; আমার ছেড়ে দিক ।”

গৃহস্থামী টপ্ করিয়া শরতের হাতটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল—“ওসব বকুবকানি থামা । মরবার জন্তে তৈরী হয়ে নে ।”

শরৎচন্দ্র বলিল—“কেন মরবার জন্তে তৈরী হব আমার অপরাধটা কি ?”

ডুল-ভাঁজ

গৃহস্বামী বলিল—‘তুই, আমার জীকে’ বেইজ্ঞ করচিস, তাকে আমি খুন ক’রব।

শরৎচন্দ্র বিহ্বলিত হয়ে বলিল—‘আবার সেই কথা? তুমিত’ বড় চাষা আর মুখু’লোক হে। এটী না বললুম যে, আমার কোনও দোষ নেই—তোমার জী, আমার রূপে মোহিত হ’য়ে ভালবাসা জানিয়ে, কত সোহাগ দেখিয়ে আমাকে ডেকে এনেছে।’

শরতের কথা শেষ হইতে না হইতে যুবতীটি চিৎকার করিয়া বলিল—‘নাগোনা, ওর সব মিথ্যা কথা। আমি ঘরে চুপ ক’রে বসেছিলুম; এমন সময় ও লোকটা হঠাৎ ঘরে ঢুকে আমার জোরে ক’রে জড়িয়ে ধরে ক্রমাগত চুমু খেতে আরম্ভ ক’রে দিলে। আমি প্রাণপণে ছাড়াবার চেষ্টা করছিলুম, কিন্তু ওর জোরে পারছিলুম না। তারপর তোমরা এসে পড়লে, আমার প্রাণটা বাঁচল। তোমাদের আসতে যদি আর একটু দেরী হ’ত তাহলে আমি নারী-স্বাভাবিক লজ্জায় নিশ্চয়ই মারা যেতুম!’

শরৎচন্দ্র চিৎকার করিয়া বলিল—‘ওরবার মেয়েমানুষ খারদার; ও রকম ভাবে মিথ্যা কথা বলন!। মহাপাপ হবে, নরকে যেতে হবে, যমদূতরা সব জগন্মুখ শাড়াসী দিয়ে তোমার জিভ টেনে বার ক’বে—বুঝলে? যদি ভাল চাও ত সত্যি কথা এখনও বল। তাহলে যমদূতরা অনেকটা ঠাণ্ডা হ’য়ে যাবে। বল, তুমি আমার রূপে মোহিত হওনি, আমার প্রেমে পড়নি? এখন স্বামীকে দেখে কথা ঘুরিয়ে নিলে চ’লবেনা।’

এইবার স্বরূপ-মূর্ত্তী ধরিয়া যুবতী বলিল—‘ওরে ও বোকা-মিনসে তুই বলিস কি? তোর এই কুৎসিত চেহারা দেখে কখনও কোনও অতি-

কুৎসিত মেয়েমানুষ মোহিত হয়না—আর আমি হব ?' কালো রঙের ওপর পাউডার মাখলে কি মেয়েমানুষ মোহিত হয় ? ঐ রকম ভাবে পাতা কেটে টেরী কাটলে কি মেয়েমানুষ প্রেম পড়ে ? ওই রকম ভাবে লম্বা কোঁচা ছলিয়ে, একগাদা পোষাক প'রে আড়ষ্টকাট, জড়ভরত, নড়ন-চড়ন-রুহিত হ'য়ে বেড়ালে কি মেয়েমানুষের মন কেড়ে নেয়া যায় ? তুই কি তাই মনে করিস নাকি ? মেয়েমানুষের মন কি এতই মস্তা ? তোর ঐ পাউডার মাথা মুখ দেখলে আমার মনে হয় যে, যেন তোর কুটু হয়েছে তাই তোর কালো মুখের ওপর ওই রকম সাদা কুটে বেরিয়েছে। তোকে দেখলেই অ'ম্মার এই জন্তো হাসি পেত' আর তুই মিন্সে মনে করতিস যে, তোর ঐ অপক্লপ দিক্‌বিকিমাকার রূপে আমি মোহিত হয়েছি।"

শরৎচন্দ্র অবাক হইয়া বলিল—“হ্যাঁ।।”

গুব্বী বলিল—“হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি যা বললুম তাই ঠিক জানবি। যদি কখনও কোনও মেয়েমানুষ তোকে জানায় যে—‘তোরা প্রেম পড়েচে বা তোর রূপে মোহিত হয়েছে’—তাহলে জানবি যে, হয় সে তোকে ঠাট্টা ক'রচে না হয় তার কোনও মতলব আছে। এটা ঠিক মনে জানবি যে, তোর এই চেহারায় তার ঘরের মাগ্‌ছাড়া আর কেউ তোকে ভাল-বাসবেনা।”

শরৎচন্দ্র বলিল—“খুব হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে। এইবার আমার যেতে দাও।”

গৃহস্বামী বলি—“তুই আমার জীকে’ বেইজ্ঞ ক'রেচিস; আমার প্রাণে আশ্রয় জগছে, অপমানে আমার মাথা হেঁট হয়েছে—তোকে কখন

তুল-ভাঙ্গা

ছাড়ব না। তোমার জীবন উপর যদি কেউ এ রকম ভাবে অত্যাচার আর অপমান ক'রত তাহলে তোমার বুকের ভিতরটা কি রকম জ্বলত ? তুই তাহলে তাকে কি ক'রতিস ?

শরৎ বলিল—“আমার জ্ঞান নেই। যদি আমার জ্ঞান থাকতো তাহলে তোমায়, তাকে চুমু খেতে দিতুম। আমার জ্ঞানকে যত ইচ্ছে চুমু খেয়ে তোমার অপমানের প্রতিশোধ নিতে। কিন্তু কি ক'রব বল, তোমার কপালে নেই; আমি বিয়ে করিনি।”

গৃহস্থানী ক্রোধভরে বলিল—“এই রকম ক'রে পরজীবীর ঈর্জ্য নষ্ট ক'রে বেড়াবি ব'লে বুঝি তুই বিয়ে করিসনি। ওঃ তুই ব্যাটা বহা পাজী তোকে কখনও ছাড়ব না। নে ব্যাটা ভগবানকে ডেকে নে, আজ জোর শেষ দিন।” এই বলিয়া সে সবলে শরতের গলা টিপিয়া ভূমিতে টিং করিয়া ফেলিয়া তাহার বুকের উপর উঠিয়া বসিল। তৎপরে পার্শ্ব-বস্ত্রী ঘর হটতে—তাহার আহ্বানে—তাহার সেই বন্ধুটি, একটি থলিয়া ও এক গাছ দড়ি লইয়া আসিল। উভয়ে মিলিয়া শরৎকে, সেই মোটা দড়ি দিয়া পিঠমোড়া করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। গৃহস্থানী ছোরাখানি উল্টে তুলিয়া ধরিয়া বলিল—“যারা পরের গুখ, দুঃখ বোঝেনা, যারা পরজীবীর উপর অন্যায় লোভ করে, যারা পরজীবীর সঙ্গে প্রেম ক'রে লোকের বুকের ভিতর আগুন জ্বালে, তাদের বুকে এই রকম জ্বালা ছোরা মারতে হয়।” এই বলিয়া শরতের বুক ফাটাইয়া ছোরা মারিতে গেল। শরৎ ভয়ে আত্মনাদ করিয়া উঠিল এবং অতীব কাতরস্বরে বলিল—“দোহাই বাবা আমার ছেড়ে দাও। এ ছুঁচো মেরে হাত গর ক'রনা। আমার মেরে তোমার কোনও লাভ হবে না।

তোমার পায়ে পড়ি আমায় বাঁচাও, আমি তোমায় অনেক টাকা দোব।” শরৎচন্দ্র কাঁদিতে লাগিল।

গৃহস্থামীর বন্ধু বলিল—“কর্তা-মশাই লোকটাকে না হয় এবারকার মতন ছেড়ে দিন আর আপনার অপমানের খেসারত হিসেবে কিছু টাকা না হয় নিন। লোকটা বখন অত অহুনয়-বিনয় ক’রছে আর টাকা দিতে চাচ্ছে তখন ওর ওপর দয়া করুন। আর দেখুন অনর্থক কেন নরহত্যার পাপ করছেন? আপনি পুণ্যাত্মা লোক।”

শরৎচন্দ্র পূর্ববৎ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—“দেহাই বাবা, তোমার পায়ে ধরি, আমায় ছেড়ে দাও। আমি এমন কাজ আর কখনও ক’রব না। আর তোমায় নগদ এক হাজার টাকা দোব।”

গৃহস্থামীর বন্ধু কৃত্রিম মহা-রোষভরে বলিল—“ওরে ব্যাটা ড্যাম, রাসকেল, বাগার, ফুল, কুংসিং, কদাকার, চক্ষুশূল—ওরে ব্যাটা ইঁদুর, ছুঁচো, বদমাস, মুরগী, মটন, পাতীহাঁস—ওরে ব্যাটা গাধার ক্ষুর, ছাগলের নূর, মাছের আঁশ, ধুলো, ময়লা, মরামাস—ওরে ব্যাটা-উল্লুনের পাঁশ, ঘুনধরা-বাঁশ, দাসাভুদাস এখনই ঠাস্ ক’রে এমন একটি চড় মারুব যে ছবার এপাশ-ওপাশ ক’রে, খাস-প্রখাস আটকে হাঁস-ফাঁস ক’রতে ক’রতে মারা যাবি। তোর এত বড় বুকের পুটা যে, আমাদের মহামান্যের কর্তামশায়ের মানের দাম মোটে হাজার টাকা দিতে চাইচিস। কানী সহরে কর্তামশায়ের মান কত জানিস। কর্তামশাই তোকে যদি প্রকাশ্য পথের ওপর দাঁড়িয়ে কেটে ফেলে তবুও তঁর কিছু হবেনা জানিস।”

শরৎচন্দ্র অনেক অহুনয়, বিনয়, কান্নাকাটি করার পর গৃহস্থামীর

কুল-ভাঙ্গা

সহিত এই বন্দবস্ত করিল যে, তাহার সঙ্গে যে বহুমূল্য হীরক-অঙ্গুরী ও ঘড়ি চেন আছে তাহা দিবে এবং দশ হাজার টাকার একখানি স্বাক্ষরনোট লিখিয়া দিবে।

এইরূপ বন্দবস্ত ঠিক হইবার পর গৃহস্থামীর বন্ধু বাটি হইতে বাহির হইয়া গেল এবং একঘণ্টা পরে ছ্যাম্প লইয়া ফিরিয়া আসিল। এতক্ষণ শরৎচন্দ্র সেইরূপ বন্ধনাবস্থাতেই পড়িয়াছিল। এইবার তাহার বন্ধন-মুক্ত করিয়া দিয়া গৃহস্থামী তাহাকে বলিল—“ওঠ এই পালঙ্কের ওপর বস।”

পালঙ্কের উপর বসিতে বলাতে এবার যে আর পূর্বের মতন, শরৎচন্দ্র ঘ্রাকটিং করিল না, সেকথা বোধ হয় খুলিয়া বজিতে হইবে না।

সর্বদা দড়ি দিয়া সজোরে বাঁধাতে শরতের সমস্ত অঙ্গের বন্ধনপ্রাপ্ত স্থানগুলি ফুলিয়া উঠিয়াছিল ও ভয়ানক দাগযুক্ত হইয়া গিয়াছিল। শরৎচন্দ্র পালঙ্কের উপর বসিয়া দুইখানি কাগজে লেখাপড়া করিয়া দিল। একখানি কাগজে লেখা হইল যে, শরৎচন্দ্র তাহার ঘড়ি, চেন প্রভৃতি নগদ তিন হাজার টাকা পাঠিয়া, গৃহস্থামীকে বিক্রয় করিল। দ্বিতীয় কাগজখানিতে লেখা হইল যে, শরৎচন্দ্র নিজেকে একজন ব্যবসায়ী বলিয়া পরিচয় দিয়া এবং বিশেষ প্রয়োজনের দোহাই দিয়া—তিন মাসের কড়ারে, ফোজদারী বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া নগদ দশ হাজার টাকা গৃহস্থামীর নিকট হইতে ধার লইল।

লেখাপড়া শেষ করিয়া শরৎচন্দ্র চলিয়া যাইতে চাহিল। গৃহস্থামী বাধা দিয়া বলিল,—“দাঁড়াও, আগে নাক, কাণ মলা দিয়া বল যে, আর কখনও পরজীর ওপর কুনজর দোবনা।”

শরৎচন্দ্র বলিল—“সেকথা তোমায় আর কষ্ট ক’রে বলতে হবে কেন? আমি প্রতিজ্ঞা ক’রে বলছি যে, আজ থেকে পরন্তীর ওপর কুনজর দেওয়া দূরে থাক, সমস্ত পরন্তীকে আমি আমার গর্ভধারিণীর মতন দেখব। আর যে পাপ ক’রেছি তার জন্য এই নাক কাণ ম’লে, নাকখং দিচ্ছি।” এই কথা বলিয়া শরৎচন্দ্র খুব জোরে নিজের নাক, কাণ মলিল এবং ভূমির উপর পড়িয়া এত জোরে নাক ঘসিয়া নাকংখং দিল যে, তাহার নাকের উপরটা খুব ছড়িয়া গিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল।

গৃহস্থানী বলিল,—“বাপ, যা ন’ললে যেন মনে থাকে। তুমি ভদ্রলোকের ছেলে ভদ্রলোকের মতন হওগে।”

সকলের নিকট হইতে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ও সকলকে নমস্কার করিয়া শরৎচন্দ্র বাহির হইয়া গেল। উহার তিনজনে একবার উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল।

—•—

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ ।

‘ডেকে-আনা-প্রিয়ের’ বাটি হইতে বাহির হইয়া রাজপথে পড়িয়া শরৎচন্দ্র অতি দ্রুতবেগে চলিয়া নিজের বাটিতে আসিল। নীচের ঘরে হরিচরণ ও মাধব বসিয়াছিল। তাহারা, শরৎচন্দ্রের অস্বাভাবিক মুখভাব ও আকৃতি দেখিয়া বড়ই বিস্মিত হইল। ইহারা কিছু বলিবার পূর্বেই শরৎচন্দ্র মহা গম্ভীরস্বরে বলিল—“আমার সঙ্গে এখনই ওপরে এস।” এই কথা বলিয়া শরৎ উপরে গিয়া বরাবর তাহার সুসজ্জিত ড্রেসিংরুমে প্রবেশ করিল। হরিচরণ ও মাধব, তাহার পিছু পিছু যাইয়া দাঁড়াইল।

শরৎচন্দ্র বলিল,—“আমি তোমাদের দু’জনকে এখন যে কথা জিজ্ঞেস করছি—যদি তোমরা ভদ্রলোকের ছেলে হওত, তার সত্যি উত্তর দাও। বল, আমার চেহারা কি খুব সুন্দর?”

সেই পুরাতন প্রশ্ন এবং এই প্রশ্নের উত্তর, ইহারা আরও কতবার অতি সৌজাতাবে দিয়াছে। আজ কিন্তু প্রশ্নকর্তার চক্ষের চাহনি ও জিজ্ঞাসার ভঙ্গী দেখিয়া ইহাদের প্রাণ চমকিয়া উঠিল। দুই তিনটা ঢোক গিলিয়া দুইজনে সমস্বরে বলিল—“আপনার চেহারা সুন্দর, অতি সুন্দর। কোন্ শালা ব’লতে পারে যে, আপনার চেহারা কুৎসিৎ।”

দৃঢ়স্বরে ও ক্রোধভরে শরৎ বলিল—“আমি শালী ব’লতে পারি যে, আমার চেহারা কুৎসিৎ, অতি কুৎসিৎ। আর আমার মনটা, তার চেয়ে শতগুণে বেশী কুৎসিৎ। কিন্তু আমার এই কুৎসিৎ মনের জন্তে আমি যতটা দায়ী তার চেয়ে শতগুণ দায়ী তোমরা। ‘কোনও সময় একলা থাকতে পারি না সর্বদাই গল্প করবার আর মন-যোগান কথা বলবার জন্তে লোক চাই’—এই যে একটা বদ অভ্যাস আমার আছে, সেই অভ্যাসের জন্তে আমি তোমাদের যে রকম বাধ্য হয়েছিলুম তাতে, তোমরা যদি মনে ক’রতে তাহলে আমায় যথার্থ মাহুষ ক’রতে পারতে। প্রিয়-সঙ্গী যারা—তারা যদি দ্বিবারাত্র ভাল আলোচনা করে তাহলে মন ভালর দিকে যায়ই যায়। তোমরা যদি মনে ক’রতে তাহলে আমি এতটা প্রবৃত্তির দাস হতুম না। আমার মনে যে পাপের আশ্রয় গুমিয়ে, গুমিয়ে জলছিল, তোমরা সেটা নেবার চেষ্টা না ক’রে উলটে তা’তে ইন্ধন যুগিয়ে এসেছ। আজ আমার জ্ঞান-চক্ষু খুলেছে। উঃ ভাবতে আজ আমার মাথা হেঁট হ’য়ে আসছে, মনটা এতটুকু হ’য়ে যাচ্ছে—সামান্য এই দেহের জন্তে, আমি কত টাকাই না খরচ ক’রেছি, কি অমূল্য-সময়ই না নষ্ট ক’রেছি। নকলরূপের সাধনায় আর হীন বিলাসিতায় মত্ত হ’য়ে আমি যে টাকা অপব্যয় ক’রেছি সেই টাকায়—আর কিছু না হোক, সমাজের এই দুর্দিনে—অন্ততঃ শিন, চারশো কণ্টাদায়গ্রস্থ লোককে দায়-মুক্ত ক’রে তাদের ভিটে-মাটি রক্ষা ক’রতে পারতুম, আত্মহত্যার হাত থেকে তাদের বাঁচাতে পারতুম, সমাজকে সবল রাখতে পারতুম।”

হরিচরণ ও মাধব দেখিল যে অবস্থা বড়ই গুরুতর। তাই তাহারা

ভুল-ভাষা

মরিয়া হইয়া—“জীবনে কখনও যে ‘স্পষ্ট-কথা’ বলে নাই আজ সেই স্পষ্ট-কথা বলিল—“বাবু কি কেবল আমাদেরই দোষ দেখলেন ?”

শরৎচন্দ্র বলিল—“শুধু তোমরাই দোষী নও, আমিও দোষী—মহা দোষী। কিন্তু এ কথা বড়-গলা ক’রে বলব যে, মোসাহেবদের হাতে না পড়লে বড়লোকের ছেলেরা কখনও, কোনও মতেই যথাযথ অধঃপতিত হয় না। কোনও ভাল লোককে খারাপ করবার সঙ্কল্প নিয়ে এসে মোসাহেবরা এখন অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাকে খারাপ পথের চরমে নিয়ে যেতে পারে তখন মোসাহেবরা যদি মনে করত’ কেন তাকে ভাল পথে নিয়ে যেতে পারবে না ? মোসাহেবরা যখন, মানুষকে পূর্ণ করবার শক্তি ধারণ করে তখন সেই শক্তি প্রয়োগ’ ক’রে নিশ্চয়ই তারা মানুষকে দেবতা ক’রতে পারে।”

হরিচরণ বলিল—“শাক, যাক বাবু, ও সব দুঃখের কথা যেতে দিন। এই সংসারে দুদিনের ভ্রমো আসা, আমোদ ক’রে দিন কাটিয়ে দিন। এ সংসারে তো চির দিনের নয়, একদিন জন্মের মতন যেতেই হবে, সুতরাং দুঃখের কথা ক’রে মিছে কি হবে। আসুন আনন্দ করা যাক !”

শরৎচন্দ্র উত্তেজিত ভাবে বলিল—“হ্যাঁ আনন্দ ক’রব, আনন্দ ক’রব। দেখ যাতে আমার দুঃখ, তোমার দুঃখ, আমাদের বহু দেশ-বাসীর দুঃখ সেই দুঃখের মূলকে আজ শেষ ক’রব। এই কথা বলিয়া শরৎচন্দ্র, গৃহকোণস্থিত আমত্রেলা-ষ্ট্যাণ্ড হইতে একটি মোটা বেতের লাঠি তুলিয়া লইয়া, তাহার বড় সাধের, অতি যত্নের, অনেক সখের মৌখীন বিলাস দ্রব্য সকল ভাঙিতে লাগিল। বন্-বন্-বনাৎ-বনাৎ

শকে সেই থরে, থরে, সজ্জিত রাশি, রাশি এসেক, লোঙ্গান ও নানারূপ কাচ-নির্মিত সুদৃশ্য আধার প্রভৃতি বহু সৌখীন দ্রব্য চুরমার হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। “এই গুলোত হল—এইবার আশী আর পোষাকের পালা” —এই কথা বলিয়া হস্তস্থিত লাঠির দ্বারা দুই চারিটি আদাত দেওয়াতে আশী ভাঙ্গিলনা দেখিয়া শরৎচন্দ্র ছুটিয়া গিয়া, সজোরে দুই তিনটী ইঁাচকা দিয়া দরজার হড়কাটি ভাঙ্গিয়া লইয়া, তাহার আঘাতে সমস্ত আশীগুলি চুরমার করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল। তারপর হাঁপাইতে, হাঁপাইতে—সমস্ত আড়ম্বরপূর্ণ পোষাক এবং সমস্ত সৌখীন ও মূল্যবান জামা, কাপড়, চাদর, কুমাল প্রভৃতি এবং দেড়শত টিন সিগারেট জ্বালাইয়া গলাইয়া নীচে বাগানের ভিতর ফেলিয়া দিয়া শরৎচন্দ্র গম্ভীরস্বরে দরোয়ানকে ডাকিয়া আদেশ দিল যে—“ঐ সমস্ত জিনিষ বাগানের ভেতর থেকে তুলে নিয়ে তোমার ঘরে রেখে দাও আর কাল সকালেই গরীব ভিখারীদের ভেঁকে ঐ সব জিনিস ভাগ করে বিলিয়ে দিও।”

“যোহুুম হুজুর” বলিয়া বিম্বিত দরোয়ান চলিয়া গেল। মহা স্বস্তির একটা দীঘনিশ্বাস ফেলিয়া শরৎচন্দ্র বলিল—“ও গুলোর পালা শেষ হল, এইবার তোমাদের পালা।”

হরিচরণ সভয়ে বলিল—“আমাদেরও কি ঐ রকম হুড়কোর বাড়ী দিয়ে শেষ করবেন না কি?”

শরৎচন্দ্র বলিল—“সেটা করা যদিও খুব উচিত—কিন্তু যখন এক-দিনও তোমাদের বন্ধু ব'লেছি, একদিনও তোমাদের সঙ্গে খেয়েছি—তখন আমি আর সেটা ক'রতে চাইনা। তোমাদের যে ভাবুবার সে

ভাল-ভাল

ভাববেই। আমি মানে, মানে তোমাদের 'বিদায় দিচ্ছি। তোমরা যাও, চলে যাও। জীবনে আর আমার কাছে কখনও এসনা।"

হরিচরণ ও মাধব আর্জুনাদ করিয়া উঠিল। এতটা যে হইবে তাহা তাহারা ভাবে নাই। হরিচরণ অতি ব্যাকুলভাবে বলিল—
“সেকি বাবু আমাদের তাড়িয়ে দেবেন কি? আপনার কাছ থেকে গেলে আমরা নিশ্চয়ই মারা যাব। আপনার কাছে থেকে আমাদের ভাল থাওয়া, ভাল পরার অভ্যাস হয়ে গেছে। আমরা ভয়ানক আয়েসী আর বাবু হয়ে গেছি। আমাদের বাড়ীর অবস্থা জানেন—আপনি তাড়িয়ে দিলে আমাদের বড় কষ্ট, মহা কষ্ট হবে। আমরা নিশ্চয়ই মারা যাব। দোহাই বাবু, আমাদের তাড়াবেন না।”

শরৎচন্দ্র বলিল—“কি ক’রব উপায় নেই, আমি তোমাদের আর রাখতে পারব না। তোমরাও এখানে থেকে আর সুখ পাবে না। দেখ, বন্ধুতে আর মোসাহেবেতে এইখানে তফাৎ। আমি প্রথমে বন্ধুভাবে তোমাদের গ্রহণ করেছিলুম, ‘ভাই’ বলে তোমাদের সম্বোধন করতুম, তোমরাও আমায় ‘ভাই’ বলতে—তারপরে তোমরা কিন্তু বন্ধুত্বের মর্যাদা বুঝলে না, আমায় ‘বাবু’ বলে সম্বোধন ক’রতে লাগলে আর সর্ব রকমে আমার মোসাহেব হ’লে। আমার এখন আর মোসাহেবে প্রয়োজন নেই তাই তোমাদের বিদেয় দিচ্ছি। ‘বন্ধুত্ব’ যে কি জিনিস তা তোমরা বুঝতে পারলেনা, সামান্য মোসাহেবীতে সন্তুষ্ট হ’লে। কিন্তু মোসাহেব না হয়ে যদি তোমরা আমার বন্ধু হ’তে, তোমাদের সঙ্গে যদি আমার বন্ধুত্ব জন্মাত’ তাহলে আজ সে বন্ধুত্ব ভঙ্গ করে তোমাদের ফটু ক’রে তাড়াবার কমতা আমার

হ'তনা। যাই হোক যখন একদিনও তোমাদের বন্ধু বলে মনে স্থান দিয়েছি তখন একেবারে নিঃসহায় অবস্থায় তোমাদের ছেড়ে দোবনা। তোমাদের প্রত্যেককে দু'হাজার টাকা আমি দিচ্ছি। দেশে গিয়ে সংপথে থেকে কোনও ব্যবসা করে সংভাবে গেরস্তর চালে থাকগে ভবিষ্যতে আর কখন অর্থকষ্টে পড়তে হবে না; সামান্য অর্থের জন্তে, ভদ্রসন্তান হ'য়ে হীনবৃত্তি অবলম্বন করতে হবে না। যাও, যা বললুম করগে। যদি ভাল চাও ত বাবুগিরি ক'রতে যেওনা। আর দোহাই তোমাদের, আর কখনও মোসাহেবী ক'রে কোনও সংসারে কারার রোল তুলোনা।" এই কথা বলিয়া শরৎচন্দ্র কলিকাতার কোনও ব্যাঙ্কের উপর, ইহাদের দুইজনের নামে, চার হাজার টাকার একখানি চেক লিখিয়া দিল এবং গাড়ী ভাড়া প্রভৃতি খরচের জন্ত নগদ একশত টাকা প্রদান করিল। দুই ভ্রাতায় প্রস্থান করিল।

ইতারা চলিয়া যাইতেই মোক্ষদাসুন্দরী সেই ঘরে আসিলেন। এসেই, আশী প্রভৃতি ভাঙ্গার শব্দে বিস্মিত হইয়া—ব্যাপার কি জানিবার জন্ত—মোক্ষদাসুন্দরী সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিলেন। ইতারা চলিয়া যাইতেই এই ঘরে ঢুকিয়া, সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া আরও বিস্মিত হইয়া বলিলেন—“একি বাবা শরৎ, এ কি ব্যাপার, একি করেছ?”

শরৎচন্দ্র বলিল—“খুব ভাল কাজ করেছি মা, আমার পাপের সব সহচরদের আজ ধ্বংস ক'রে দিয়েছি। মা কুশিকার দোষে বাবু-গিরিতে মেতে আর বেচালে চলে তৌমার দিকে ফিরে না চেয়ে আমি মহাপাপ ক'রেছি। আজ আমার জ্ঞান চুকু ফুটেছে তাই

চুল-ভাঙ্গা

তোমার কাছে মার্জনা চাইছি। তোমার মনে কষ্ট দিয়ে—অগাধ অর্থ থাকতেও আমি মহাকষ্ট পেয়েছি; যখনই যে কাজ ক’রতে গেছি তাতেই বিফল মনোরথ হয়েছি। সনাতন বিধান না মেনে আর প্রত্যক্ষা দেবী তুমি, তোমার আদেশ না শুনে আমি মহা দুঃখ পেয়েছি, মহা অপমানিত হ’য়েছি—আমার অনেক, অনেক টাকা অসার্থকে খরচ হ’লে’ গেছেই তার ওপর আমার প্রাণ অবধি যেতে বসেছিল। মা! তোমার সফল ক’রে বলছি, আমি এবার থেকে আর কখনও বেচালে চলব না, আর তোমার সমস্ত আদেশ অবনত মস্তকে পালন করব।”

মোক্ষদাসুন্দরী মহা বিস্মিতা এবং অতীব কৌতূহলান্বিত। হইলেও কোনও কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া, পুত্রকে সান্তনা দিয়া বলিলেন—
“বাক বাবা ওসব কথা যেতে দাও। তুমি ওরকম ভাবে উত্তেজিত হ’ওনা—ঠাণ্ডা হয়ে ব’স।”

শরৎচন্দ্র বলিল—“ঠাণ্ডা একটু পরে হব মা। আমার পাপের সব সহচরদের শেষ করেছি—একটা জিনিস এখনও বাকী আছে। সেইটেকে শেষ করে তবে ঠাণ্ডা হব।” এই কথা বলিয়া শরৎচন্দ্র ছুটিয়া গিয়া তাহার রাইটিং—কেসের মধ্য হইতে একখানি কাঁচি বাহির করিয়া আনিয়া বলিল—“মা যে যে জিনিসের শরণ নিরে আমি পশুত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলুম, তাদের সব গেছে বাকী আছে কেবল আমার মাথার এই চুলগুলো। টেরী কাটা না গেলে খারাপ দেখতে হবে এই ভয়ে আমি পিতৃশ্রদ্ধের সময় চুল না কাষ্মিয়ে, স্বর্গগত পিতার আত্মার অপমান করেছি। এই দুর্ভিক্ষের দেশে—আমার এই চুলের প্রসাধনের জন্যে যে

টাকা অপব্যয় করেছি তাতে বোধ হয় একটা অল্পস্বত্ব খোলা যেত। দারিদ্রের জন্তে যে দেশে অর্দ্ধাহারে, বিনা চিকিৎসায় লোক মারা যায় সে দেশের লোক হ'য়ে আমি কোন্ প্রাণে, হীন বিনাসিতার জন্তে এত টাকা অপব্যয় ক'রেছি। ওহোঃ আমি কি করেছি।”

মোক্ষদাসুন্দরী বলিলেন—“যা হবার হয়ে গেছে বাবা তার আর চারা কি? তুমি ঠাণ্ডা হও।”

উত্তেজিত শরৎ উচ্চ কণ্ঠে বলিল—“চারা আছে বইক—কিন্তু তাতে তোমার প্রসন্নতা চাই। দেশের দীন-দুঃখীকে মহাকষ্টে দিন কাটাতে দেখেও—নিজেব হীন গুণ ও তুচ্ছ বিনাসিতায় অগাধ অর্থব্যয় ক'রে বে চৌধারীত্ব করেছে, এনার দেশে ফিরে গিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করব। নানা সংবাদপত্র থেকে আজ কিছুদিন হ'ল খবর পেয়েছি যে, আমার দেশে, আমার সেই সুজলা, গুফলা, শশু-শ্যামলা বাঙ্গলা দেশে—স্বর্গ থেকে কি এক ভাবের বন্যা ভেসে এসেছে। আমি দেশে ফিরে আমার দেশবাসীর সঙ্গে সেই পবিত্র বন্যার স্রোতে ঝাঁপ দিয়ে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব। তার আগে মা, তোমার কাছে যে পাপ করেছি—সে পাপের মার্জ্জনা না পেল, তোমার প্রসন্নতা না পেল আমি কোনও কাজেই সফল হব না। মা, এই—আমার এই”— এই কথা বলিয়া শরৎচন্দ্র হস্তস্থিত কাঁচি দ্বারা তাহার বড় সাধের অতি দ্বয়ের, মহা প্রিয় মাথার চুলগুলি কাটিতে লাগিল। মহা উত্তেজিত শরৎচন্দ্র খুব তাড়াতাড়ি চুল কাটিতে কাটিতে মধ্যো মধ্যো খুব জোরে টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে লাগিল। কাঁচির-ডগার-খোঁচায় এবং ছিন্ন করার জন্য তাহার মাথা দিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল—তবুও

চুল-ভাঙ্গা

ক্রক্ষেপ নাই। এই ভাবে প্রায় সমস্ত চুলগুলি কাটিয়া ফেলিয়া, সেই রক্তাক্ত চুলগুলি হাতে করিয়া মায়ের চরণের উপর রাখিয়া শরৎ বলিল—“মা, আমার মাথার রক্তে সিক্ত এই চুল—চন্দনচর্চিত ফুলের মতন তোমার পায়ে অর্পণ করে, এই শফৎ ক’রছি যে, এ জীবনে আর কখনও বিলাসিতায় মত্ত হবনা। আমার মাথার অনেক রক্ত তোমার পায়ে দিলুম—মাথা কেটে আহুতি দিলুম; বিনিময়ে কেবলমাত্র তোমার প্রসন্নতা ভিক্ষা দাও। প্রসন্ন হও মা প্রসন্ন হও—ক্ষমা কর মা ক্ষমা কর।” এই বলিয়া শরৎচন্দ্র মায়ের চরণ দুটির উপর মাথা রাখিয়া—দুই হস্তে মায়ের চরণ দুইটি সজোরে আঁকড়াইয়া ধরিল। তাহার চক্ষের জলে, যথার্থই মোক্ষদামুন্দরীর পা দুটি ভিজিয়া গেল।

সাদরে দুই হাতে ধরিয়া পুত্রকে তুলিয়া মোক্ষদামুন্দরী সশ্লেষে বলিলেন—“আমি তোকে বাবা সর্বাস্তকরণে ক্ষমা করলুম। কিন্তু বাবা আশ্রয় এই শুভদিনে, ঋণ কৃপায় এই শুভদিন এল, ঋণ কৃপায় তোমার জ্ঞান চক্ষু ফুটলো, ঋণ কৃপায় তোমার আপন-হারা-অবস্থা দ্রুত হয়ে তুমি, তোমাকে ফিরিয়ে পেলো—সেই ভগবানের কাছে মার্জনা ভিক্ষা ক’রে তাঁর চরণে নমস্কার কর।”

অশ্রুতপ্ত হৃদয়ে, অশ্রুতাপপূর্ণস্বরে শরৎচন্দ্র বলিল—“ভগবানের কাছে কোন মুখে ক্ষমা চাইব মা? আমি যে জীবনে কখনও তাঁকে ডাকিনি। ডাকা দূরে থাক, আমি যে বরাবর তাঁকে অবহেলা করে এসেছি। মহা অজ্ঞানতা বশে তাঁকে যে বরাবর ভুলে আছি।”

মোক্ষদামুন্দরী বলিলেন—“তুমি তাঁকে বরাবর ভুলে আছ বটে

তিনি কিন্তু তোমায় বরাবরই মনে রেখেছেন। তুমি তাঁকে অবহেলা করেছ বটে কিন্তু তিনি এমনই দয়াময়, এমনই করুণাসিদ্ধ যে, তা সত্ত্বেও তিনি তোমায় ভালবাসেন। তুমি তাঁকে ডাকনি বটে তবু কিন্তু তিনি তোমারই আছেন।”

শরৎ গদগদ স্বরে বলিল—“তাই যদি হয়—হে দয়াময়, হে করুণাময় জগদীশ্বর তুমি যদি এতই দয়াময়, এতই করুণাময় হও, তাহলে দয়া ক’রে আমায় ক্ষমা কর, আমার মনের মলামাটি দূর ক’রে দাও, তোমার চরণে আমার ভক্তি, বিশ্বাস দাও।” শরৎচন্দ্র ভূমীতে নুটাইয়া পড়িয়া দয়ারসাগর শ্রীভগবানকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করিতে লাগিল।

উপসংহার ।

কিছুদিন পরে শরৎচন্দ্র কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল। ইহারা কলিকাতায় ফিরিয়া বাস্তবিকই এক স্বর্গীয়ভাবের বগ্না প্রবাহিত দেখিল। তখন কলিকাতায় মহা ধুমধাম হইতেছিল। তখন সবেমাত্র বঙ্গের-অঙ্গচ্ছেদ হইয়াছিল। মোহনিদ্রাগ্রস্ত বাঙ্গালী, কি এক অদৃশ্য হস্তের স্পর্শে বহুদিন পরে জাগিয়া উঠিয়াছিল। অজ্ঞান-অন্ধ-বাঙ্গালীর চক্ষু, কোনও এক দেবীর পদ্যহস্তের পবিত্র স্পর্শে বিকসিত হইয়া উঠিয়াছিল। ঈর্ষ্যা, বিদ্বেষ, জাতি-শত্রুতা ভুলিয়া, ‘ভাই-ভাই ঠাই-ঠাইরূপ কুনীতিকে পদদলিত করিয়া, আপন-পর এক হইয়া, শত্রু-মিত্রে হাত ধরাধরি করিয়া দলে দলে হলাহলি-গলাগলি করিয়া জাতীয়-সঙ্গীত গাহিয়া বেড়াইতেছিল। বিরাট সভা করিয়া পরস্পরে মিলিত হইয়া—বিদেশী-পণ্য-বর্জনের প্রতিজ্ঞা করিতেছিল। সজ্জবদ্ধ হইয়া একতা-শক্তি অর্জন করিতেছিল। শরৎ কালীতে বাসিয়া সংবাদপত্রের সাহায্যে এই সকল সংবাদ জ্ঞাত হইয়াছিল। এক্ষণে কলিকাতায় আসিয়া এই সকল মহিমাময়, বিরাট, স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিয়া সে মনে-প্রাণে মুগ্ধ হইয়া গেল। কিছুদিন চারিদিক ঘুরিয়া ও কতকগুলি সভায় যোগদান করিয়া তাহার প্রাণ, এই আন্দোলনের সঙ্গে যথার্থই মিশিয়া গেল। একদিন একটি সভায় যোগদান করিয়া

সে দেখিল যে, জাতীয়-ধন-ভাণ্ডারে দেশের ধনী ও গৃহস্থের কথা হুরে থাক—অন্ধ, খঞ্জ, ভিক্ষুক পর্যন্ত—তাহাদের ভিক্ষালব্ধ অর্থ হাসিমুখে দান করিতেছে। এই সভা হইতে বাটিতে ফিরিয়া শরৎচন্দ্র গোবিন্দবাবু, মা, ও অন্যান্য সকলকে বলিল যে—“আমি আর বিলাতী কাপড়ের কারবার ক’রব না। দেশের এই উন্নতির পথে অগ্রসর হবার সময়, আমি যদি বিলাতী কাপড়ের কারবার করি তাহলে দেশকে উন্নতির পথ থেকে টেনে নিয়ে আরও পঞ্চাশ বছরের পথ পেছিয়ে দোয়া হবে।”

শরতের এই সঙ্কল্পে সকলেই বাধা দিল। কূটবিষয়বুদ্ধিশালী গোবিন্দবাবু অনেক রকমে বাধা দিয়া বলিলেন—“দেখ বাবা তেওয়ারি অন্যান্য যা সম্পত্তি আছে তার আয় অতি সামান্য আর তোমার বিলাতী কাপড়ের কারবারের আয় মাসে প্রায় দশ হাজার টাকা। সুতরাং এই কারবার তুলে দিলে তোমাকে খুব গেরস্ত চালে চলতে হবে বোধ হয় বুঝতে পারছো।”

শরৎ বলিল—“আর তো আমি কোনও অনাবশ্যকীয় অভাবের বা অভ্যাসের বাধা নই যে এই কথা শুনে আমি ভয় পাব। গেরস্ত কি ব’লছেন, আমি এখন খুব গরীবের চালে চলতে প্রস্তুত আছি। দেখুন শুনতে পাই যে, অন্যান্য সব দেশের লোকেরা, তাদের মাতৃভূমীর জন্যে যথাসর্বস্ব দেয়, স্ত্রীপুত্রকে বিসর্জন দেয়, এমন কি নিজের প্রাণ অবধি বলি দেয়। তারাও তো মানুষ, তাদেরও তো সংসার, সমাজ, সুখ, আরাম সবই আছে। তারা যদি দেশের কল্যাণের জন্যে নিজের প্রাণ পর্যন্ত বলি দিতে পারে—আর আমরা কি সামান্য আট দশ-হাজার

তুল-ভাঙ্গা

টাকার আয় জাগু ক'রতে পারি না ? আমাদের দেশ কি দেশ নয় ? আমরা কি যথার্থই মানুষ নয় ?”

শরৎচন্দ্র তাহার পরদিনই বিলাতী-কাপড়ের কারবার তুলিয়া দিল । তাহার বিস্তীর্ণ কারবার ও বিশাল আয়ের কথা দেশবাসীর জানা ছিল । তাহার এই ত্যাগের কথা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল । সমস্ত দেশবাসী তাহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল—সমগ্র দেশ তাহার প্রশংসায় মুখরিত হইল । শরতের এইরূপ পরিবর্তন দেখিয়া ও তাহার প্রশংসা শুনিয়া, তাহার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিত সকলেই খুব আনন্দিত হইল । এই সম্বন্ধে কথা হইতে, হইতে শরতের মাসীমাতা-দ্বয় একদিন মোক্ষদাসুন্দরীকে বলেন যে—“দিদি তুমি খুব পূণ্যবতী তাই তোমার পুণ্যের জোরে শরতের এই ঘোর পরিবর্তন হ'ল । সে অমন অসৎ থেকে এত সৎ হ'ল ।”

এই কথার উত্তরে মোক্ষদাসুন্দরী বলেন—“ছিঃ, ছিঃ তোমরা জেনে শুনে অমন কথা ব'লনা । আমার আবার পুণ্য কি কিছু আছে ? সকলের সব চেষ্টা যখন বিফল হ'ল, যখন কোনও মতে শরৎকে ফেরাতে পারলুম না, সংসারের নানান ঘাত-প্রতিঘাতে যখন বুঝলুম যে, মানুষের চেষ্টায় সব কাজ সফল হয় না তখন মূর্তিমান ভগবানস্বরূপ শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ আশ্রয় নিলুম । তাই আমার গুরুবলই আমার একমাত্র ছেলেকে বানর থেকে মানুষ ক'রে দিলে । গুরু কৃপা না হ'লে কি এত শীগগির এই ঘোর পরিবর্তন হয় । সেদিন পুরাণ শুনতে, শুনতে গুরুর মাহাত্ম্য, গুরুবলের প্রতাপ জানতে পেরেই—যথার্থ ভক্তির আর বিশ্বাসের সঙ্গে পত্র লিখে গুরুকে আনিয়ে—

ছিলুম—তাই তাঁর পদধূলি পেয়ে আমাদের সব বিপদ কেটে গেল।
 ঋণ গুরুদেব, ধন গুরুকৃপা, ধন গুরুবল।” এই কথা বলিয়া মোক্ষদা-
 স্কন্দরী ভক্তিভরে শ্রীগুরুর উদ্দেশে প্রণাম করিল।

শরতের এইরূপ ভ্যাগে, গোবিন্দবাবু যথার্থই বড় ক্ষুব্ধ হইয়া-
 ছেন। তিনি শরতের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কয়েক দিন যাবৎ
 বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন কিন্তু সফলকাম হন নাই। শরৎ যে আজ
 কর্তাদিন ধরিয়া কি করিতেছে তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না।
 প্রতিদিন খুব প্রাতঃকালে সে বাহির হইয়া যায় এবং অনেক রাতে
 বাটিতে ফিরে। আজ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া
 গোবিন্দবাবু এখনও নিজের বাটিতে চলিয়া যান নাই। রাত্রি যখন
 এগারটা বাজিল তাহার কিছু পরে শরৎ বাটিতে ফিরিল। তাহাকে
 দেখিয়া খুব ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত বোধ হইলেও গোবিন্দবাবু তাহাকে
 ডাকিয়া বলিলেন—“আজ কর্তাদিন থেকে তোমার সঙ্গে দেখা করবার
 চেষ্টা করছি কিন্তু দেখা পাচ্ছি না ব’লে অসময়ে তোমায় বিরক্ত করতে
 বাধ্য হলাম। দেখ, তোমরা বরেন্সের দোষে একটা কাঁচা কাজ ক’রে
 ফেললেও, আমাদের বুড়োদের উচিত হচ্ছে যে তাতে রাগ না ক’রে
 তোমাদের বুঝিয়ে বলা। তা হ্যাঁ বাপু এত টাকার এই কারবার তুলে
 দিয়ে কি ভাল ক’রলে। তুমি যে দেশের উন্নতির কথা খ’লছ—তা
 ব্যবসা-বাণিজ্য না ক’রলে কি দেশের উন্নতি হয়? এই ব্যবসার
 তুলে কি ভাল কাজ হয়েছে।”

ডুল-ভাঙ্গা

শরৎ বলিল—“ব্যবসা-বাণিজ্যে দেশের উন্নতি হয় তা জানি। দেখুন আমি তো ব্যবসা করা ছাড়িনি। আমি কেবল—দেশের পক্ষে অনিষ্টকারী ঐ বিদেশী পণ্যের ব্যবসা ছেড়েছি। আমি শীগগীরই অন্য ব্যবসা ক’রব। সেই জন্তেই আজ কদিন ধ’রে দিবারাত্র অনবরত পরিশ্রম করছি।”

গোবিন্দবাবু বলিলেন—“এত টাকা আয়ের এমন সুন্দর ব্যবসাটা ছেড়ে আর অন্য কি এমন লাভের ব্যবসা আছে যে তা ক’রবে?”

শরৎ বলিল—“বাবা মারা যেতে ঘাট-কাগানর দিন এক বৃদ্ধ ভদ্র-লোকের সঙ্গে গঙ্গার ঘাটে আমার আলাপ হয়। তিনি মধ্য, মধ্য আমাদের বাড়ীতে আসতেন তা বোধ হয় আপনার মনে আছে! এই স্বদেশী আন্দোলনের বহু পূর্ব থেকে তিনি আমাদের দেশবাসীর স্বাস্থ্যের অবনতির জন্তে কি রকম আলোচনা ক’রতেন আর তার প্রতি-কারে কি করা উচিত, সে সব বিষয়ে নানা রকম আলাপ ক’রতেন আর আমাদের এঁর ভার নেবার জন্তে ভয়ানক অনুরোধ ক’রতেন, সে সব কথা বোধ হয় আপনি ভুলে যাননি? আমি তাঁর সঙ্গে দেখা ক’রেছি এবং তাঁরই পরামর্শ মতে নতুন ব্যবসা করবার ব্যবস্থা ক’রছি।”

গোবিন্দবাবু বলিলেন—“কি ব্যবসাটা করবে শুনতে পাই না কি?”

শরৎ বলিল—“আমি বিশেষ ভেবে তবে একাজে নেমেছি। দেখুন আমাদের দেশের মধ্যে যে মৃত্যুসংখ্যা এত বেশী, নানা রকমের রোগের এত প্রাদুর্ভাব, আর অকাল-মৃত্যু এত অধিক এর কারণ আমাদের

ভুল ভাঙ্গা

খাদ্য-সমস্যা। আমরা রিতীমত পয়সা খরচ ক'রেও বিলুপ্ত-খাদ্য খেতে পাইনা। জীবন ধারণের প্রধান উপাদান যে আহার্য-দ্রব্য, আমরা সেই আহার্য-দ্রব্যকে বিয় ক'রে তবে খাই। এই জন্তেই আমাদের মধ্যে উদ্বিগ্ন, অসমসাহস, প্রতিজ্ঞা-পালন-শক্তি, দুঃস্থ, উন্নতির কামনা নেই। মনের সঙ্গে দেহের যোগ নিকট সম্পর্ক। ভেজাল, বিষাক্ত জিনিষ খেলে দেহ যদি ভাল না থাকে তাহলে মনের বলও থাকে না। আজকাল হাজার, হাজার লোক বিদেশী পণ্য বর্জনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েও সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা ক'রতে পারছে না—তাতে দেশের ঐ ভয়ানক ক্ষতি হচ্ছে, দেশ কত পেছিয়ে যাচ্ছে তা ধারণা করবার শক্তি আমাদের নেই। কিন্তু এর প্রতিকার কি? এই যে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ক'রছে বলে, সকলকে দেবদেবীর মন্দিরে প্রতিমার সম্মুখে, প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্তে শপথ করিয়ে নোয়া হচ্ছে—এতে কি এর প্রতিকার হবে? কখনই নয়। দেবতা যদি দ্বারস্থ হবেন আসেন, আর তাঁর সম্মুখে-চরণ স্পর্শ ক'রে যদি এরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, তবুও অনেকে সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে বাধ্য হবে। কিন্তু এদের যদি দেহ সুস্থ ও সবল হয় তাহলে এদের প্রাণ সজীব হবে, মন বলবান ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হবে। তখন এদের আর প্রতিজ্ঞা করাতে হবে না, বা এদের প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গের ভয়ও করতে হবে না। তখন এরা, প্রতিজ্ঞা করবার পূর্বেই কার্য-সাধন ক'রে আসবে। তখন আর এদের জাগাতে হবে না—এরা নিজেরাই জাগবে। যাদের প্রাণ নিসর্জ, দেহ দুর্বল তাদের মন কি করে জাগ্রত থাকবে? একটা

ভুল-ভাঙ্গা।

ভীষণ উত্তেজনায় মুমূর্ষুও একবার উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়াতে পারে... কিন্তু তার দ্বারা যথার্থ কোনও কার্য সাধন হয় না। যথার্থই যদি আমরা দেশের উন্নতি চাই, যথার্থই যদি আমরা দেশবাসীকে দেশের যোগ্য ও উপযুক্ত সন্তান ক'রতে চাই তাহলে সর্বাগ্রে এই রোগে কাতর, বিষ-ভোজনে মৃতপ্রায় দেশবাসীকে বিশুদ্ধ আহার দিতে হবে। একেতো দারিদ্রতার জন্যে পুষ্টিকর আহার পাওয়া যায় না। তার ওপর সারাদিনের হাড়-ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর, জীবন ও দেহ রক্ষার জন্য যা খাব তা ভেজালে বা বিষে ভরা। সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে, সঙ্গে ভেজালও বাড়ছে। মরদায় পাথরের আর-হাড়ের গুঁড়ো, তেলে পাকড়ার বিষ, ঘিয়ে সাপের ও অন্যান্য অস্পৃশ্য মাংসের চর্কি মেশান। তুণ্ড না ছানা খেতে যাও, তাও জলে ভরা আর সার পদার্থ যে মাটা, সেই মাটা তুলে নোয়া। আমরা প্রাচীন লোকদের অসভ্য বলি আর নিজেদের সভ্য ব'লে পরিচয় দি কিন্তু অতীব অসভ্য আর বুনো-জাত যারা, তারাওতো জীবন ধারণের প্রধান উপাদান, আহার্য-দ্রব্যকে আমাদের মতন বিষ ক'রে খায়না। একে এই ভেজাল তার ওপর এই সব ভেজাল জিনিষে তৈরী যে সব খাদ্যদ্রব্য দোকানে বিক্রী হয় সেগুলো—আইন সত্বেও আর সে আইন পালিত হচ্ছে কিনা দেখবার লোক থাকা সত্বেও—যে রকম ভাব খোলা অবস্থায় বিক্রী হয় তাতে তার ওপর ধুলো, ময়লা, শুষ্ক-মল বিষাক্ত-কফ প্রভৃতির গুঁড়ো হাওয়ার সঙ্গে উড়ে পড়ে আর নানা রোগের জীবাণু বহন ক'রে হাজার হাজার মাছি তার ওপর ব'সে

সেগুলো বিধাত্ত ক'রে দেয়। তারপর এই রকম জিনিস খেয়ে—
অকালমৃত্যু কি, আমরা যে স্মৃতীকাগারে জন্মেই মরিনা এই যথেষ্ট।
এই জন্তে আমি এক মহাসঙ্কল্প নিয়ে ব্যবসায় নামছি।”

গোবিন্দবাবু বলিলেন—“কি মহা সঙ্কল্পটা শুনি।”

শরৎ বলিল—“আমার নগদ টাকা যা আছে তা, আর কিছু টাকা
ধার ক'রে, মোট দুই লক্ষ টাকা খরচ ক'রে আমি যতটা সম্ভব গর
ততটা বড় একটা কারখানা খুলছি। আমার সেই কারখানায়
যথাযথ বিশুদ্ধ ঘি, তেল, ময়দা, প্রস্তুত হবে। আর একটি গোশাল
স্থাপন ক'রে তাতে গোপালন এবং বিশুদ্ধ দুগ্ধ, ছানা, মাগদ
প্রভৃতি প্রস্তুত করা হবে এবং ঐ সকল উপাদানে বিশুদ্ধ খাদ্যদ্রব্য
প্রস্তুত করা হবে। আমি প্রথমে আমার পল্লীবাসীদের চাহিদা
অতি অল্প লাভে সরবরাহ ক'রে অবশিষ্ট যা থাকবে সেগুলো
আমার নিকটস্থ পল্লীবাসীদের দোকান। এতে তাদেরও খুব
লাভ, আর ব্যবসার দিক দিয়ে দেখলে আমারও খুব লাভ। এই
কারবার আরম্ভ করে দিয়েই আমি প্রত্যেক পল্লীর ধনীদেব বাড়ীতে
গিয়ে তাদের হাতে পায়ে ধবে—আমার মতন এই রকম কারখানা
তাদের পাড়ায় ক'রতে এবং ঐ রকম বিশুদ্ধ মাল তাদের পাড়ার
লোককে সরবরাহ করতে অনুরোধ করব। প্রত্যেক ধনী যদি নিজের,
নিজের পাড়ায় এই রকম একটি কারখানা স্থাপন ক'রে নিজের নিজের
পাড়ার লোককে অল্পলাভে বিশুদ্ধ মাল সুগিয়ে যান তাহলে অতি অল্প-

ভুল-ভাঙ্গা

দিনের মধ্যে এ দেশের চেহারা ফিরে যায়, এ দেশবাসীর অল্প রকম মৃত্তা হয়ে যায়। • সকলে এই রকম ভাঙ্গে কাজ করে গেলে—নিজের পাড়া, ভিন্ন পাড়া, তারপর গ্রামগ্রামান্তরে বিস্তৃত মাল চালান্ দেওয়া ও বিনিময় করীর কাজ হবে। দেশ বাঁচবে, দেশবাসী বাঁচবে, সমগ্র দেশবাসী ব্যবসা বানিজ্যে লিপ্ত হবে। এতে আমার লাভ, আপনার লাভ, সমগ্র বাঙ্গালীর লাভ, সমগ্র বাঙ্গালার লাভ।”

কিছুদিনের মধ্যে শরৎচন্দ্র এইরূপ ধরনের একটি কারখানা স্থাপন করিল এবং বিশ্বাসী ও ধর্মভীরু কর্মচারীর সহায়তায় স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিয়া কারখানাটি সুচারুরূপে পরিচালনা করিতে লাগিল। শরৎচন্দ্র দাবসা করে কিন্তু অধিক লাভের আশা করেন। এবং ব্যবসার উপর জুরাত খেলেন। এই জন্য তাহার পাড়ার ও নিকটস্থ পাড়ার লোকেরা আরও অল্প ন্যূন্যে বিস্তৃত পাড়া-দ্রব্য পাইতে লাগিল। যথাযথ তাহাদের মৃত্তা ভিন্ন প্রকমের হইল, তাহাদের মানসিক বল ও জীবনী-শক্তি বাড়িয়া গেল। কিছুদিন পরে শরৎ স্বয়ং ভিন্ন ভিন্ন পাড়ায় গিয়া, তথাকার ধনীদিগের হাতে, পারে ধরিত্তা—এরূপ কারখানা খুলিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। দেখা যাউক তাহার অনুরোধে কি ফল হয়।

যথার্থই এমন শরৎচন্দ্রকে দেখিলে—সেই পূর্বের শরৎচন্দ্র বলিয়া বোধ হয় না। সে এখন আর সেরূপ ভাবে চুল ছাঁটেনা, পাতা কাটিয়া-ট্রেরী কাটেনা, হ্যাট-কেট পরিয়া ও সিগারেট মুখে দিয়া, গ্যাট-ম্যাট করে না। সে এখন মোটা কাপড় পরে, মোটা কাপড়ের তৈয়ারী

ভুল-ভাঙ্গা.

পিরায়ণ গায়ে দেয়, পায়ে নাগরা জুতা পরে আর পাতার বিড়ি খায়।
আর—বাজে গুলে ও আড্ডায় অমূল্য সময় নষ্ট না করিয়া—কারখানার
কাজ দেখে, দেশের কাজ করে। (অবশ্য বাড়ীর সব কাজ দেখিয়া ও
বাড়ীর লোকের শুভাশুভ খবর রাখিয়া) আর—আর সে এখন পূর্বের
মতন, লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে দাঁত খিঁচাইয়া ও মুখ বাঁকাইয়া—
“গুড্-ডে বা গুড্ ইভনিং” বলে না। কোনও লোকের সহিত সাক্ষাৎ
হইলেই শরৎচন্দ্র এখন দুইহাত তুলিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিয়া, প্রশান্ত
স্বরে বলে—“বন্দে-মাতরম্।”

তাহার এই অদ্ভুত পরিবর্তন ও অপূর্ব ভাব দর্শনে যোঁা
সাক্ষাৎকারী ব্যক্তিও ভাবে বিভোর হইয়া বলে—“বন্দে-
পাঠক, আপনিও একবার উচ্চকণ্ঠে ও ভক্তিভরে
বন্দে-মাতরম্।”

সমাপ্ত।

